উত্তরবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে শিব

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে
পি এইচ. ডি. উপাধির জন্য উপস্থাপিত

গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

বিপ্লব কুমার সাহা

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দীপককুমার রায়

বাংলা বিভাগ
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ডিসেম্বর ২০১৪

Dr. Dipak Kumar Roy
Assistant Professor,
Department of Bengali
University of North Bengal

P.O. North Bengal University
Raja Rammohunpur, Dist.
Darjeeling, Pin – 734013
West Bengal, India

Certificate

I Certify that Biplab Kumar Saha has prepared the thesis entitled 'উত্তরবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে শিব' for the award of Ph.D. Degree of the University of North Bengal, under my guidance. He has carried out the work at the Department of Bengali, University of North Bengal.

Dipak Kumar Roy
3/12/14

Dr. Dipak Kumar Roy
Assistant Professor
Bengali Department
University of North Bengal
Rajarammohonpur
Darjeeling- 734013

Assistant Professor
Department of Bengali
University of North Bengal

Declaration

I declare that the Thesis entitled "উত্তরবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে শিব" has been prepared by me under the guidance of Dr. Dipak Kumar Roy, Assistant Professor of Bengali Department, University of North Bengal. No part of this Thesis has formed the basis for the award of my degree or fellowship previously.

Biplab Kumar Saha.
03.12.14.

Biplab Kumar Saha
Research Scholar
Bengali Department
University of North Bengal
Rajarammohanpur
Darjeeling- 734013

গবেষণা অভিসন্দর্ভের বস্তুসার

ভূমিকা

শিব ভারতবর্ষে পরম পূজ্য ও সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। কেননা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শিব ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছে। এই দেবাদিদেব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই ক্রমে মানুষের মনে, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পরে সাহিত্যে নিজের জায়গা দখল করে নিয়েছে। তাই লক্ষ্য করা যায় প্রাগার্য যুগ, হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এবং তারও পরবর্তীকালের সাহিত্যে শিবই প্রধান। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ -- সেখানেও শিব দূরে সরে থাকেনি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিব ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, লোকায়ত সমাজেও শিব বিভিন্ন রূপে পূজিত। উত্তরবঙ্গে নানান জাতি-জনজাতির লোক বাস করায় প্রত্যেকের মধ্যে শিবও বিভিন্ন নামে ও রূপে পরিচিত। যেমন - বোড়ো বা মেচদের কাছে শিব বাথ্রৌব্রাই বা শিব্রাই নামে, ধীমালদের কাছে দান্তাবেরাং নামে, রাভাদের কাছে মইষঠাকুর রূপে, ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডাদের কাছে বরপাহাড়ী, মারাংবুরু, বরদেও প্রভৃতি নামে পরিচিত। অর্থাৎ কালানুক্রমিক দৃষ্টিতেও শিব যেমন পরিবর্তিত, ঠিক তেমনি সমকালীন দৃষ্টিতেও শিব পরিবর্তিত। অবশ্য এই পরিবর্তন শুধু দেবতা শিবের ক্ষেত্রে নয়, শিবকে কেন্দ্র করে আসলে একটি সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনই অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে।

প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়

প্রথম অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা কিংবা লোকাচারগুলির হদিশ উত্তরের সোদা গন্ধের মাটি ছাড়া অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এই দেবদেবী কিংবা লোকাচারগুলি আলাদা করেই যেন উত্তরের পাহাড়-পর্বত, বন, নদ-নদী প্রভৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিভাবে এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি উত্তরের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে -- তা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের শৈব সংস্কৃতির ঐতিহ্য

এই অধ্যায়ে শৈব সংস্কৃতির সূচনাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এতে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা থেকে বেদ, পুরাণ, প্রাচীন সাহিত্য

ও মধ্যযুগের সাহিত্যে শৈব ধারার বিবর্তনের চিত্রটি উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য বহনকারী শৈবক্ষেত্রগুলির প্রেক্ষিত আলোচনা করে সেখানেও শিবের বিবর্তনকে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রয়োজনানুসারে উত্তরের এই ঐতিহ্য বহনকারী শৈবক্ষেত্রগুলির চিত্রের ব্যবহারও করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকদেবতা রূপে শিব

এখানে উত্তরবঙ্গের শিব লোকায়ত সমাজে কতনামে এবং কতভাবে পূজিত তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই অধ্যায়কে আমরা দুটো উপ-অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি। এক. লোকদেবতা রূপে শিব এবং দুই. অন্যদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত শিব। প্রথম অংশে মূলত সেইসব দেবতাদের নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, যারা এতদঞ্চলে সরাসরি শিবরূপে পূজিত হয়, দ্বিতীয় অংশে যারা সরাসরি শিবরূপে পূজিত হয় না, কিন্তু শিবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অংশে ডাংধরা শিব, চড়ক বা গাজন, মহাকাল, প্রমুখ দেবতার কথা এবং দ্বিতীয় অংশে মাশান, ঢাংটিং, জুড়াবান্দা প্রমুখ দেবতাদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে উত্তরের শৈব ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি ও শিব

উত্তরবঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতি বলতে মূলত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের (মৌখিক সাহিত্য) কথা বলা হয়েছে। এইসব লৌকিক উপাদানের মধ্যেও শিব কিভাবে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন, সে বিষয়ে এই অধ্যায়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র, লোকনাটক প্রভৃতি লোকায়ত উপাদানে শিব প্রসঙ্গ কিভাবে এবং কেন এসেছে সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের স্থাননামেও শিব কিভাবে নিজের জায়গা দখল করে নিয়েছে তারও একটি তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় এই স্থাননামগুলির বেশিরভাগই শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এসবের মধ্যে দিয়ে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে শিব কতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তার হদিশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের সাহিত্যে (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য) শিব

উত্তরবঙ্গের সমাজ কিংবা সংস্কৃতিই নয়, উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের মধ্যেও শিব কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে সে বিষয়ে এই অধ্যায়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই অধ্যায়কেও দুটি উপ-অধ্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমভাগে কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যে শিব, যেখানে মনকর ও দুর্গাবর রচিত 'মনসাকাব্য' ও 'বেউলা আখ্যান', মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণ বিরচিত 'ভক্তিগীতি-সংগ্রহ', কোচবিহারের কবি দ্বিজ মাধবচন্দ্র বিরচিত 'চণ্ডীকার ব্রতকথা' এবং রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী বিরচিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যগুলিকে আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে শিব, যেখানে উত্তরবঙ্গের ধারায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির কথা বলা হয়েছে। এই ধারার মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল, তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল ও মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যত্রয়কে আকর গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই আকরগ্রন্থগুলি থেকে শিব চরিত্রের বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্বে শিব, সংসারী শিব, বিবাহ সভায় শিব, ভিখারি শিব, কামুক শিব প্রভৃতি চিত্র উঠে এসেছে।

এই দুই উপ-অধ্যায়ের আকর গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে শিব চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈশাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার আদি কবি মাণিকদত্ত যেভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন মনসামঙ্গল কাব্যধারায় উল্লিখিত কবিরাও সেভাবেই সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু মাণিকদত্ত যেভাবে আদ্যার সাতবার জন্ম প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, মনসামঙ্গল কাব্যধারার কবিদের মধ্যে অবশ্য এই চিত্র দেখা যায় না। এছাড়াও মাণিকদত্তের কাব্যে দুর্গা শিবকে বিবাহ করার জন্য যে কঠিন তপস্যায় ব্রতী হন, অন্যত্র তা দেখা যায় না। এখানে দুর্গা নিজেই শিবকে স্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছেন, কিন্তু অন্যত্র এর বিপরীত চিত্র নজরে আসে। সেখানে শিবই যেন দুর্গাকে বিবাহ করার জন্য কাতর হয়েছেন।

উপসংহার

পরিশেষে সমস্ত অধ্যায়গুলির পুনর্বিশ্লেষণ করে শিব চরিত্রের বিবর্তন দেখানো হয়েছে। সেখানে দেখা যায় শিব আদি দেবতা, তবুও কবিরা তাঁকে হতদরিদ্র রূপে অঙ্কন করেছেন। কিংবা দেখি শিব দারিদ্র্যের কারণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, কোথাও বা চাষ-আবাদ করেছেন। কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। এসব চিত্র দেখার পর তাঁকে আর দেবতা বলে মনে হবার কথা নয়, আসলে মধ্যযুগের কবি কিংবা লোকায়ত সমাজের কবিরা সমাজের

ভণ্ডামী, লুণ্ঠন, জমিদারী শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলতে পারতেন না। বিভিন্ন দেবদেবীর রূপকে বসিয়ে কবিরা এসবের প্রতিবাদ করতেন। শিবও যেন এরকমই একজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি যিনি আদিদেব। এছাড়াও আমরা দেখি সেই সময় কুলিন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের কথা, যা সমাজের বাছবিচারহীন যৌন সঙ্গমের পরিচয়ই বহন করতো। ঠিক এই চিত্র শিবের মধ্যেও দেখানো হয়েছে। কেননা ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শিব কুচুনী ও গোয়ালিনী রূপী নারীদের সঙ্গে মিলিত হন। এটি ছাড়াও পদ্মার প্রতি শিবের আকর্ষণ এই প্রসঙ্গকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে। আসলে পদ্মা শিবের দুহিতা হলেও শিব ভুল করে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। এগুলি যেন সেই সমাজের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। এখানে শিবকে অভিজাত বা সামন্তপ্রভুর প্রতিনিধি হিসাবেও গ্রহণ করা চলে। কেননা মালঞ্চ নির্মাণের পর সেখানে দ্বারী বা প্রহরী নিয়োগ করার ঘটনার মধ্য দিয়ে এই দিকটিই ফুটে ওঠে, এসব চিত্রের মধ্য দিয়ে শিবকে আমরা মর্ত্য পৃথিবীর ধূলি ধূসরিত মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।

নিবেদন

জন্মসূত্রে আমি যে অঞ্চলের বাসিন্দা, সেখানে বিভিন্ন জাতি-জনজাতির বাস হওয়ার ফলে আমি এক মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে বেড়ে উঠি। তবে সেই মিশ্র সংস্কৃতির মধ্যে অদ্ভুতভাবে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় সকলের মধ্যেই একটা মিল চোখে পড়ে। এই দেবদেবী কেন্দ্রিক সংস্কৃতির মধ্যে যেন সকলেই এক। বিশেষ করে শৈব সংস্কৃতি। তাই বাল্যকাল থেকেই এই শৈব সংস্কৃতি নিয়ে কম-বেশি পরিচিতি লাভ করেছি। কিন্তু তখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো তথ্য বা তাত্ত্বিক আলোচনার তাগিদ অনুভব করিনি। কেননা এ বিষয়ে আমার চোখে দেখার বাইরে কোনো জ্ঞান বা গভীরতা কোনোটাই ছিল না। পরবর্তীকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়াশুনা করার সুযোগ পাওয়ার ফলে পুরোনো কৌতূহল নতুন করে জেগে ওঠে, বিশেষ করে মধ্যযুগের সাহিত্য ও লোকসাহিত্য পড়ার সুবাদে। এই সময় থেকেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন দেবদেবী বিষয়ে জানার আগ্রহ জন্মে। সেই সঙ্গে মধ্যযুগের সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করার সুবাদে এ বিষয়ে আগ্রহ ও উৎসাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। তৎসহ এ বিষয়ের উপর তাত্ত্বিক ও আকর গ্রন্থগুলি অধ্যয়নের ফলে আমি আমার গবেষণা কর্মের একটা দিক্ নির্দেশ পেয়ে যাই। তখন থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অধ্যাপকদের সঙ্গে আলোচনা করে আমার প্রকল্পধৃত গবেষণাকর্ম 'উত্তরবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে শিব' শিরোনাম ঠিক করি।

লোকসংস্কৃতি বিষয়ে যার অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ আমাকে গবেষণাকর্মে প্রথম থেকে অনুপ্রাণিত করেছে, তিনি আমার গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক ড. দীপককুমার রায়। পশ্চিমবঙ্গে তথা বহির্বঙ্গের লোকসংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁর অনুসন্ধিৎসা আমাকে প্রথম থেকেই অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়া আমার শিক্ষক ও বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. নিখিলেশ রায় মহাশয়ের সস্নেহ পরামর্শ ও নিরন্তর খোঁজখবর আমার গবেষণাকর্মকে ত্বরান্বিত করে। এই সুযোগে ড. রায় মহাশয়কে আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও বর্তমান বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষক অধ্যাপক অঙ্কুশ ভট্ট বিভিন্ন সময় শিব বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য ও তত্ত্ব আলোচনা করে আমার চিন্তাভাবনার পথকে যেভাবে মসৃণ করে দিয়েছেন, তাতে তাকেও আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। পাশাপাশি বাংলা বিভাগের বরিষ্ঠ শিক্ষক অধ্যাপক সুবোধ কুমার যশ ও অধ্যাপিকা মঞ্জুলা বেরা মহাশয়ার কাছে বিভিন্ন সময়

মধ্যযুগের সাহিত্যের পাঠ নেওয়ার ফলে, এ বিষয়ে আমার গবেষণা করার ইচ্ছা আরও প্রকটভাবে জাগ্রত হয়। তাঁদের এই নিরলস পাঠদানই আমাকে মধ্যযুগের সাহিত্য সংযুক্তকরণে সাহায্য করেছে। এই সুযোগে তাঁদের প্রতিও আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এছাড়াও বিভাগের দুই কনিষ্ঠ অধ্যাপক ড. উৎপল মণ্ডল ও ড. তপনকুমার মণ্ডল মহাশয়দ্বয়ের সস্নেহ তাগিদ আমার এই গবেষণা কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এই ফাঁকে তাঁদের প্রতিও রইল আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

প্রাতিষ্ঠানিকতার বাইরেও যাঁরা আমাকে নিরলস গবেষণা কর্মে উৎসাহ ও পরামর্শদানে সমৃদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আমার অগ্রজ প্রতীম লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধানী গবেষক ড. সুধাংশুকুমার সরকার, ড. নারায়ণচন্দ্র বসুনীয়া, ড. নরেন্দ্রনাথ রায়, জ্যোতির্ময় রায়, অভিজিৎ দাশ, বিশ্বজিৎ রায়, পবিত্র রায় প্রমুখরা। এই সুযোগে তাঁদের প্রতিও আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। এছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংস্কৃতি গবেষক, বিশেষ করে রমণীমোহন বর্মা, দীনেশ রায়, নগেন্দ্রনাথ রায়, খুশী সরকার প্রমুখরা যেভাবে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে আমার এই গবেষণা কর্মকে তথ্যবহুল করতে সাহায্য করেছেন, এই ফাঁকে তাদেরকেও আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জানাই। অন্যদিকে এতদঞ্চলের ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আমাকে দীর্ঘ সময় কাটাতে হয়েছে। এ বিষয়ে যাঁরা আমাকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এমনকি অযাচিতভাবে আমাকে স্বতঃস্ফূর্ত সাহায্য করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা না জানালেই নয়। যারা কোনো কিছুর বিনিময়ে নয়, শুধু সংস্কৃতিকে ভালোবেসে আমাকে বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন। এরাই আমার গবেষণা কর্মের মূল কারিগর। তাদেরকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

ক্ষেত্রসমীক্ষার বাইরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেভাবে আমাকে গ্রন্থ ও নানান তথ্য দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার গবেষণা কর্মকে ত্বরান্বিত করেছেন, তাদের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার। এছাড়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিভাগীয় গ্রন্থাগার, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রিয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার স্টেট লাইব্রেরী, জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে সংগৃহীত দুস্প্রাপ্য গ্রন্থগুলি আমার গবেষণা কর্মের অনেকটা সহায়ক হয়েছে। হয়তো সেগুলো না পেলে আমি আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে শেষ করতে পারতাম না।

এঁদের প্রতিও রইল আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা। এছাড়া যার কথা না বললেই নয়, সেই অগ্রজ প্রতীম বুবুনকুমার বর্মণ ও ভাতৃপ্রতীম শ্রীমান সুজিৎ রায়, যাদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিরক্ত করা সত্ত্বেও হাসিমুখে তারা তা মেনে নিয়ে আমার সহস্রাধিক পাতার পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ ও সংশোধন কর্মে সময় দিয়ে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের অবয়ব দান করেছে, তাতে তাদেরকে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে ছোটো করবো না, তাদেরকেও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসা জানাই। এছাড়াও অজ্ঞাতে হয়তো অনেকের কথা বলা হয়নি— যারা বিভিন্নভাবে আমাকে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভ তৈরি করতে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকেই আমার ধন্যবাদ, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

তারিখ. ..... বিপ্লবকুমার সাহা

সূচীপত্র

ভূমিকা ঃ i-iii

প্রথম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় ১-১৯

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের শৈব সংস্কৃতির ঐতিহ্য ২০-৬৫

ক. অনার্য বা হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার স্তর

খ. বৈদিক স্তর

গ. পৌরাণিক যুগের স্তর

ঘ. প্রাচীন সাহিত্যের স্তর

ঙ. মধ্যযুগীয় স্তর

চ. লোকায়ত স্তর ও উত্তরবঙ্গের শৈব ঐতিহ্য

তৃতীয় অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকদেবতা রূপে শিব ৬৬-১১০

ক. লোকদেবতা রূপে শিব -

১. ডাংধরা শিব

২. মহাকাল

৩. চড়ক বা গাজন

৪. সন্ন্যাসী ঠাকুর

৫. মহারাজা ঠাকুর

৬. বুড়া ঠাকুর

খ. লোকদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত শিব -

১. জুড়াবান্দা ঠাকুর

২. মদনকাম

৩. মাশান

৪. ঢাং ঢিং শিব

৫. সেগুনিয়া ঠাকুর

৬. ভাণ্ডারকুড়া, চামাটাউয়া, বীরুবাগ, সিংহেশ্বর সন্ন্যাসী।

৭. নোহাশূর

চতুর্থ অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি ও শিব ১১১-১৮০

ক. প্রবাদে শিব

খ. ধাঁধায় শিব

গ. লোকসঙ্গীতে শিব

১. দেল'এর গানে শিব প্রসঙ্গ

২. ধরম ঠাকুরের গানে শিব প্রসঙ্গ

৩. শিব খেলার গানে শিব প্রসঙ্গ

৪. তিস্তাবুড়ির গানে শিব প্রসঙ্গ

৫. লাহাঙ্কারী গানে শিব প্রসঙ্গ

৬. মদনকাম পূজার গানে শিব প্রসঙ্গ

ঘ. মন্ত্রে শিব

ঙ. ব্রতকথায় শিব -

১. কাত্যায়নি ব্রতকথায় শিব

২. সুবচনী ব্রতকথায় শিব

৩. যাইটোল বিষহরি ব্রতকথায় শিব

৪. কাতিপূজার ব্রতকথায় শিব

চ. ছড়ায় শিব

ছ. লোকনাটক ঃ গম্ভীরা গানে শিব

জ. উত্তরবঙ্গের স্থাননামে শিব

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উত্তরবঙ্গের সাহিত্যে (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য) শিব ১৮১-৩০১

ক. কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যে শিব

১. মনকর ও দুর্গাবর' এর মনসাকাব্য ও বেউলা আখ্যান

২. মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ ।

৩. দ্বিজ মাধব চন্দ্রের চণ্ডিকার ব্রতকথা

৪. রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত গোসানীমঙ্গল

খ. মধ্যযুগের মঙ্গল কাব্যে শিব

১. জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্যে শিব

২. তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ কাব্যে শিব

৩. মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব

চিত্রমালা ঃ **৩০২-৩০৭**

উপসংহার ঃ

সামগ্রিক মূল্যায়ন **৩০৮-৩১৩**

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী **৩১৪-৩২৪**

নির্ঘন্ট **৩২৫-৩২৯**

ভূমিকা

পৃথিবী সৃষ্টির সূচনায় অরণ্যচারী অসহায় মানুষ যখন প্রকৃতির রুদ্ররোষের তাণ্ডবলীলায় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ব্যস্ত ঠিক তখনই তারা এই ভয়াল ভীষণ প্রকৃতির কাছে মাথা নত করেছিল, তখন থেকেই মানব রক্তে প্রোথিত হয়েছিল দৈবচেতনার বীজ। সেই সময় থেকেই সমস্ত জীবের ধরিত্রী সেই বসুন্ধরার দুটি রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। ভয়াল ভীষণ রুদ্ররূপ এবং শান্ত, সমাহিত, স্নেহময়ী মাতার ললিত রূপ। এই দুই রূপের যিনি ধারণ কর্তা, তিনিই হলেন দেবাদিদেব মহাদেব।

তিনি এই ভারতবর্ষ তথা বিশ্বসভ্যতার পরম পূজ্য ও সর্বাধিক জনপ্রিয় দেবতা। কেননা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্যন্ত শিব ঘরে ঘরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছে। এই দেবাদিদেব সৃষ্টির সূচনাকাল থেকেই ক্রমে মানুষের মনে, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে পরে সাহিত্যে নিজের জায়গা দখল করে নিয়েছে। তাই লক্ষ্য করা যায় প্রাগার্য যুগ, হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, এবং তারও পরবর্তীকালের সাহিত্যে শিবই প্রধান। শুধু তাই নয়, বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ - সেখানেও শিব দূরে থাকেনি। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই শিব ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, লোকায়ত সমাজেও শিব বিভিন্ন রূপে পূজিত। উত্তরবঙ্গে নানান জাতি-জনজাতির লোক বাস করায় প্রত্যেকের মধ্যে শিবও বিভিন্ন নামে ও রূপে পরিচিত। যেমন - বোড়ো বা মেচদের কাছে শিব বাথ্রীব্রাই বা শিব্রাই নামে, ধীমালদের কাছে দান্তাবেরাং নামে, রাভাদের কাছে মইষঠাকুর রূপে, ওঁরাও, সাঁওতাল, মুণ্ডাদের কাছে বরপাহাড়ী, মারাংবুরু, বরদেও প্রভৃতি নামে পরিচিত। অর্থাৎ কালানুক্রমিক দৃষ্টিতেও শিব যেমন পরিবর্তিত, ঠিক তেমনি সমকালীন দৃষ্টিতেও শিব পরিবর্তিত। অবশ্য এই পরিবর্তন শুধু দেবতা শিবের ক্ষেত্রে নয়, শিবকে কেন্দ্র করে আসলে একটি সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনই অনুসন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণা অভিসন্দর্ভে।

আর এই অনুসন্ধান করতে গিয়ে সমগ্র বিষয়কে আমার তত্ত্বাবধায়কের পরামর্শ মতো আমি পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি। অধ্যায়গুলি হল - উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়, উত্তরবঙ্গের শৈব সংস্কৃতির ঐতিহ্য, উত্তরবঙ্গের লোকদেবতা রূপে শিব, উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি ও শিব এবং উত্তরবঙ্গের সাহিত্যে (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য) শিব। প্রথম অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়' অংশে উত্তরবঙ্গের ভৌগোলিক ও সংস্কৃতিক পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সেখানে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা কিংবা লোকাচারগুলির হদিশ

উত্তরের সোদা গন্ধের মাটি ছাড়া অন্যত্র পাওয়া সম্ভব নয়। এই দেবদেবী কিংবা লোকাচারগুলি আলাদা করেই যেন উত্তরের পাহাড়-পর্বত, বন, নদ-নদী প্রভৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। কিভাবে এই সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি উত্তরের ভূ-প্রকৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে -- তা এই অধ্যায়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'উত্তরবঙ্গের শৈব সংস্কৃতির ঐতিহ্য' শিরোনামে শৈব সংস্কৃতির সূচনাকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে বিবর্তন দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এতে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা থেকে বেদ, পুরাণ, প্রাচীন সাহিত্য ও মধ্যযুগের সাহিত্যে শৈব ধারার বিবর্তনের চিত্রটি উপস্থাপন করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্য বহনকারী শৈবক্ষেত্রগুলির প্রেক্ষিত আলোচনা করে সেখানেও শিবের বিবর্তনকে স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রয়োজনাসুরে উত্তরের এই ঐতিহ্য বহনকারী শৈবক্ষেত্রগুলির চিত্রের ব্যবহারও করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে 'উত্তরবঙ্গের লোকদেবতা রূপে শিব' বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এতে উত্তরবঙ্গের শিব লোকায়ত সমাজে কতনামে এবং কিভাবে পূজিত তার বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই অধ্যায়কে আমরা দুটো উপ-অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি। এক. লোকদেবতা রূপে শিব এবং দুই. অন্যদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত শিব। প্রথম অংশে মূলত সেইসব দেবতাদের নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে, যারা এতদঞ্চলে সরাসরি শিবরূপে পূজিত হয়, দ্বিতীয় অংশে যারা সরাসরি শিবরূপে পূজিত হয় না, কিন্তু শিবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অংশে ডাংধরা শিব, চড়ক বা গাজন, মহাকাল, প্রমুখ দেবতার কথা এবং দ্বিতীয় অংশে মাশান, ঢাংঢিং, জুড়াবান্দা প্রমুখ দেবতাদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে উত্তরের শৈব ঐতিহ্যকে স্পষ্ট করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গে লোকায়ত সংস্কৃতি বলতে মূলত লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানের (মৌখিক সাহিত্য) কথা বলা হয়েছে। এইসব লৌকিক উপাদানের মধ্যেও শিব কিভাবে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন, সে বিষয়ে চতুর্থ অধ্যায়ে 'উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি ও শিব' শিরোনামে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র, লোকনাটক প্রভৃতি লোকায়ত উপাদানে শিব প্রসঙ্গ কিভাবে এবং কেন এসেছে- সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের স্থাননামেও শিব কিভাবে নিজের জায়গা দখল করে নিয়েছে তারও একটি তালিকা এখানে দেওয়া হয়েছে। লক্ষণীয় এই স্থাননামগুলির বেশিরভাগই শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম। এসবের মধ্যে দিয়ে লোকায়ত জীবনের সঙ্গে শিব কতটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, তার হদিশ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সর্বশেষ অধ্যায়ে 'উত্তরবঙ্গের সাহিত্যে (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য) শিব' বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। আসলে উত্তরবঙ্গের সমাজ কিংবা সংস্কৃতিই নয়,

উত্তরবঙ্গের সাহিত্যের মধ্যেও শিব কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সাহিত্যের সময় সীমা বলতে শুধু বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগকেই চিহ্নিত করা হয়েছে। এই সময় সীমার মধ্যে রচিত সাহিত্যগুলিকে আকর গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করে শিব চরিত্রের বিভিন্ন দিক নির্দেশ করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই অধ্যায়কেও দুটি উপ-অধ্যায়ে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রথমভাগে কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যে শিব, যেখানে মনকর ও দুর্গাবর রচিত 'মনসাকাব্য' ও 'বেউলা আখ্যান', মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণ বিরচিত 'ভক্তিগীতি-সংগ্রহ', কোচবিহারের কবি দ্বিজ মাধবচন্দ্র বিরচিত 'চণ্ডীকার ব্রতকথা' এবং রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী বিরচিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যগুলিকে আকর গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে শিব, যেখানে উত্তরবঙ্গের ধারায় রচিত মঙ্গলকাব্যগুলির কথা বলা হয়েছে। এই ধারার মধ্যে জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল, তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল ও মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যত্রয়কে আকর গ্রন্থ হিসেবে ধরা হয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই আকরগ্রন্থগুলি থেকে শিব চরিত্রের বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্বে শিব, সংসারী শিব, বিবাহ সভায় শিব, ভিখারি শিব, কামুক শিব প্রভৃতি চিত্র উঠে এসেছে। এখানে শুধু এই চিত্রগুলি স্পষ্ট করেই শেষ করা হয়নি, এসব চিত্র উত্তরের লোকায়ত সমাজে কোথায় কোথায় আজও বহমান - সেগুলিও প্রসঙ্গত বর্ণনা করা হয়েছে।

সমগ্র গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন হয়েছে ঐতিহাসিক, বস্তুবাদী ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। যদিও এই গবেষণা প্রকল্পের মূল ভিত্তিভূমি ছিল ক্ষেত্রসমীক্ষা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে কিছু অসমিয়া আকর গ্রন্থের সাহায্য নিতে হয়েছে। সেক্ষেত্রে সমস্ত গবেষণাপত্রের বাংলা লিপির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য অসমিয়া লিপিগুলিকে বাংলায় পরিবর্তিত করা হয়েছে এবং অন্যত্র বানানগুলি 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত 'সংসদ বানান অভিধান' এর মতো রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে পঞ্চম অধ্যায়ে আকর গ্রন্থের উদ্ধৃতিগুলি তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয় নি, পরিবর্তে উদ্ধৃতির পাশেই পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই উদ্ধৃতিগুলি কোন আকর গ্রন্থ থেকে গৃহিত তা অধ্যায় কিংবা উপ-অধ্যায়ের শুরুতেই তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে শিব বিষয়ক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয়

উত্তরবঙ্গ অতি প্রাচীন ভূ-খণ্ড। বর্তমানের উত্তরবঙ্গ প্রাচীনকালে বরেন্দ্রভূমি নামেই পরিচিত ছিল। তবে সেদিনের বরেন্দ্র ভূমি ও আজকের উত্তরবঙ্গের সীমারেখারও কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সেদিনের বরেন্দ্রভূমির পূর্ব সীমায় ছিল করতোয়া নদী ও পশ্চিম সীমায় ছিল মহানন্দা নদী। বর্তমানে আর এই নদী দিয়ে উত্তরবঙ্গের সীমা ভাগ করা হয় না। যদিও বর্তমান উত্তরবঙ্গ বলতে ছয়টি জেলাকেই বোঝায়।

পশ্চিমবঙ্গের উত্তরদিকের প্রান্তীয় ভূ-ভাগকে উত্তরবঙ্গ বলা হয়। যদিও ভারতের জাতীয় কোনো মানচিত্রে উত্তরবঙ্গ বলে আলাদা করে কোনো ভূ-ভাগ নেই। তবে ব্রিটিশ শাসনের সময় তাদের কাজের সুবিধার জন্য এরা অখণ্ড বঙ্গকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। যার মধ্যে একটি উত্তরবঙ্গ। উত্তরবঙ্গের পরিচয় দিতে গিয়ে ড. নির্মল দাশ বলেছেন- ''উত্তরবঙ্গ বললে এখন সাধারণভাবে দেশের যে-এলাকাকে আমরা বুঝি, সুদূর অতীতে তো বটেই, এমনকি অদূর অতীতেও সেই এলাকার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন রাজশক্তির অধীনে ছিল। সম্ভবত উনিশ শতকের গোড়ার দিক থেকে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন ভূখণ্ডে ইংরেজের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গার উত্তরে ও ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমের সমতল এলাকায় একটি অখণ্ড রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীন ভৌগোলিক এলাকার সম্ভাবনা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। শুধু সমতল এলাকাতেই নয়, ইংরেজের আত্মপ্রসারশীল উদ্যোগেই সিকিম ও ভুটানের মত সংলগ্ন পার্বত্য এলাকারও কিছু কিছু অংশ ক্রমে এই নিরবচ্ছিন্ন ব্রিটিশ শাসন কর্তৃত্বের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। এই ভাবে মূলত ব্রিটিশ আমলেই সমতল ও পার্বত্য এলাকা-সমন্বিত বর্তমান উত্তরবঙ্গের একটা ভৌগোলিক প্রাক্-রূপ প্রথম আভাসিত হয়ে ওঠে।''[১] অর্থাৎ গঙ্গার উত্তরাংশ এবং ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমাংশের যে সমতলভূমি এবং মাঝখানের পার্বত্যভূমির কিছু অংশ নিয়েই উত্তরবঙ্গ গঠিত। ইংরেজ শাসনের সময় প্রশাসনিক কাজকর্মের সুবিধার জন্য এরা বঙ্গভূমির নাম দিয়েছিলেন বঙ্গ প্রেসিডেন্সি বা বঙ্গপ্রদেশ। আবার প্রান্তীয় অবস্থানের উপর ভিত্তি করেই বঙ্গের দক্ষিণ অংশকে দক্ষিণবঙ্গ, উত্তর অংশকে উত্তরবঙ্গ, পূর্ব ভাগকে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমভাগকে পশ্চিমবঙ্গ বলা হয়। ১৯৪৭ খ্রি. ১৫ই আগস্ট দেশ ভাগ হয়ে যায়। সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তানের। দেশ বিভাগের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাবনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর এবং পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন চারটি জেলা-সহ উত্তরবঙ্গ পরিচিত ছিল। এই চারটি

জেলা হল দিনাজপুর, মালদা, দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি। ১৯৪৭ সালের পর অর্থাৎ ভারত স্বাধীন হবার পরেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে উত্তরবঙ্গের চেহারা কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। কেননা, দেশীয় রাজ্য কোচবিহার ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ভারত সরকারের অধীন হয় এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে দেশীয় রাজ্য কোচবিহাবপশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসেবে পরিগণিত হয়। আবার অন্যদিকে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য ১৯৫৬ সালে বিহারের পূর্ণিয়া জেলার কিছু অংশ পশ্চিমবঙ্গের দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। আরও পরে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য পশ্চিম দিনাজপুর জেলাটিকে ভাগ করে দুটি জেলা করা হয়- উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর। পশ্চিমবঙ্গের সর্বশেষ পুনর্গঠন ও পুনর্বিন্যাসের পর বর্তমান উত্তরবঙ্গ বলতে বোঝায় ছয়টি জেলাকে। যার প্রশাসনিক নাম জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, , দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনজপুর ও মালদা। এই ছয়টি জেলার সমষ্টি হলো বর্তমান উত্তরবঙ্গ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এই স্থানের প্রশাসনিক নাম 'জলপাইগুড়ি ডিভিশন' হলেও মৌখিক নাম উত্তরবঙ্গ যা বেশি জনপ্রিয় এবং বহুল প্রচলিত। আর বহুল প্রচলিত বলেই বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে 'উত্তরবঙ্গ' নামটি যুক্ত। এ প্রসঙ্গে জানা যায় -''সম্ভবত ব্রিটিশ আমল থেকেই এই আঞ্চলিকতাবাচক উত্তরবঙ্গ/নর্থবেঙ্গল অভিধাটি লোকের মুখে মুখে চলে এসেছে, এবং লোকের মনে এই প্রথানুগত্য এত প্রবল যে দেশবিভাগের পর যখন গোটা রাজ্যটিরই নাম দাঁড়াল পশ্চিমবঙ্গ/ওয়েষ্টবেঙ্গল, তখনও উত্তরবঙ্গ/নর্থবেঙ্গল নামটি অব্যাহত রয়ে গেল লোকের মুখে মুখে; শুধু মুখে মুখেই নয়, দেশ বিভাগের পর উত্তরবঙ্গগামী ট্রেনের নামকরণ করা হল নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম হল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারী পরিবহন সংস্থার নাম হল 'উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা'; এই সমস্ত নামই কেন্দ্রিয় ও রাজ্য সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রচারিত। এই সব প্রাতিষ্ঠানিক নাম থেকে বোঝা যায় উত্তরবঙ্গ /নর্থবেঙ্গল নামটির কোনো আনুষ্ঠানিক তথা প্রশাসনিক স্বীকৃতি না থাকলেও এই নাম সম্পর্কে জনগণের মৌখিক প্রথানুগত্যকে সরকারী প্রশাসনযন্ত্র প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছে। তাছাড়া সাহিত্যে, সাংবাদিকতায় এবং বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনে 'উত্তরবঙ্গ' শব্দটি আজ লিখিতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।''[২]

এক সময় বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল উত্তরবঙ্গ। আজ ছয়টি জেলা নিয়ে বিভাজিত উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে দেওয়া হলেও, সংস্কৃতিগত দিক থেকে হয়তো এর কোনো পরিবর্তন হয়নি। দেশভাগ হয়তো উত্তরের ভূ-খণ্ডকে আলাদা করেছে, কিন্তু আজও দুটো ভূ-খণ্ড, তাদের ভাষা, নদ-নদী, গাছপালা, শাক-সব্জি, খাদ্যাভাস সবটাই একই রয়েছে। শুধু তাই নয়, দুই খণ্ডের

গান বাজনা, চিন্তা-ভাবনা, পূজা-পার্বণ প্রভৃতিরও কোনো পার্থক্য ঘটেনি। কেবল এদের মাঝখানে যুক্ত হয়েছে শক্ত কাঁটাতারের বেড়া। যা মানুষের স্বাভাবিক চলাচলকে বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু যে কোনো উৎসব, পালাপার্বণে দুই ভূ-খণ্ডের মানুষ মাঝখানের কাঁটাতারকে উপেক্ষা করে অনেক কাছাকাছি চলে আসে। প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেলাগুলির উপর চোখ রাখলে এই দৃশ্য নজরে আসে। উদাহরণ স্বরূপ কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমায় সিতাই ব্লকের চামটা অঞ্চলে ধুন্দার মেলার (ধূমদাহ পাড়ের মেলা) কথা বলতে হয়। প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসের শুক্ল অষ্টমি তিথি থেকে কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া পর্যন্ত মোট বারো দিন ধরে এখানে এপার এবং ওপার বাংলার লোক একত্রিত হয়।

এই উত্তরবঙ্গের চারপাশে রয়েছে নানান রাজ্য ও রাষ্ট্র। উত্তরবঙ্গের প্রতিবেশি রাজ্যগুলি হল - উত্তরে সিকিম, পশ্চিমে বিহার ও পূর্বদিকে আসাম এবং প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলি হল- উত্তরে ভুটান, পশ্চিমে নেপাল এবং পূর্বদিকে বাংলাদেশ। আয়তনের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের অবস্থান সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের এক চতুর্থাংশ। অর্থাৎ যেখানে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৮৭,৮৫৩ বর্গ কি.মি, সেখানে উত্তরবঙ্গের আয়তন ২১,৬২৫ বর্গ কি.মি। আবার জেলাগুলির মধ্যে আয়তনে সবচেয়ে বড় জলপাইগুড়ি। নিচে একটি ছকের মাধ্যমে উত্তরের প্রত্যেকটি জেলা এবং তার আয়তন ও জনসংখ্যা উল্লেখ করা হল—

রাজ্যের নাম	**আয়তন**	**জনসংখ্যা**
জলপাইগুড়ি	৬,২৪৫ বর্গ কি.মি.	৩৪,০৩,২০৪
মালদা	৩,৭১৩ বর্গ কি.মি.	৩২,৯০,১৬০
কোচবিহার	৩,৩৮৬ বর্গ কি.মি.	২৪,৭৮,২৮০
দার্জিলিং	৩,১৪৯ বর্গ কি.মি.	১৬,০৫,৯০০
উত্তর দিনাজপুর	৩,১৩৯ বর্গ কি.মি.	২৪,৪৯,৮২৪
দক্ষিণ দিনাজপুর	২,২১৯ বর্গ কি.মি.	১৫,০২,৬৪৭

এই জনসংখ্যা অবশ্য ২০০১ সালের আদমসুমারীর তথ্যানুযায়ী।

ভূ-প্রাকৃতিক দিক থেকেও উত্তরবঙ্গ বৈচিত্র্যময়। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি ও সমতল অংশের মাটির মধ্যেও যেমন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় তেমনি এই দুই অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও কিঞ্চিৎ সংস্কৃতিগত পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। কৃষিজাত ফসল, উদ্ভিদ-বৃক্ষ-লতাতেও এই পার্থক্য নজরে আসে। এই ভিন্নতাই অবশ্য উত্তরের প্রকৃতির মধ্যে বৈচিত্র্য বহন করে চলেছে। আমরা উত্তরবঙ্গে র যে পার্বত্য বা তরাই অঞ্চলকে দেখি অর্থাৎ সমগ্র দার্জিলিং জেলা ও জলপাইগুড়ির কিছু অংশ

পাহাড়-পর্বত বেষ্টিত হবার ফলে এই অংশ তুলনামূলকভাবে একটু শীত প্রধান। আর শীত প্রধান হবার ফলে এখানকার পোশাক ও আহারের সামান্য ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও এই অঞ্চলের মানুষের সামাজিক কাজ-কর্মের মধ্যেও একটু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবার ডুয়ার্স অঞ্চল, বিশেষ করে পাহাড়ঘেষা সমতলেও এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই তরাই ও ডুয়ার্সের তুলনায় সমতলের জীবন অনেকটাই সহজ সরল বলে মনে হয়। তরাই ও ডুয়ার্সের তুলনায় প্রকৃতির আশীর্বাদে এবং নদ-নদীর অকৃপণ দানে সমতলের মানুষেরা বেশি জীবনকে উপভোগ করতে পারে। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল হবার ফলে এবং চাষ আবাদের জন্য উর্বর মাটি হবার ফলে সমতলের মানুষেরা অনেকটাই স্বচ্ছন্দে চলতে পারে। দুই দিনাজপুর, মালদা, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার কিছু অংশ বিস্তীর্ণ সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। এই অঞ্চলের আবহাওয়াগত তথ্য আমরা ফ্রান্সিস বুকানন হ্যামিল্টনের বৃত্তান্ত থেকে জানতে পারি। তিনি উল্লেখ করেছেন যে পূর্বে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা ২৬° সেন্টিগ্রেডের বেশি ছিল না। কিন্তু আবহাওয়ার বিবর্তনের ফলে বর্তমান তাপমাত্রার সঙ্গে এর বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। তার কারণ হিসাবে অবশ্য বিশ্ব উষ্ণায়নকেই দায়ী করা হয়। এর ফলে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার হ্রাস, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস এবং অল্প সময়ে অধিক বৃষ্টিপাতের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা হ্রাস, অনিয়মিত বৃষ্টি এই অঞ্চলের ভূ-প্রকৃতি, উদ্ভিদ, জীবজন্তুর জীবন-যাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। প্রসঙ্গত বক্সা অরণ্যের কথা বলা যেতে পারে। বিভিন্ন ভৌগোলিক সূত্র থেকে জানা যায় যে মাটির শুষ্কতার জন্য সেখানে এখন গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের সংখ্যা অনেকটাই কম। এছাড়াও এইসব অঞ্চলে একসময় যেসব প্রাণীর বসবাস ছিল এখন তা আর নেই বললেই চলে। কোচবিহারের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, একদা কোচবিহারের মহারাজা অরণ্যে শিকারে গিয়ে বাঘ শিকার করে আসতেন। কিন্তু এখন এরকম হিংস্র জন্তুদের আর হদিস পাওয়া যায় না। শুধু তাই নয়, অনেক উদ্ভিদও এখন হারিয়ে যাবার পথে। একদা এই অঞ্চলে সিঙ্কোনা, সর্পগন্ধা প্রভৃতি মূল্যবান উদ্ভিদের প্রাচুর্য ছিল, একারণেই হয়তো দার্জিলিং জেলার মংপুতে সিঙ্কোনার কারখানা স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু সিঙ্কোনা গাছের অভাবে তা আজ বন্ধ।

কিন্তু তারপরেও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে উত্তরবঙ্গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনেক এগিয়ে। এ কারণেই পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পে উত্তরবঙ্গের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। কেননা এই উত্তরবঙ্গের মধ্যেই শৈলশহর দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিমপঙ, মংপু, বক্সা, জয়ন্তী প্রভৃতি পাহাড় যেমন অবস্থিত তেমনি গা ছমছম করা জলদাপাড়া, গরুবাথান, চিলাপাতা, বৈকুণ্ঠপুর অভয়ারণ্য প্রভৃতি পর্যটন স্থানও অবস্থিত। এইসব অভয়ারণ্যে লুপ্তপ্রায় একশৃঙ্গ গণ্ডার, খড়গোশ, চিতা, হাতি, বাঘ, হরিণ

প্রভৃতির হদিশ এখনো পাওয়া যায়। অবশ্য এগুলির পরিচয় উত্তরের সংস্কৃতিতেও যুক্ত হয়ে আছে। যেমন উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লৌকিক দেবদেবীর বাহনে বিভিন্ন পশু-পাখির খোঁজ পাওয়া যায়। যে সমস্ত বন্যজন্তু বা পাখি এতদ্‌ঞ্চলে একদা দেখা যেত বা এখনো দেখা যায়, তারাই এইসব দেবতাদের বাহন হত। এখানে এইসব দেবতাদের নাম ও তাদের বাহনের একটি তালিকা দেওয়া হল —

ক্রমিক নং	**দেবদেবীর নাম**	**বাহন**
১.	ডাং ধরা	বাঘ
২.	মহাকাল	হাতি
৩.	মাশান	শোল মাছ/শুকর
৪.	পাগলা পীর	কুকুর
৫.	সুবচনী	হাঁস
৬.	যখা-যখিনী	বাঘ
৭.	সোনারায়	বাঘ
৮.	গোরখনাথ	গরু
৯.	কাতি ঠাকুর	ময়ূর
১০.	বিষহরা	সাপ
১১.	বাঘশূর	বাঘ

এগুলি ছাড়াও আরও অনেক দেবদেবী রয়েছে যা উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির আলাদা করেই পরিচয় বহন করে।

এছাড়াও রয়েছে পক্ষীদের বসবাসস্থান ‘কুলিক পক্ষি নিবাস’। যেখানে বহু দেশি-বিদেশি নাম না জানা পাখির সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে তারা মনের আনন্দে উড়ে বেড়াতে পারে। শান্তির নীড় হিসাবে তারাও যেন এই উত্তরবঙ্গকেই বেছে নিয়েছে। উপরন্তু বিভিন্ন জনজাতির মানুষের বাস এই উত্তরবঙ্গে। থারু, খেন, মুণ্ডা, তামাঙ, ভুটিয়া, লেপচা, খাসি, অসুর, সাঁওতালি, ওরাওঁ, রাজবংশী, নাগেসিয়া, খেড়িয়া, গাঢ়, রাভা, বোড়ো, ডুকপা, টোটো প্রভৃতি জনজাতিদের বাস এই অঞ্চলে। জানা যায় সমগ্র ভারতবর্ষে যতগুলি জাতি-জনজাতি মানুষের বাস রয়েছে, তার বেশিরভাগই এই ভূ-খণ্ডে বাস করে। তাই শেষে বলা যায় - উদ্ভিদ, পশু-পাখি, মানুষ সকলেই যেন শান্তির নীড় হিসেবে উত্তরবঙ্গকে বেছে নিয়েছেন। একারণে অনেকেই এই উত্তরবঙ্গ কে ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে থাকেন।

শুধু ভূমিরূপই নয়, উত্তরবঙ্গের প্রচলিত দেবদেবী ও লোকাচারের মধ্য দিয়ে এতদ্‌ঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুরও পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। যেমন- হুদুম দ্যাওয়ের পূজা। এটি লোকাচার কেন্দ্রিক পূজা। বৃষ্টির আগমনের জন্য গ্রামের নারীরা একত্রিত হয়ে রাতের অন্ধকারে বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে এই পূজা করে। জানা যায় সেই সময় কোনো কুমারী মেয়ের যোনীদেশে কাঁদা লেপন করে তার মধ্যে ধান গাছ রোপন করে বরুণ দেবতাকে কামনা করা হয়, এতে বরুণদেব সন্তুষ্ট হয়ে বর্ষার আগমন ঘটিয়ে দেন। অর্থাৎ এই 'হুদুম দ্যাও' পূজার মধ্য দিয়ে গ্রীষ্মকালীন খরার চিত্রই ফুটে ওঠে, যা এতদ্‌ঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিচয়ই বহন করে। আবার শীতের প্রচণ্ড প্রকোপ থেকে মানুষসহ গবাদি পশুদের রক্ষা করার জন্য তেরেয়া-মারেয়া লোকাচার পালন করা হয়। আবার বর্ষাকালে প্রচণ্ড শিলাবৃষ্টি থেকে মানবজীবন এবং কৃষি ক্ষেতকে রক্ষা করার জন্য উঠোনে সরষে ছিটানো হয়। এতে বিশ্বাস শিলা বৃষ্টি সরষের আকারে ভূমিতে পতিত হয়, এটিও উত্তরের একটি বিশেষ লোকাচার। সুতরাং আমরা দেখতে পারি যে ছয়টি ঋতুর মধ্যে তিনটি ঋতু (গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত) দৃষ্ট হয় যা উত্তরবঙ্গের প্রচলিত লোকাচারের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট । আবার এর মাধ্যমেও এতদ্‌ঞ্চলের উৎপাদিত শস্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন—'গছুরপুনা' এখানকার কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার। ধান , তামাক ও পাট চাষের সূচনাতে এই লোকাচার পালন করা হয়। এইসবের মধ্যেই আবার এখানকার অর্থনীতিরও মূল ভিত্তি স্পষ্ট হয়।

প্রাকৃতিক তথা ভৌগোলিক দিক থেকেও যেমন উত্তরবঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি এতদ্‌ঞ্চলের স্থানীয় লোকাচার ও লোকদেবীও এখানকার ভূ-প্রকৃতির পরিচয় উন্মোচনের ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক হতে পারে। প্রথমেই যদি আমরা এতদ্‌ঞ্চলের ভূমিরূপের কথা কল্পনা করি তবে দেখবো যে, এখানকার লৌকিক দেবদেবী এই অঞ্চলের ভূমিরূপের উপর নির্ভর করেই পূজিত হন। যেমন - তরাই ও ডুয়ার্সে যে ডাংধরা কিংবা মহাকাল পূজিত হয় তা অন্যত্র প্রায় পাওয়া যায় না। এই দুই দেবতার মূর্তি থেকে আমরা জানতে পারি যে ডাংধরার বাহন বাঘ এবং মহাকালের বাহন হাতি। দুটি দেবতার বাহনই বন্য পশু। একদা এই দুই পশুর অত্যাচারে এতদ্‌ঞ্চলের মানুষের বেঁচে থাকা প্রায় কঠিন হয়ে গেছে। তখন বাঘের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডাংধরা এবং হাতির প্রকোপ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা মহাকালের পূজা করা শুরু করেন। তবে কতদিন থেকে এই পূজা শুরু হয় তা জানা যায় না। তবে এখনো উত্তরবঙ্গের বনভূমি অঞ্চলে হাতির আক্রমণ দেখা যায়। তাই সেখানে মহাকালের কল্পনা এখনও সমানভাবেই চলেছে। এই দুই দেবতাই উত্তরবঙ্গের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচয় বহন করে চলেছে। আবার উত্তরবঙ্গের

তরাই ও ডুয়ার্সের আর একটি প্রচলিত দেবতা হল 'ভাণ্ডানী'। এই দেবীও উত্তরবঙ্গের ভূমিরূপের পরিচয় বহন করে চলেছে। কেননা এই পূজার জন্য পাহার সংলগ্ন এলাকাই প্রয়োজন। কেননা প্রচলিত মিথ কথা থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনদিনের জন্য দেবী দূর্গা পিতৃগৃহে গেলে দূর্গা পূজা হয়। কিন্তু এরপর দেবী যখন স্বামী গৃহে ফিরে চলে যান তখন যাবার পথে ডুয়ার্স অঞ্চলে দেবী বিশ্রাম নেয়। এজন্য সমতলে তিন দিন ধরে যে শারদীয়া হয় তারপর অর্থাৎ দশমীর দিন থেকে ভাণ্ডানী পূজা শুরু হয়। অর্থাৎ এই ভাণ্ডানী পূজা ডুয়ার্স সংলগ্ন এলাকাকেই নির্দেশ করে। আবার 'তোর্ষাপীর' কোচবিহারের ভূ-প্রকৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পীর দেবতার পাশে 'তোর্ষা' শব্দটি যুক্ত হওয়ায় কোচবিহারের প্রকৃতিকেই নির্দেশ করে। কেননা 'তোর্ষা' কোচবিহারের প্রধান নদী। এছাড়াও বিভিন্ন নদীর মিথ কথা থেকে শিবের বংশ পরিচয় জানা যায়। সেখানে যে নদীগুলির উল্লেখ আছে তা প্রত্যেকটি জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত। তাই সেই মিথ কথা থেকে জলপাইগুড়ি জেলার ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ জানা যায়।

নদ-নদী ঃ

উত্তরবঙ্গ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে যেকোনো উন্নত দেশগুলির সঙ্গে টেক্কা দিতে পারে। কেননা, উত্তরবঙ্গের একটা অংশ যেমন পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এবং এর পাদদেশ যেমন অভয়ারণ্যে আবৃত, ঠিক তেমনি সমতলভূমিও নদী দ্বারা বেষ্টিত। কেননা, পার্বত্য অঞ্চলকে অতিক্রম করে উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে অসংখ্য ছোট-বড় নদী। এছাড়াও একসময় উত্তরবঙ্গের সীমারেখা হিসেবে নদীকেই চিহ্নিত করা হয়েছে।

কোচবিহার জেলার গুরুত্বপূর্ণ নদী হল তোর্ষা। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নদী হল - কালজানি, ধরলা, মানসাই, সঙ্কোশ, গদাধর ইত্যাদি। তবে কালজানি, ধরলা ও তোর্ষার তীরবর্তী মানুষেরা এইসব নদীগুলির উপর নির্ভর করেই জীবন নির্বাহ করে। অনেক সময় এগুলি আবার তাদের জীবনে অভিশাপ রূপেই দেখা দেয়। তোর্ষা নদীকে এতদ্‌ঞ্চলে মুসলমানদের পীর দেবতা রূপে পূজা করা হয়। এজন্য তোর্ষা পুরুষ দেবতা। এই নদীকে ঘিরে পার্শ্ববর্তী মানুষের মনে নানা লোকবিশ্বাস ও লোককাহিনী তৈরি হয়েছে। কোচবিহার জেলার নদীগুলিকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে আমরা দেখতে পারি একই নদী স্থানভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়ে উঠেছে। যেমন জলঢাকা নদীটি জলপাইগুড়ি হয়ে যখন কোচবিহারে প্রবেশ করে তখন তার নাম হয়ে যায় মানসাই। আরও পরে এই নদীটি সিঙ্গিমারী, তোর্ষা ও মানসাইয়ের মিলিত স্রোত ধরলা নামে পরিচিত। আবার তুফানগঞ্জ মহকুমায় যে কালজানী নদীটির পরিচয় পাই সেটিও পাহাড়ে ভিন্ন

নামে পরিচিত। তবে কোচবিহার জেলার এইসব নদীর গতিপথ বারবার পরিবর্তন হয়েছে। উল্লেখ্য যে , প্রাচীনকালে এইসব নদীর মাধ্যমে বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য হতো - যা দেশ স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকে বন্ধ।

জলপাইগুড়ি জেলাতে নদ-নদীর সংখ্যা একটু বেশি। মানুষের শরীরের শিরা উপশিরার মতোই এখানকার নদীগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত তিস্তা নদীই হল উত্তরবঙ্গের সবচেয়ে বড় নদী। তিস্তার উৎপত্তি সম্পর্কে জানা যায়— ''তিস্তার উৎপত্তি নিয়ে শুধু ভূগোল কথা নয়, আকর্ষক পুরাণ কথাও আছে। কালিকা পুরাণে আছে এই নদী দেবাদিদেব শিবের সৃষ্টি। শিবভক্ত এক দৈত্য দেবী পার্বতীর পূজা দিতে অস্বীকৃত হলে পার্বতী তার সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করেন। এই যুদ্ধে ক্লান্ত শিবভক্ত দৈত্য তৃষ্ণা নিবারণের জন্য শিবের কাছে জল প্রার্থনা করেন, শিব মহিমায় পার্বতীর বুক থেকে তিস্তা নদী নির্গত হয় তৃষ্ণা নিবারণের জন্য।''[৩] তিস্তা পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে যতই সমতলের দিকে এগিয়ে গিয়েছে ততই বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। যা সমতলের মানুষের জীবনে প্রলয় স্বরূপ। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নদীগুলি থেকে তিস্তার জল বহনের ক্ষমতা অনেক বেশি। যার ফলে তিস্তার পাশে এই নদীগুলি অনেকটাই ম্লান। বর্ষায় ভয়ঙ্কর রূপে তিস্তা দেখা দেয় বলে তিস্তা তীরবর্তী মানুষেরা একে 'তিস্তা বুড়ি' জ্ঞানে পূজা করে। তোর্ষা নদীর মতোই তিস্তাকে কেন্দ্র করেও এতদ্‌ঞ্চলের মানুষের মনে নানান লোককথা, লোককাহিনীর সঞ্চার হয়েছে। তিস্তার আদি নাম ত্রিস্রোতা। পুরাণেও আমরা (কালিকা পুরাণ) এই তিস্তার প্রসঙ্গ পাই। তিস্তার উৎপত্তি সম্পর্কে এতদ্‌ঞ্চলে যে লোককাহিনী প্রচলিত আছে তা হল দেবী পার্বতীর বক্ষ থেকে তিনটি স্রোত নেমে এসে তিস্তার জন্ম হয়েছে, এজন্য তিস্তা ত্রিস্রোতা। কালিকা পুরাণ মতে এই বিশ্বাস হয়তো অনেকের কাছেই নিছক কল্পনা। কিন্তু পার্বত্য এলাকায় 'তিস্তা মাঈ' যে মহাদেবের পত্নী, তার প্রমাণ মেলে বোড়ো সমাজে প্রচলিত শিব ও ভগবতী পূজায়। তাদের বিশ্বাস রাজা খারুংফাই তাদের সমাজে ভগবতী পূজার প্রচলন করেন। সুতরাং কিরাতদের দেওয়া দি-স-তা বা তিস্তার সাথে ভগবতী বা পার্বতীর নামটি যুক্ত হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। তাই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য এখানকার মানুষেরা তিস্তার কাছে মানত করে এবং পূজা করে। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার রায়ডাক, জলঢাকা, মুজনাই নদী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি বাদ দিয়েও জেলার করতোয়া, তালমা, সাহু, করলা, সাঞ্জাই, গিলাণ্ডি প্রভৃতি নদীও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লক্ষণীয় এসব নদীকে কেন্দ্র করেও নানান মিথ গড়ে ওঠে। মিথটি হলো--- ''লৌকিক শিবের আত্মীয়-স্বজন তথা পরিবার নানা দিকে ছড়িয়ে আছে। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার উত্তরাংশে কাসিমচরা (পানবাড়ি) নামক স্থানের

মিথ লৌকিক দেবী 'কুলাঢাকি' শিবের বোন এবং তিস্তাবুড়ি দেবীও শিবের পরিবারের একজন। তিস্তাবুড়ির স্বামী ধরলা নদী বা বুড়া ধল্যা বা বুড়া কর্তা ঠাকুর। তাদের ছেলে ও মেয়ে যথাক্রমে করলা (নদী) এবং দুলালী। বর্তমানে দুলালী জলপাইগুড়ি শহরের আদরপাড়ায় দুলালী দিঘি নামে চিহ্নিত। আবার ভিন্ন মিথ কথায় তিস্তাবুড়িরা তিন বোন, অন্য দুই বোন গিলাণ্ডী বুড়ি (নদী) যিনি ধূপগুড়ির সন্নিহিত অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত। অপরজন সাঞ্জাইবুড়ি যিনি আলিপুদুয়ার মহকুমার অন্তর্গত পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম দিয়ে প্রবাহিত।"[৪] এছাড়াও জানা যায় করতোয়া নদী প্রাচীন কামতাপুর রাজ্যের সীমানা ছিল। যার উপর দেবী চৌধুরাণীর বজরা যাওয়া আসা করতো।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার অধিকাংশ নদীই হিমালয় থেকে আগত। এইসব নদীর মধ্যে মহানন্দা, বালাসন, মেচি প্রধান। দার্জিলিং জেলার বড় নদী হলো মহানন্দা। এটি কার্শিয়াঙের কাছে পাগলাঝোরা থেকে উৎপত্তি হয় এবং এরপর শিলিগুড়ি হয়ে বাংলাদেশে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই মহানন্দাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় মানুষেরা লোকবিশ্বাস ও লোককাহিনী সৃষ্টি করেছেন। তবে মহানন্দা যে প্রাচীন নদী তার প্রমাণ বহুপুরাণে পাওয়া যায়। বর্তমান পাহাড় থেকে প্রচুর পরিমাণ পলি, বালি বহন করতে করতে মহানন্দা পূর্বের যৌবন হারিয়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, এইসব পলি, বালি, পাথর বহন করে সমতল ভূমিতে নিয়ে আসার ফলে চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এছাড়াও 'বালাসন' নদী এখানকার স্থানীয় মানুষদের জীবিকা অর্জনের উপায় হয়ে উঠেছে। পাহাড় থেকে প্রচুর বালি পাথর বহন করে আনার ফলে প্রচুর বেকার যুবকের কর্মস্থল হয়েছে।

এছাড়াও উত্তরবঙ্গের দুই দিনাজপুর জেলায় যে সমস্ত নদী রয়েছে সেগুলি হল আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, টাঙ্গন, সুই, নাগর ইত্যাদি। নাগর নদীটি মহানন্দার উপনদী। যার উৎস বাংলাদেশের নিম্ন জলাভূমি। এর আবার দুটি উপনদী রয়েছে - নোনা ও কুলিক । কুলিক নদীর তীরে বর্তমান 'কুলিক পক্ষী' নিবাস গড়ে উঠেছে। এছাড়া টাঙ্গন নদীর উল্লেখ আমরা মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাই। এই জেলায় উল্লেখযোগ্য আরও দুটো প্রাচীন নদী হল আত্রেয়ী ও পুনর্ভবা। এই দুটি নদীকে কেন্দ্র করেও নানান মিথ গড়ে উঠেছে। আত্রেয়ীকে শিবের কন্যা রূপে মনে করে পূজা করে স্থানীয় বাসিন্দারা। বর্ষাকালে আত্রেয়ী ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

মালদা জেলার নদীগুলি হল যথাক্রমে বেহুলা, মহানন্দা, কালিন্দী, ভাগীরথী ইত্যাদি। কালিন্দী গঙ্গা নদীর একটি শাখা, যা পরবর্তীকালে মহানন্দার সঙ্গে মিশেছে। বেহুলা নদীটি বাংলাদেশের নিম্নজলাভূমি থেকে উদ্ভূত হয়ে মহানন্দায় গিয়ে মিশেছে। এই বেহুলাকে কেন্দ্র করে সেইসব অঞ্চলে নানান লোককথা প্রচলিত আছে। মনসামঙ্গলের কাহিনীতে আমরা দেখি বেহুলা মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে কলার মান্দাসে ভেসে চলে। ভেসে যাবার সময় এরা কালিন্দী নদী

হয়ে এই নদীতে এসেছিল বলে এই নদীর নাম বেহুলা।

নদ-নদী অধ্যুষিত উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। এরা কৃষিজীবী হলেও উত্তরবঙ্গের সর্বত্র চাষের অনুকূল নয়। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং ও কোচবিহারের কিছু অংশ পাহাড় থেকে নেমে আসা নদীর তীরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে কাকরের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই এখানকার জমি চাষের পক্ষে বাকি জেলাগুলি থেকে প্রতিকূল। এজন্য পর্বতের পাদদেশ সংলগ্ন জমি ঢালু হওয়ায় সেখানে চা ও কমলালেবু ভালো হয়। অন্যদিকে সমতল ভূমিতে ধান, গম, পাট প্রভৃতি রবি শস্য ও খারিফ শস্য চাষ করা হয়। এছাড়া কোচবিহার জেলা তামাক চাষের জন্য বিখ্যাত।

উত্তরবঙ্গের লোকাচার ঃ

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর বাস হওয়ার ফলে লোকাচারগত দিক থেকেও বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। নির্দিষ্ট কোনো জনগোষ্ঠীর গভীর আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে কখনো কখনো ব্যক্তিগত বা পরিবারগত বা সামাজিক দিক থেকে মঙ্গলকামনায় কোনো ঐতিহ্য যখন বংশ পরম্পরায় প্রযোজ্য হয়, তখন সেই ঐতিহ্যকে লোকাচার বলা যেতে পারে। এই লোকাচার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লোকায়ত দেবদেবী, অপদেবতা, অলৌকিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে কিংবা অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার সাধনায় বিভিন্ন লোকাচার পালন করা হয়। আবার দীর্ঘদিনের বিশ্বাস থেকেও লোকাচারের উৎপত্তি হতে পারে। উত্তরবঙ্গে গোচরপনা, বিশুয়া-পরব, আমাতি, ঘরে রসুন ঝুলিয়ে রাখা, গুয়াকাটা, মিতরধরা, জলছিটা, বট-পাকড়ির বিবাহ, জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো, ভোগা দেওয়া, হাল যাত্রা প্রভৃতি লোকাচার প্রচলিত আছে।

উত্তরবঙ্গে অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তিই হল কৃষি। আর এই কৃষিজাত একটি ফসল হল রসুন। এতদঞ্চলের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বিষুয়ার দিন 'বড় ঘর' এর দরজায় এই রসুন ঝুলিয়ে রাখে। এটি এখন লোকাচারে পরিণত হয়েছে। জানা যায় বাড়ির অমঙ্গল দূর করার জন্য কিংবা বিভিন্ন গ্রহের দোষ কাটানোর জন্যই এই রসুন ঝুলিয়ে রাখা হয়। আবার এতদ্‌ঞ্চলে ফুলে ফলে পূর্ণ বৃক্ষে বা ক্ষেতে ছেড়াঁ জুতো বা ভাঙ্গা মাটির কলসী, ঝাড়ু প্রভৃতি বেঁধে দেওয়ার লোকাচারও প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে চাষী মনে করে যে তার সেই সুফলা বৃক্ষটি যেন অন্যের ঈর্ষার কারণ না হয়। এতে উত্তরবঙ্গবাসীর বিশ্বাস যে এই লোকাচারটি পালন করলে ফসলের কোনো ক্ষতি হবে না। এগুলি ছাড়াও বৃক্ষ কেন্দ্রিক লোকাচারের মধ্যে বট-পাকুড়ের বিবাহ ও জিগাগাছের সঙ্গে সই পাতানো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখি অনেক নব দম্পতির সন্তান গর্ভেই মারা যায় বা জন্মের পরেই মারা যায়। নবজাতক দীর্ঘক্ষণ নিজের আয়ু ধরে রাখতে

পারে না। এক্ষেত্রে সেই সন্তান সম্ভবা নারীকে জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতিয়ে দেওয়া হয়। কেননা জিগা এমন একটি বৃক্ষ যার প্রাণ কই মাছের মতো। যার একটি ডাল অযত্নে ফেলে রাখলেও গাছ জন্মায়। এতদঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস যে এতে নবজাতকটিও জিগাগাছের মতো প্রাণ পাবে। আবার যে দাম্পত্যে কোনো সন্তান নেই, সেই দাম্পত্যে সন্তান কামনা করে বট-পাকুড়ের বিবাহ দেওয়া হয়। একারণেই নিজের সন্তান ভেবেই মহাধুমধাম করে এই বিবাহ সম্পন্ন করা হয়।

নবজাতক সন্তানের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চুল কাটা যায় না। ৬ মাস, ১২ মাস কিংবা ১৮ মাস পর্যন্ত এই চুল রাখা হয়। এই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করে গেলে আনুষ্ঠানিকভাবে মস্তক মুণ্ডন করা হয়। এই অনুষ্ঠানকে 'চুরাকরণ' বলা হয়। বাড়ির বাইরে সাধারণত এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। বুড়ি দেবতা কিংবা যার যে দেবতার কাছে মানত থাকে সেই দেবতার কাছে কেটে ফেলা চুলগুলি নিবেদন করা হয় কিংবা মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এ বিষয়ে W.W. Hunter তাঁর Statistical Account of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন — "The rite of Chura-Karna is to all intents and purpose, a formal Profession of faith or entry into Hinduism and must be undergone by every child' male or female at some time before marriage."[৫]

বিশ্বাসকেন্দ্রিক লোকাচারের মধ্যে অন্যতম হল 'তেরাবেরা'। এটি মূলত ওপার বাংলা থেকে যারা এপার বাংলায় এসে বসবাস করেন তাদের মধ্যেই বেশি দেখা যায়। ভাদ্র মাসের 'তেরো' তারিখে এই লোকাচারটি পালন করা হয়। এজন্যই হয়তো এর নামও এরকম। সেদিন একটি পাকা তাল বড় ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রাখা হয়। গৃহবাসীর মঙ্গল কামনায় এবং যাত্রা শুভ করার জন্যই দেওয়া হয় বলে বিশ্বাস।

সামাজিক লোকাচারের মধ্যে 'মিতরধরা'র পরিচয় পাওয়া যায়। রাজবংশী বিবাহের ক্ষেত্রে 'মিতরধরা' একটি সাধারণ নিয়ম। আমরা জানি বিবাহের মধ্য দিয়েই একজন নারী-পুরুষ সমাজে একসঙ্গে বসবাসের স্বীকৃতি পায়। কিন্তু এই নবদাম্পত্যকে সমাজ যদি স্বীকৃতি দান না করে তবে কখনোই তা সফল হতে পারে না। কিংবা দুজন অপরিচিত নর-নারী যদি খুব কম সময়ের মধ্যে পরিচিত হতে না পারেন তবেও তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবেন না। তাই নবদম্পতিকে সংসারধর্মে গতিশীল করার জন্য অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন। একারণেই মিতর ধরা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই এই 'মিতর'এর সঙ্গে মিত্রতা শেষ হয়ে যাবে না, সারাজীবন এমনকি মৃত্যুর পরেও পারিবারিক দিক থেকে এই মিত্রতা বয়ে নিয়ে যেতে হয়। অর্থাৎ এই মিতরের সঙ্গেও পরলোকে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে বলে বিশ্বাস করা হয়। এর

গুরুত্ব সম্পর্কে চারুচন্দ্র সান্যাল উল্লেখ করেছেন — "The mistor is forbidden to touch the wife of his friend and so the presents were thrown on her hands from a distance." [৬]

কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচারের মধ্যে সর্বজনবিদিত একটি লোকাচার হল 'ভোগাদেওয়া'। কালিপূজার দিন সন্ধ্যাবেলায় কতগুলি ঘি এর প্রদীপ ধান ক্ষেত বা অন্য যে কোনো ক্ষেতে দিয়ে আসার নামই 'ভোগাদেওয়া'। লক্ষণীয় এই সময় উত্তরবঙ্গে আমন ধান বেরোনোর সময়। এই সময় ধান গাছে 'মাজরা পোকা' নামক একধরনের পোকা আক্রমণ করে। এইসব ক্ষতিকর পোকাদের হাত থেকে জমির ফসলকে রক্ষা করার জন্য 'ভোগা' দেওয়া হয়। ঠিক এই ধরনের আর একটি লোকাচার হল 'ভেরাঘর ছোবা'। দোল পূর্ণিমার আগের দিন কোনো ফসলযুক্ত জমির মাঝে একটি ঘর তৈরি করা হয়। সেই ঘরে ভেড়া রূপী একজন মানুষকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে সেখানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। পরে লোকটি ভেড়ার মতো ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে বাইরে বেড়িয়ে আসে। আসলে এই সময়ও যেন ফসলে কোনো পোকা আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য এই ধরনের লোকাচার পালন করা হয়।

কৃষিকেন্দ্রিক আর একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার হল গছিপোনা। এগুলি ছাড়াও মানুষের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কেন্দ্রিক অনেক লোকাচার রয়েছে, যেগুলি আলাদা করে উত্তরবঙ্গের সমাজ সংস্কৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

আমরা জানি সভ্যতার সূচনায় মানুষের ঘর-বাড়ি বলতে কিছু ছিল না। তখন তারা গুহায়, বনে-জঙ্গলে বাস করতো। সেখান থেকে নানা পশু-পাখি, জন্তু-জানোয়ার শিকার করে, কাঁচা মাংস খেয়ে তারা জীবন ধারণ করতো । আর গাছের ছালই ছিল তাদের লজ্জা নিবারণের একমাত্র উপায়। কিন্তু ধীরে ধীরে এই মানব সভ্যতার ক্রমিক উন্নতি দেখা যায় এবং অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের জন্য তারা নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে। তারা কৃষিকাজ শিখে যায় এবং কি করলে ভালো ফসল চাষ করা যাবে, কি করলে কৃষিতে লাভবান হওয়া যাবে তার জন্য তারা নানা পদ্ধতি অবলম্বন করে। তখন থেকেই তাদের মধ্যে নানা ধরনের বিশ্বাস জন্ম নেয়। সেই বিশ্বাস বশত তারা নানা ধরনের পূজা করে, যেমন দীর্ঘদিন ধরে বৃষ্টি না হলে বৃষ্টি আনার জন্য তারা 'হুদুমদ্যাও' পূজা করে। কেননা তাদের বিশ্বাস 'হুদুম দ্যাও' সন্তুষ্ট হলে সেই অনাবৃষ্টি স্থানে বৃষ্টি হবে। ঠিক এই ধরনেরই একটি লোকাচার 'গুছিবোনা' বা 'গোছরপোনা' বা 'গছিপোনা'।

এই ধরনের লোকাচার সাধারণত প্রতি বছর বর্ষা ও শীতকালেই হয়ে থাকে। এটি কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সব ধর্মের কৃষকেরাই এই লোকাচার পালন করে

থাকে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে একটি বিশেষ অঞ্চল হল উত্তরবঙ্গ, যেটি হিমালয় সংলগ্ন। হিমালয় সংলগ্ন এই উত্তরবঙ্গের মধ্যে অবস্থান করে তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চল। এই তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে দুটি বিশেষ জেলা হল কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি। এই বিশেষ জেলা দুটিতে অধিকাংশ মানুষই কৃষিজীবী। তার মধ্যে কোচবিহার জেলার কৃষকদের অন্যতম অর্থকরী ফসল হল তামাক। কোচবিহার জেলার সম্পূর্ণ অংশে এবং জলপাইগুড়ি জেলার কিছু কিছু অংশে এই 'গছিপোনা' লোকাচার পালন হয়ে থাকে। তবে অন্যান্য স্থানের যে হয় না, তা নয়। বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত রংপুর জেলাতেও এই লোকাচার দেখা যায়। এককথায় যেসব স্থানে তামাক কিংবা ধান চাষ বেশি দেখা যায়, সেইসব স্থানেই এই লোকাচার বেশি প্রচলিত। ধান ও তামাকই যেহেতু এই অঞ্চলের প্রধান ফসল তাই এখানকার অনেক কৃষক আছে যারা সারা বছর অন্য কোনো চাষ না করে শুধু ধান ও তামাক চাষ করে। কেননা, এতে বেশি লাভবান হওয়া যায়। এজন্য ধান চাষে ফলন যেন বেশি হয় এবং তামাক পাতার রঙ যেন ভালো হয় সেই জন্য তারা এই 'গছিপোনা' অনুষ্ঠান করে। অর্থাৎ তামাক প্রধান অঞ্চলে তামাক ও ধান প্রধান অঞ্চলে ধান রোপণের আনুষ্ঠানিক পর্বটির নামই 'গছিপোনা'।

বাড়ির কর্তার (পুরুষ) দ্বারাই সাধারণত এই লোকাচার পালন করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ বলা যেতে পারে লোকাচারটি পুরুষকেন্দ্রিক। তবে মহিলাদের যে প্রয়োজন হয় না, তা নয়। মহিলারা শুধু পূজার উপকরণ জোগাড় করে দেয়। এই লোকাচার পুরোহিত বর্জিত ,বাড়ির কর্তাকেই তা পালন করতে হয়।

'গছিপোনা' বা 'গোছরপোনা'লোকাচারে কোনো দেবদেবীর মূর্তি থাকে না। তবে একটি বড় মানকচুর পাতা থাকে। সেখানে তেল সিঁন্দুর ও কালি দিয়ে তাতে কতগুলি ফোঁটা চিহ্নিত করে পাতাটিকে রঙিন করা হয়। এই রঙিন মানকচুর পাতাটিকেই জমির মাঝখানে পুঁতে লোকাচার পালন করা হয়। যার উপকরণ হিসাবে গুটিকতক পান ও সুপারী থাকে এবং একটি এক টাকা বা দুই টাকা বা পাঁচ টাকার মুদ্রা থাকে। এছাড়াও একটি প্রদীপ জ্বালানো হয়। যিনি লোকাচারটি পালন করেন তিনি মানকচুর পাতাটি জমির মাঝখানে পুঁতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, সেখানে একটি মুদ্রাও দেওয়া হয়। তারপর পান সুপারি মুখে দিয়ে চিবোতে থাকেন। এই সময় পাসুন (নিড়ানি) দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেখানে পাঁচটি কিংবা সাতটি তামাক গাছ রোপন করা হয়। তবে এই তামাক গাছ রোপন করার পর সেই তামাক গাছগুলির পাতার উপর পান-সুপারির পিচকিরি (থুথু) ফেলা হয়। শেষে প্রণাম করে পূজারী বাকি পান সুপারী উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে বিতরণ করেন। তারাও তাদের মুখের লাল টক্‌টকে পিচকিরি (থুথু) সেই তামাক পাতার উপর ফেলে।

এইভাবে পূজার প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়ে যায়। অনেকেই আবার এখানেই অনুষ্ঠান শেষ করে দেন। কিন্তু যাদের সামর্থ বেশি তারা রাত্রি কিংবা দুপুরবেলা সকল শ্রমিকদের (যারা তামাক বুনবে) মাংস ভাত বা মাছ ভাত খাইয়ে দেয়। যাকে বলা হয় 'মাগুর কিষাণ' বা 'মাগন কিষাণ'। এইভাবেই সমগ্র লোকাচার শেষ হয়ে যায়। তবে প্রাথমিক পর্ব শেষ হয়ে গেলেই কয়েকজন শ্রমিক মিলে সারা জমিতে তামাক বোনে।

লক্ষণীয়, এই লোকাচারে যে মানকচুর পাতা, পান-সুপারি ও মুদ্রা দেওয়া হয়, তার বিশেষ তাৎপর্য আছে। মানকচুর পাতা ছাড়া অন্য কোনো পাতা তামাক চাষের 'গোচরপনায়' ব্যবহার করা করা হয় না, কারণ তাদের বিশ্বাস, যত বড় পাতা ব্যবহার করা যাবে, তামাক পাতাও তত বড় হবে, আর মানকচুর পাতা তুলনামূলক ভাবে পুরু, এজন্য তামাক পাতাও পুরু হবে বলে তাদের বিশ্বাস। আর পান সুপারী খেয়ে তার পিচকিরি তামাক পাতার উপরে দেওয়ারও একটা বিশ্বাস আছে। তারা মনে করে যে লাল টুক্‌টুকে পিচকিরি তামাক পাতায় ফেলা হলে, তামাক পাতার রঙও ওরকমই হবে, এবং এই কারণবশতই তারা মানকচুর পাতাটি রঙিন করে।

যে দেবতার উদ্দেশ্যে এই লোকাচার পালন করা হয় সেটি আসলে কোন্ দেবদেবীর; সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে এ নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায় নানা মতভেদ। আসলে দীর্ঘদিন ধরে লোকায়ত সমাজে এই ধরনের লোকাচার পালন হয়ে আসার ফলে অনেক কৃষকেরাও জানে না যে তারা কোন দেবতার পূজা করছে। কেননা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে এই ধরনের লোকাচার পালিত হয়ে আসছে, তাই তারাও করছে। ড. গিরিজাশংক র রায় অবশ্য এই গচিবুনাকে লক্ষ্মীর পূজা নয় বলেই মনে করেন। আবার চারুচন্দ্র সান্যাল মনে করেন এটি ধরিত্রীদেবীর পূজা। এই ধরিত্রীদেবীর অন্য নাম বসুমতী ঠাকুরাণী। গিরিজাশংকর রায়ও শেষ পর্যন্ত এই পূজাকে বসুমতি ঠাকুরাণীর পূজা বলেছেন। আবার অনেকে বলেন এটি লৌকিক কৃষিদেবতা শিব।

আবার এই লোকাচারের নাম নিয়েও নানা মতভেদ দেখা যায়। তবে মতভেদ থাকলেও প্রত্যেকটিই এক। হয়তো স্থানভেদে আলাদা। কোচবিহারে 'গোচরপোনা' বলা হয়। এর কারণ হিসাবে বলা হয় 'গোচর' কথার অর্থ আশ্রয়, আর 'পোনা' অর্থে ছোট চারাকে বোঝায়। সেইদিক থেকে নতুন চারা বোনাকে 'গোচরপোনা' বলা হয়। আবার অনেকেই 'গছিবুনা' বলে থাকেন। মনে হয় এতে 'গছি' অর্থে 'গুচ্ছ' এবং 'বুনা' অর্থে চাষ করা। সেই সূত্রে একগুচ্ছ কোন কিছু চাষ করাকে 'গছি বুনা' বলা যায়। এসব দিক থেকে প্রত্যেকটি নামই ঠিক।

এছাড়া আরও কিছু কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার রয়েছে। যার মধ্যে 'ধানের আগ নেওয়া' বা 'ফুলআনা' লোকাচারটি অন্যতম। মূলত কার্তিক মাসের শেষের দিকে 'আগ নেওয়া' পালিত

হয়। নারী নিয়ন্ত্রিত এই লোকাচারের জন্য পুরোহিত বা অধিকারীর প্রয়োজন হয় না। বাড়ির গৃহিনীরা মাঙ্গলিক কূলা, ধূপ-ধুনা, কলা প্রভৃতি নিয়ে আমন ধান ওঠার আগে ধান ক্ষেতে যায় এবং সেখান থেকে সমস্ত লোকাচার পালন করে বেজোর সংখ্যক শিষ যুক্ত ধান গাছ নিয়ে আসে। কোথাও কোথাও ছোট শিশুরা এই শিষযুক্ত ধান গাছ নিয়ে এসে বাড়ির তুলসী তলায় রেখে দেয়। এরপর তুলসীতলায় গৃহদেবতার পূজা করা হয়। ধান কাটার পূর্বেই মূলত এধরনের লোকাচার পালন করা হয়।

এ ধরনের কৃষিকেন্দ্রিক আর একটি লোকাচার হল 'নয়াকরা'। স্থান ভেদে, জাতিভেদে এর বিভিন্ন নামও রয়েছে। কোথাও একে 'নবান্ন',কোথাওবা 'নয়াখই'ও বলা হয়। আসলে নতুন ধান (আমন) গৃহে তুলে সেগুলি খাবার আগে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে তুলসীতলায় বিলি করা হয়। যেগুলি বিভিন্ন পাখি, কুকুর, বিড়াল এসে খেয়ে নেয়। তারপর সেই নতুন ধানের ভাত সকলকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হয়। এই রীতিকেই 'নয়াকরা' বা 'নয়াখই'বা 'নবান্ন' উৎসব বলে। সাধারণত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন এই ধরনের লোকাচার পালন করা হয়।

এছাড়াও উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন লোকায়ত দেবদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়, যার মধ্যে লুপ্ত কিংবদন্তীরও হদিশ পাওয়া যেতে পারে। উত্তরবঙ্গের প্রচলিত একটি দেবতা হল গোরখনাথ ঠাকুর। আসলে গোরখনাথ এক ঐতিহাসিক ব্যক্তি, যা আমরা নাথ সাহিত্য থেকে পেয়ে যাই। তিনি যে নাথপন্থীদের যোগী পুরুষ ছিলেন এবং তিনি যে গুরু মীননাথকে কদলিরাজ্য থেকে উদ্ধার করেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বর্তমান উত্তরবঙ্গে এই গোরক্ষনাথ গরুর দেবতা হিসেবেই পূজিত।

তবে এই গোরখনাথ এক কি ভিন্ন সে নিয়ে মতভেদ আছে। তবে এক বা ভিন্ন যাই হোকনা কেন, গোরখনাথের প্রভাব যে উত্তরবঙ্গেও ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়। কিংবা এই গোসম্পদ রক্ষাকারী দেবতা গোরখনাথই এতদ্‌ঞ্চলে নাথপন্থীদের অস্তিত্বের কথা প্রমাণ করে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে এই পূজার পাশাপাশি গানেরও প্রচলন আছে।

উত্তরবঙ্গের আর একটি লোকায়ত দেবতা হল মহারাজ ঠাকুর। মূলত দুই দিনাজপুরে এই দেবতার পূজা প্রচলিত। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন যে এই মহারাজা ঠাকুর আসলে রাজা গণেশ। পরবর্তীকালে ইনিই মহারাজা রূপে এতদ্‌ঞ্চলে পূজিত হন। এটিও একটি কিংবদন্তী। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি জেলার ফালাকাটায় তুলকাটা ঠাকুরের হদিশ পাওয়া যায়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় তুলাকাটা উক্ত স্থানের এক প্রজাবৎসল জমিদার ছিলেন। পরে তিনিই সেখানে দেবতায় উন্নীত হন। একইভাবে কোচবিহারের পীর দেবতার কথাও বলতে হয়। তুর্কী আক্রমণের পর

এতদঞ্চলে অনেক পীরের আবির্ভাব হয়। যারা মূলত ইসলাম ধর্ম প্রচারক ছিলেন। পাগলাপীর, তোর্ষাপীর, সত্যপীর প্রমুখেরা এরকমই ব্যক্তি। পরে এরাই উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে যায় এবং দেবশক্তির অধিকারী হয়।

কোচবিহার জেলা একদা অরণ্যে আবৃত থাকার ফলে সেখানে অনেক হিংস্র জীব-জন্তু বাস করতো। সেইসব হিংস্র প্রাণীদের ভয়ে সেখানকার মানুষেরা সবসময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। বিশেষ করে বাঘের ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি। কেননা বাঘ মানুষ থেকে শুরু করে গবাদিপশু পর্যন্ত ভক্ষণ করে চলে যেত। সেখানে নিরুপায় মানুষদের কিছুই করার ছিল না। তখন তারা ব্যাঘ্র বাহন যুক্ত লোকায়ত দেবদেবীকে কল্পনা করে পূজা শুরু করলো, যেসব পূজা আজও প্রবহমান। কালের প্রবাহে মানুষের সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেবদেবীরাও হয়তো পরিবর্তিত হয়েছে। এরকমই এক লোকায়ত দেবতা হল বুড়াঠাকুর। কোচবিহার জেলার পুণ্ডিবাড়ির পেস্টাঝার (২নং) নামক গ্রামে এই বুড়াঠাকুরের পূজা করা হয়। প্রায় শতাধিক বছরের পুরানো এই পূজায় এখনও লোকায়ত ধারা বিরাজমান। একই পাটে কালি, শিব, শিতলা সহ গ্রাম দেবতার উল্লেখ রয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় এখানে যে পাঁচটি গ্রাম দেবতার ঢিপি রয়েছে তা মূলত পঞ্চপাণ্ডব। প্রতিবছর কার্তিক মাসের অমাবস্যায় উক্ত পূজা করা হয়। গ্রামের রাজবংশী পুরুষ মহিলারা এই পূজা করে। বুড়া পূজা মূলত পুরুষরাই করে। বিশ্বায়নের যুগেও এই পূজার এখনও বিস্তার দেখা যায়। পাশ্ববর্তী গ্রাম থেকে ভক্তরা এই পূজা করতে আসার ফলে তারা এখন নিজস্ব বাড়িতেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেখানেই পূজা দেন। ফলে প্রাচীন মান্দিরটি এখনও চালা ঘরেই সীমাবদ্ধ। বর্তমানে এখানে মাগন তুলে এই পূজা হয়। বাড়ির বুড়াপূজা ও প্রাচীন মন্দিরের পূজার মধ্যে লোকায়ত দিক থেকে একটু পার্থক্যও লক্ষ্য করার মতো। প্রাচীন মন্দিরে যে বুড়া পূজা হয় সেখানে এখনও বলি প্রথা বর্তমান। সেখানে ৫ রকমের বলি হয় - পাঠা, কুমড়ো, আখ, মানকচু ও পায়রা। যা বাড়ির পূজোতে দেখা যায় না। লক্ষণীয় বলির উপাদানগুলি প্রায় প্রত্যেকটি লোকায়ত। আসলে সেই এলাকায় তৎকালীন মানুষদের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর নির্ভর করেই এরকম পূজার উপকরণ হয়েছে । এছাড়া দই, চিড়া উক্ত পূজার আবশ্যিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আসলে উক্ত এলাকার রাজবংশী মানুষদের খাবারের সঙ্গে এইসব উপাদানের সাদৃশ্য রয়েছে । এছাড়াও গাজা, ভাঙ এই পূজার অবশ্যম্ভাবী উপাদান। সেখানকার মানুষদের মনে এই বিশ্বাস কথিত আছে যে এই দেবতার অগাধ শক্তি। ফলে যে কোনো সমস্যা থেকে সমাধানের জন্য এই দেবতার স্মরণ নেওয়া হয়। কথিত আছে যে উক্ত এলাকার কারো 'হাওয়া লাগলে' অর্থাৎ হঠাৎ কোনো অসুবিধা মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে এই দেবতার পূজা করলে কিংবা মানত করলে সেই

সমস্যার সমাধান হয়। বুড়া ঠাকুরের পূজার উপাদানের সঙ্গে শিব পূজার উপাদানের (গাজাভাঙ) মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শিব যেমন ষাড়ের পিঠে উঠে শ্মশানে মশানে ঘুরে বেড়ান তেমনি বুড়াঠাকুরও বাঘের পিঠে উঠে গাঁজা ভাঙ খান। মূলত শিবের এই লৌকিক ধ্যান ধারণা থেকেই বুড়া ঠাকুরের পূজার কাঠামো গড়ে ওঠে বলে মনে হয়। এই দেবতার সঙ্গে আর এক লৌকিক দেবতা মদনদেবের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এছাড়াও কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার সুবচনী পাটে মৃন্ময় মূর্তিতে সুবচনী দেবীর পূজা হয়। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় দেবী দুর্গার যে ভিন্ন ভিন্ন রূপ রয়েছে তার মধ্যে সুবচনী অন্যতম। সদাসত্য কথা, সুবক্তা রূপে দেবী সুবচনী এখানে পূজিত। হাসের বাহনে, কোলে কন্যাসন্তান নিয়ে, ডান হাতে বরদায়িনী রূপে এই দেবী অবস্থিত। জানা যায় যে কোনো কাজের শুভসূচনা রূপে, সর্বমঙ্গল রূপে বিশেষ করে বিবাহ, অন্নপ্রাশন, কর্মারম্ভ শুভযাত্রা প্রভৃতি কাজে এই দেবী ধরাধামে পূজিত হয় এবং ভক্তরা ফলও পায়। এই দেবীর মাহাত্ম্য উক্ত অঞ্চলে এতটাই ছড়িয়ে আছে যে তা শেষ পর্যন্ত স্থান নামে পরিণত হয়েছে। এই পূজার বিশেষ কোনো তিথি নেই। পূর্বেই বলা হয়েছে, যেকোনো শুভকাজ করার পূর্বে এই দেবতার পূজা করা হয়। অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পূজাও করা হয় নিজ বাড়িতে। সেখানে অনেক সময় মূর্তি থাকে না। হয়তো ঘট পূজার প্রতীকে, শোলার মূর্তিতে কিংবা মাটির ঢিপিকে সুবচনীর প্রতীকে পূজা করা হয়। তবে সুবচনী পাটে যে পূজা করা হয় তা বারোয়ারী পূজা। প্রথম দিকে রাজবংশী জনজাতির মানুষেরা এই পূজা শুরু করলেও বর্তমান সকলের মধ্যেই তর প্রচলন হয়েছে। এখানে সকলের কাছ থেকে চাঁদা সংগ্রহ করেই এই পূজা করা হয়। বৈশাখ মাসেই মূলত এখানে পূজা করা হয়। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে এই পূজার যে অবশ্যম্ভাবি উপাদান কাঁচা সুপারী ও পান, তা এই সময় বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এছাড়াও তামাকেরও প্রয়োজন হয়। এই উপাদানটিও এই সময় পাওয়া যায় বলে এই সময় উক্ত স্থানে সুবচনী পূজার প্রচলন দেখা যায়। লক্ষ্যণীয় উক্ত অঞ্চলের প্রধান অর্থকরী ফসল তামাক হবার ফলে এটি এই পূজার উপাদানে পরিণত হয়েছে। কোথাও পুরোহিত বর্জিত এবং কোথাও পুরোহিতদের দিয়েই এই পূজা করা হয়। পূজায় যে কাঁচা সুপারী দেবার রীতি আছে তা সংখ্যায় 'সোয়াপন' হওয়া চাই। তবে যাদের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল তারা 'সোয়াগণ্ডা' সুপারী দেয়। দেবীর সামনে যে নেউজ পাতা থাকে সেখানে তিনটি কলার ঝুকি (থাইত) দিতে হয়। যার প্রত্যেকটি ঝুকি বা থাইতে 'ষোলোটিয়া' (ষোলোটি করে কলা) কলা থাকবে। লক্ষণীয় এই পূজায় দেবীর বাঁ দিকে 'নেবরা', 'নেবরি'র অবস্থান থাকে। ফলে দেবী সুবচনীর পাশাপাশি এদেরকেও পূজা করার রীতি আছে। প্রসঙ্গত এই 'নেবরা',

‘নেবরি’ হল মূলত নারদ ও তার স্ত্রী। সম্পর্কে দেবী সুবচনীর ভাগ্নে হল এই ‘নেবরা’ এবং ভাগ্নে বৌ হল ‘নেবরি’। বিভিন্ন পুরাণ কিংবা বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য পাঠ করলে আমরা দেখব সেখানে দেব সমাজে যে কলহের সৃষ্টি হয়েছে তার মূলেই এই নারদ। এছাড়াও দেবী চণ্ডীর সঙ্গে শিবের বিবাহের সময় এই নারদই ঘটক হিসাবে কাজ করে। এজন্যই দেবী সুবচনীর পূজার সময় স্থানীয় মানুষ এখানে ‘নেবরা’ ও ‘নেবরি’র প্রতীকে পূজা করে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় ‘নেবরা’, ও নেবরির পূজা হলে তার প্রসাদস্বরূপ যে পান সুপারী পাওয়া যায় তা পুরোহিত তার দুই পায়ের মাঝখান দিয়ে পিছনে ছুড়ে ফেলে দেয়। পরে পিছনে থাকা ছেলের দল সংগ্রহ করে বাড়ির অদূরে গিয়ে সকলে মিলে ভাগ করে খায়। কেননা সেই পান সুপারী বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে আনা যাবে না, আনলে সংসারে কলহ হবে বলেই এতদঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস।

কোচবিহার জেলার ‘খোলটা’ গ্রামের নিকট ‘বালাবাড়িতে’ ভগবতীদেবীর পূজা হয়। যদিও এটি ব্যক্তিগত পূজা। স্থানীয় মটেশ্বর রায় বর্তমানে এই পূজা করে থাকেন। জানা যায় তার পূর্বপুরুষ প্রায় শতাধিক বছর থেকে এই পূজা করে আসছে। এই পূজার নির্দিষ্ট কোনো তিথি নেই। তবে কার্তিক মাসে দূর্গা পূজার পরে এই পূজা বেশি হয়। প্রধানত দেউরী বংশের মানুষেরা এই পূজা শুরু করলেও বর্তমান স্থানীয় রাজবংশীরাই এই পূজা করে। কোচবিহার জেলার ভেটাগুড়ির নিকটে মহাকালধামেও এই ভগবতীর পূজা হয়। তবে দু-জায়গাতে মূর্তি একই রকম। তবে পূজা পদ্ধতি স্থান ভেদে ভিন্ন। মহাকালধামে বলিপ্রথা প্রচলিত থাকলেও খোলটার উত্তর আমবাড়ি গ্রামে বলিপ্রথা নেই। এজন্য এই পূজাকে অনেকেই শুক্লা পূজাও বলে থাকে। সেখানে পূজার মূল উপাদান দই, চিড়া যা স্থানীয় মানুষদের প্রধান খাদ্য বলা যেতে পারে। সিংহ বাহন দেবী পশ্চিম দিকে মুখ করে অবস্থিত। সাংসারিক বিপর্যয়, সন্তান লাভ প্রভৃতির আশায় মানুষ এই পূজা করে থাকে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় দেবী দুর্গারই একটি রূপ হল এই ভগবতী।

দেবী দুর্গারই আর একটি রূপ হল ‘ভাণ্ডানী’। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ও মেখলিগঞ্জে মূলত এই পূজা দেখা যায়। এছাড়াও জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি, রাণীরহাট, কেদারের হাট প্রভৃতি স্থানেও এই পূজা হয়। এই পূজা মূলত দুর্গা পূজার বিসর্জনের পর দিন থেকে অর্থাৎ একাদশীর দিন থেকে পরপর তিন দিন ধরে হয়। বাঙালীর শ্রেষ্ঠ দুর্গাপূজার মতো করেই মহাধূমধামে এই পূজা হয়। মূলত স্থানীয় রাজবংশী মানুষেরাই এই পূজা করে থাকে। সর্বত্র একই মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। এখানে বাঘকে বাহন করে ২ হাত কিংবা ৪ হাত বিশিষ্ট এই মৃন্ময় মূর্তি পূজিত হয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ড. নির্মল দাশ, উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, পৃ. ১।

২. তদেব, পৃ. ২।

৩. গৌতম গুহ রায় (সম্পাদক), দ্যোতনা, বর্ষা-১৪১৮, ৩৩ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, নদী কথাঃ তিস্তা, রনজিৎ কুমার মিত্র, পৃ.২৫৯।

৪. সংগ্রহ ঃ ড. দীপককুমার রায়, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

৫. W.W. Hunter, Statistical account of Bengal, Vol-10, Page-372, Reprint-1974

৬. Charu Chandra Sanyal, The Rajbansis of North Bengal, Page-110.

দ্বিতীয় অধ্যায়
উত্তরবঙ্গের শৈব সংস্কৃতির ঐতিহ্য

প্রচলিত মিথ থেকে জানা যায় যে দেবসমাজের সব থেকে প্রাচীন দেবতা হল শিব। বলা হয় তিনি দেবতাদেরও দেবতা। একারণেই হয়তো তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। তবুও তিনি প্রকৃতিগত দিক থেকে, আচার -আচরণগত দিক থেকে অন্যান্য দেবতাদের থেকে পৃথক। শুধু তাই নয়, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদগত দিক থেকেও তিনি ভিন্ন তথা প্রাকৃত। একারণেই দেবসমাজে তিনি নিন্দিত। যেখানে অন্যান্য দেবতারা নিজের মহিমায়, নিজেদের ঐতিহ্যে এমনকি আভিজাত্যে অনেক উচ্চস্থানীয়, সেখানে শিব নিতান্তই সহজ সরল। আসলে শিব এখানে গ্রামীণ তথা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের প্রতিনিধি। আর শিব ব্যতীত বেশির ভাগ দেবতারা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর তথা এলিট শ্রেণীর মানুষের প্রতিনিধি। এই এলিট শ্রেণীর মানুষেরা সমাজের নিচুস্তরের মানুষদের সর্বদা ঘৃণা, অবহেলা শোষণ করবে এটাই স্বাভাবিক। একারণেই দেবাদিদেব শিব দেবসমাজে সর্বদাই নিন্দার পাত্র। ভিন্ন দিক থেকে দেখলে দেখবো যে অন্যান্য দেবতারা বিপদে পড়লে তারা আবার এই শিবেরই শরণাপন্ন হন। এতে অবশ্য শিব কিছু মনে করেন না। এই চিত্রও আমরা গ্রাম-গঞ্জের মানুষদের মধ্যে দেখতে পাই। এরা সবাই হয়তোবা শিবের মতো ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করেননি ঠিকই কিন্তু তাদের সংসার ছিল শিবের মতো 'দিন আনা দিন খাওয়া'। আসলে সেইসব মানুষদের চিত্রই এইসব দেবতাদের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছে। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য থেকে সংস্কৃত সাহিত্য এমনকি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও শিবের প্রতীকে এইসব মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে।

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের মানুষেরা পাশাপাশি বাস করে। তবে এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য থাকলেও লোকবিশ্বাস ও লোকঐতিহ্যের মধ্যে একটা বড় ঐক্য লক্ষ্য করা যায়। এই ঐক্য চোখে পড়ে মূলত গ্রাম-দেবতার থানে, গ্রামীণ উৎসব ও মেলায়। কেননা এই সকল মানুষের অবচেতন মনে এখনও আদিম বিশ্বাস অটুট রয়েছে। কারণ এদের বেশির ভাগেরই উৎস যে এক — এই বিশ্বাসের ভিত্তি ভূমি হল সর্বপ্রাণবাদ। প্রাচীনকালে মানুষ এই সর্বপ্রাণবাদের উপর বিশ্বাস নিয়ে দেবতার আরাধনা শুরু করেছিল কোনো গাছতলায়। সৃষ্টি হয়েছে গ্রামথানের, যা তাদের কাছে এক অজানা শক্তির আধার রূপে কাজ করে। আর এই গ্রাম থানকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে তাদের মনে বিশ্বাস। যে ধারা উত্তরবঙ্গের অলিতে গলিতে আজও বিদ্যমান। গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা এই গ্রামথানগুলিতে গেলেই বোঝা যাবে তাদের সকলের বিশ্বাস এক,

সকলের সংস্কার এক। তেমনি এর পাশাপাশি এই গ্রামথানকে কেন্দ্র করে যেসব মেলা বা উৎসব দেখা যায় সেখানেও লোকধর্মের প্রভাব ব্যাপ্ত হয়ে আছে। এখান থেকেও তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আর একটি ঐক্য। কেননা অনেক রীতি নীতি গ্রামীণ লোকধর্মের সঙ্গে যুক্ত। সৃষ্টির সূচনাকাল থেকে আমরা দেখি যে মানুষ তার নিজস্ব ভয়ভীতি, বন্য পশুদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য কিংবা প্রাকৃতিক পরিবেশকে অনুকূল রাখার জন্য এইসব দেবতাদের শরণাপন্ন হত। এই ধারা অবশ্য এখনও পর্যন্ত বহমান। উত্তরের বিভিন্ন লোকদেবতা এখনও এই বিশ্বাস নিয়েই পূজিত হয়। যেদিন তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস থাকবে না, সেদিন থেকে অবশ্য লোকদেবতাদের উপাসনাও থাকবে না। কিন্তু এ হবার নয়। কারণ মানুষ বংশগতভাবে এই ঐতিহ্যকে বহন করে নিয়ে যাবে। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ যেহেতু কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতা তাই কৃষির উন্নতির জন্য এরা কৃষি সম্পর্কিত দেবতাদের পূজা করে যাবেন। বিশেষ করে শিব এতদঞ্চলে কৃষি দেবতা হিসেবেই পরিচিত। এ কারণে উত্তরবঙ্গের বেশিরভাগ গ্রামদেবতা থানে আমরা শিবের অস্তিত্ব দেখতে পাই। আর যেখানে গ্রাম দেবতা নেই , সেখানে এককভাবে লোকদেবতা রূপে শিবকে পূজা করা হয়। কিংবা অন্য নামে পূজিত হলেও শিবের প্রতীকেই তা করা হয়।

সভ্যতার সূচনালগ্নে আদিম মানুষের চিন্তাভাবনার পরিসর ছিল খুবই সংকীর্ণ। আর এই সংকীর্ণ চিন্তাভাবনার পরিসর থেকেই 'দেবতা' শব্দের উদ্ভব বলে মনে করা হয়। তবে প্রথম দিকে এই শব্দটির ব্যবহার হয়তো ছিল না। দীর্ঘদিনের বিবর্তনেই এই শব্দটির উৎপত্তি। কেননা প্রথম দিকে মানুষ ছিল শিকারজীবী। বন্যপশু শিকার করেই তারা জীবিকা নির্বাহ করতো এবং এই শিকার করতে গিয়ে কখনো কখনো তারা নিজেরাও বন্যপশুদের কাছে শিকারে পরিণত হত। এই অসহায় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে এরা ধীরে ধীরে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন কাউকে ভাবতে লাগল। এছাড়াও বন্যপশুদের শিকারে যারা মারা যেত তাদেরকে তারা প্রথমে বনে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দিয়ে আসতো। কিন্তু এতে আরও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। কেননা রাতের অন্ধকারে বা দিনের আলোতেই সেইসব মৃতদেহকে বন্যজন্তুরা ভাগাভাগি করে খেতে লাগল। সভ্যতার বিবর্তনে মানুষ যখন আর একটু করে বুঝতে শিখলো তখন তারা আর এভাবে মৃতদেহকে মাটিতে ফেলে দিল না বরং মাটি চাপা দিয়ে রাখলো। কিন্তু তাতেও দেখা গেল সেই বন্যজন্তুরা সেই মাটি খুড়ে মৃতদেহ বের করতো। এভাবে চলতে থাকলে শিকারী আদিম মানবেরা সেই চাপা দেওয়া মাটির উপর পাথর বসিয়ে রাখলো। কেননা এতে তাদের মনে হয়েছে যে সেই চাপা দেওয়া পাথর সরিয়ে মৃতদেহ বের করা বন্য জন্তুদের পক্ষে কঠিন হবে। এভাবেই বিবর্তনের ধারায় সেই পাথর চাপা দেওয়া প্রথায় পরিণত হয়ে গেল এবং সেই পাথর আর সাধারণ হয়ে

থাকল না। মৃতের প্রতীকে পরিণত হল। এই প্রথা অবশ্য আজও কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায়। কবরের উপর কিংবা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের পর গ্রামের বাইরে বৃষকাষ্ঠ স্থাপন করার রীতি মূলত এই ভাবনা থেকেই এসেছে। যাইহোক বন্যপশুদের আক্রমণে মানুষ যখন আর কোনো উপায় খুঁজে পেল না, সেই সময়েই তাদের থেকে অধিক শক্তিসম্পন্ন কাউকে ভাবতে লাগলো। আর সেখান থেকেই 'দেবতাদের' আবির্ভাব হল। তবে এইসব মানুষেরা তাদের নিজস্ব চিন্তা ভাবনা বা কল্পনার দ্বারা তাদের সৃষ্ট দেবতাদের নানান রূপ অঙ্কন করতে লাগলো। যদিও পরবর্তীকালে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এইসব দেবতাদেরও নানান পরিবর্তন ঘটে গেছে। এভাবেই পরে গ্রাম্য দেবতা বা লোকদেবতার উদ্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কাব্য পুরাণ তীর্থ ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন — ''আর্যধর্ম মূলতঃ একেশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও এক ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন গুণক্রিয়া অনুসারে পরিকল্পিত বহু দেবদেবীর উপাসনা বৈদিক যুগ থেকেই ভারতবর্ষে প্রচলিত। দেবতার চরিত্রের যেমন পরিবর্তন ঘটেছে যুগে যুগে —তেমনি দেব উপাসনার পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছে।''[১] অর্থাৎ দেব উপাসনার এই যে পরিবর্তন তা মূলত মানুষের আত্মরক্ষার তাগিদেই হয়েছে। আর এ ধরণের চিন্তাভাবনার বিভিন্নতার জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর সৃষ্টি হয়েছে। তবে সেই সময় রোগ নিরাময়, আত্মরক্ষা, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ের সংকট তৈরি হয়েছিল। তাই রোগ, খাদ্য প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই দেবতারও আবির্ভাব হয়েছে। বন্যপশুদের প্রতীকে, সূর্যের প্রতীকে, মেঘের প্রতীকেই পূজা শুরু হয়ে গেল। ক্রমবিবর্তনের ধারায় এগিয়ে গেলে আমরা আরও দেখতে পাবো যে তারা শেষ জীবনে আশ্রয়ের তাগিদে বংশবৃদ্ধি করার প্রয়োজন মনে করলো। অবশ্য এর মধ্যে সভ্যতার অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। শিকারজীবী থেকে মানুষ কৃষিজীবীতে পরিণত হয়েছে। এই বংশবৃদ্ধি করার ভাবনা থেকেই লিঙ্গ পূজা ও যোনী পূজার প্রচলন শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে একটি মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে — ''লিঙ্গ অপেক্ষা যোনীর মর্যাদা কম নয়। ভগবান এবং ভগবতী এদু'টি অভিধার মধ্যে অন্ততঃ আংশিকভাবেও জগৎপিতা ও জগজ্জননীর সৃজনশীলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।''[২] এভাবেই সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রমবিবর্তনের ধারায় কত নতুন নতুন দেবতার উদ্ভব হয়েছে। আবার কালের অতলে কত দেবতা তলিয়ে গেছে, আবার কত প্রধান দেবতার ঠাঁই হয়েছে অপ্রধান দেবতার তালিকায়, আবার কতগুলি অপ্রধান দেবতা প্রধান হয়ে উঠেছে।

আনুমানিক চার থেকে সাড়ে চার হাজার বছর আগে আর্যরা এদেশে এসেছিল। আর তারও আগে সিন্ধু সভ্যতা আবিস্কৃত হয়েছে। সেদিক থেকে বলা যায় সিন্ধু সভ্যতার পরে ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্যরা এদেশে আসার আগে এরা মূলত শীত প্রধান অঞ্চলে বাস

করতো। তাই শরীরকে গরম রাখার জন্য এরা মাংসাশী ছিল। এ কারণেই তারা বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞের সূচনা করেন। যে যজ্ঞে বিভিন্ন ধরনের জীবকে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য এই 'আর্য' শব্দটি নিয়ে সমালোচক মহলে নানান বাতবিতণ্ডা রয়েছে। 'আর্য' শব্দটিকে আমরা সাধারণত জাতিবাচক বলেই মনে করি। কিন্তু এটি মূলত সংস্কৃতি ও ভাষাবাচক শব্দ। আর যারা এই ভাষায় কথা বলতো তাদেরকেই আমরা আর্য বলে মনে করি। নৃ-তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে সমালোচকেরা বলেন যে দুটো গোষ্ঠীই এই ভাষায় কথা বলতো। এক নর্ডিক ও দুই আলপীয়।[৩] যদিও মাথার খুলির গঠনগত দিক থেকে এই দুই গোষ্ঠী পৃথক ছিল। কিন্তু এই দুই গোষ্ঠী জীবিকাগত দিক থেকেও পৃথক ছিল। আলপীয়রা মূলত কৃষিপরায়ণ (নব্যপ্রস্তর যুগে) এবং নর্ডিকরা পশুপালন করতো। তাই আর্যরা সাধারণত পশুপালনে ও কৃষিকাজে অভ্যস্ত ছিল। যদিও তাদের প্রাথমিক পরিচয়ে জানা যায় তারা যাযাবর, পশুপালক, খাদ্য সংগ্রাহক, বর্বর ও যোদ্ধার জাত। এরা রুশদেশের উরাল পর্বতের দক্ষিণে এক শুষ্ক তৃণাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডে বাস করতো। এখান থেকেও স্পষ্ট যে তাদের পশুপালক হওয়াটা এবং শীতপ্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। পরবর্তীকালে এদেরই একটি শাখা, বিশেষ করে আলপীয়রা রুশদেশ থেকে অন্যত্র যাত্রা করে। জানা যায় এরা প্রথমে শিরদরিয়া ও আমুদরিয়া এই দুই নদীবেষ্ঠিত সমতল ভূমিতে বসবাস শুরু করে। পরে আবার সেখান থেকে পূর্বদিকে ইরানে যায় এবং এশিয়া ও বালুচিস্তান পর্যন্ত তাদের প্রভাব বিস্তার করে। পরবর্তীকালে এদেরই একদল পশ্চিম সাগরের উপকূল ধরে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে। এবং সিন্ধু, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কন্নাদ, তামিলনাড়ু প্রভৃতি স্থানে এসে পৌঁছায়। আর একদল বাংলা ওড়িষ্যায় প্রবেশ করে। অপর দল অর্থাৎ নর্ডিকরা তাদের মূল বাসস্থান থেকে দু'দলে বিভক্ত হয়ে এক দল ভারতের উত্তর- পশ্চিম প্রবেশদ্বার দিয়ে পঞ্চনদের উপত্যকায় এসে বসবাস শুরু করে।[৪]

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে এরা ছিল যোদ্ধার জাত। কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় যারা বসবাস করতো তারা ছিল বণিক। স্বাভাবিকভাবে ধন সম্পত্তির দিক থেকে সিন্ধু সভ্যতাবাসী অনেক বেশি উন্নত ছিল। তাদের ধন সম্পত্তি দেখে আর্যরা তাদের লোভ সম্বরণ করতে পারেনি। তাই তারা সিন্ধু সভ্যতার নগরগুলিকে ধ্বংস করে তাদের ধনসম্পদ নিজেদের করায়ত্ত করে নেয়। একারণেই অবশ্য কিছু সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। এ সম্পর্কে বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি. গর্ডন চাইল্ড ১৯২৬ সালে তার বিখ্যাত গ্রন্থ ' দি আরিয়েন্স' এ লিখেছেন — ''আর্যদের বর্বরতা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের কার্যকলাপে। জগতের যেখানেই গিয়ে তারা বসতি স্থাপন করেছিল, সেখানেই তারা সেখানকার উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করে।''[৫] এছাড়াও তারা যে সবসময় যুদ্ধ

বিগ্রহে লিপ্ত থাকতো তারও পরিচয় পাওয়া যায় ঋকবেদের বিভিন্ন সূক্ত থেকে । এইভাবে এরা যুদ্ধবিগ্রহে মত্ত থেকে সিন্ধু উপত্যকার স্থায়ী বাসিন্দা তথা অনার্যদের বা প্রাগার্যদের ভিটে মাটি উচ্ছেদ করে দেয়। ফলে সেইসব প্রাগার্য বা অনার্য মানুষেরা ছিন্নমূল হয়ে আরণ্যক জীবন-যাপন করতে বাধ্য হত। কিন্তু এখানকার স্থায়ী মানুষদের উচ্ছেদ করলেও সেখানকার মেয়েদের প্রতি ছিল তাদের তীব্র আসক্তি। যেন-তেন-প্রকারেণ তারা তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করতো। এরকম হবার কারণ হল তাদের সঙ্গে নারী ছিল না বললেই হয়। এটিও আর্য-অনার্যদের মেলবন্ধনের একটি অন্যতম কারণ। এভাবেই ধীরে ধীরে অনার্য নারীদের প্রভাবে অসভ্য আর্যরা (বর্বর আর্যরা) সুসভ্য হয়ে উঠতে থাকে। আর এদের হাত ধরেই আর্যরা আরও পরে পঞ্চনদ থেকে পূর্বদিকে এগিয়ে আসতে থাকে, ফলে এরা ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তারা গঙ্গা, যমুনার তীরবর্তী অঞ্চল কাশি, কোশল প্রভৃতি স্থানে চলে আসে। তখন অবশ্য এদের সংস্কৃতি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয় এই সময় একদিকে যেমন এরা অনেকটাই স্তিমিত তেমনি অন্যদিকে অনার্যদের সংস্কৃতির কিছু কিছু উপাদান এদের সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। একইভাবে আর্যদের সংস্কৃতির কিছু উপাদান অনার্যদের সংস্কৃতিতে চলে যায়। ফলে এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটে যায়। হয়তো এ কারণেই অশোক রায় উল্লেখ করেছেন '' তাহলে এক সময় যারা ছিল সভ্যতার চরম শিখরে, তারা সব হারিয়ে হয়ে গেল পথের ভিখারী। বাধ্য হল অন্ত্যেবাসী, যাযাবর, ও আরণ্যক জীবন-যাপনে। আর যারা একদিন ছিল যাযাবর -পশুপালক -খাদ্য সংগ্রাহক তারাই হল সমাজ -সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক বাহক ও পৃষ্ঠপোষক। এই ক্রমবিবর্তনের ধারায় তারাই রচনা করে বিশাল বৈদিক সাহিত্য ভাণ্ডার, যা সারা বিশ্বের কাছে সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতি ও দার্শনিকতার এক অমূল্য সম্পদ।''[৬] এই অমূল্য সম্পদই হল 'বেদ'। যা শুধু একটি গ্রন্থ হিসেবে থাকল না। সমাজ-সংস্কৃতির ধারক ও বাহকও হয়ে রইল বটে।

আবার অন্যদিক থেকে যদি দেখি তবে দেখবো, একটি সমাজ সভ্যতার প্রভাব বিস্তারকারী শক্তিশালী বিজয়ী জনগোষ্ঠী, অত্যাচারিত, অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে নিজ সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে। আর বিজিত শাসক গোষ্ঠীদের পক্ষে তা যখন সম্ভব হয় না তখনই দুই সংস্কৃতির মধ্যে মেলবন্ধন হয়। ফলে উচ্চ সংস্কৃতির দেবতা ও নিম্ন সংস্কৃতির দেবতা এই দুইয়ের মধ্যেও মেলবন্ধন ঘটায়। যদিও এধরণের অনেক উদাহরণ ভারতীয় সংস্কৃতিতে লক্ষ্য করা যায়। 'শিব'হল যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। অনার্যদের পশুপতি শিব হলেন পরমেশ্বর। বাইরে থেকে অনেক স্থিতি ও লয়ের নিয়ন্তা বলা যায়। কিন্তু বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও লোকায়ত সংস্কৃতিতে আমরা এই শিবের নানান পরিবর্তন দেখতে পারি। তবে এক্ষেত্রে একটি কথাই বলতে হয়, শিব অনার্যদের

মধ্যে যে অবস্থায় ছিলেন এখনও ঠিক সেই অবস্থাতেই আছেন। মাঝখানে শুধুমাত্র তার উপর একটা আর্যীকরণের প্রলেপ দেওয়া হয়েছে মাত্র। আর এই প্রলেপের উপর ভিত্তি করেই যুগ যুগ ধরে এমনকি বর্তমান লোকায়ত সংস্কৃতিতেও শিবের নানান পরিবর্তন নজরে আসে। এ সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে জানা যায় '' আর্য ভাষাভাষিগণ ছিল প্রকৃত দৈহিক শক্তিমান জাতির বংশধর। শক্তির সাধনা দ্বারা তাহারা চিরকালই ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে বিজয় ও কল্যাণেরই সন্ধান পাইয়াছে, সেইজন্য তাহাদের শক্তি দেবতার পরিকল্পনায় দেবতার সৃষ্টি ও কল্যাণ, গুণেরই জয়গান শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় অনার্যদিগের ইতিহাস স্বতন্ত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগে অরণ্যচারী অনার্য জাতি হিংস্র বন্যপশু ও অপরিজ্ঞাত রহস্য বিশ্ব প্রকৃতির নিকট হইতে সর্বদা আতঙ্ক ও বিভীষিকাই লাভ করিয়া আসিয়াছে। সেইজন্য সেই যুগ হইতেই তাহারা আত্মরক্ষায় সচেষ্ট থাকিতে গিয়া তাহাদের অপেক্ষায় শক্তিমান জীবসমূহ হইতে সর্বদা দূরে সরিয়া রহিয়াছে। তাহাদের পরিকল্পনায় তখন দেবতা ছিল অনিষ্টকারী দানব শক্তিরই প্রতীক মাত্র। হিংস্র-বন্য-পশু উপদ্রুত ভারতীয় অনার্য সমাজকে আরও এক প্রকার আধিভৌতিক শত্রুর সন্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহা আক্রমণকারী জাতিসমূহ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া কত দিক হইতে যে কত জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত আক্রমণকারী জাতিসমূহ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আদিম অনার্য জাতিগুলিকে দেশের বসোপযোগী সমতল ভূমি হইতে পর্বত ও অরণ্য প্রদেশে বিতাড়িত করিল, অধিকতর দৈহিক শক্তিসম্পন্ন এই সমস্ত আক্রমণকারী জাতিসমূহের সম্মুখীন হইতে অসমর্থ হইয়া ভারতের আদিম অনার্যগণ অরণ্য দুর্গম প্রদেশের অভ্যন্তরে গিয়া আশ্রয় লইল। এইভাবে ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে সর্বদা বিপর্যস্ত হইয়া এদেশের অনার্য সমাজ শক্তির হিতকারী কোনও গুণের আভাস লাভ করিতে পারিল না। সেইজন্য পরিকল্পনায় শক্তি দেবতা অহিতকর অনর্থেরই মূল বলিয়া গৃহীত হইল।''[৭]

আর্য-অনার্য এইরকম নানান ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে যখন দুটি সংস্কৃতির মিলন হল, তখন অন্যান্য দেবতাদের মতো শিবও অনার্য সমাজ থেকে উত্থিত হয়ে আর্য সমাজে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে নেয়। কেননা, একথা সত্যি যে প্রাগার্য দেবতাদের মধ্যে শিবই ছিলেন প্রধান, যার পরিচয় অবশ্য আমরা প্রাচীন দুটি সভ্যতা হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো নাম দুটির মধ্যেই পাওয়া যায়। শিব যে অনার্যদের দেবতা এবং আর্যদের মূল দেবতা যে শিব নন, তার প্রমাণ এখনও অবশ্য উত্তরবঙ্গ ছাড়াও গোটা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। কেননা, বর্তমান ভারতের যে অঞ্চলে আর্যেতর জাতির লোক অধিক সংখ্যায় বসবাস করে সেই অঞ্চলেই শৈব ধর্মের প্রাধান্য বেশি লক্ষ্য করা যায়।

এক্ষেত্রে বঙ্গভূমি তথা উত্তরবঙ্গ এর পীঠস্থান বলা যায়। কেননা, উত্তরবঙ্গের যে বিভিন্ন ধরণের লৌকিক দেবদেবীর পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্যতম হলেন শিব। তবে উত্তরবঙ্গ বললে অনেক ছোট জায়গা বোঝায়। এই শিব হল অখণ্ড বাংলা তথা গোটা ভারতের প্রধান পুরুষ দেবতা। তাই বলা যেতে পারে, যেহেতু অনার্য স্তর থেকেই এই পূজার শুরু তাই এই পূজার কালগত বিস্তৃতি অনেক বেশি। সেদিক থেকে আলোচনার সুবিধার জন্য শৈবাচারের সূচনা লগ্ন থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই শিব আরাধনাকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করবো। যা নীচের একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল।

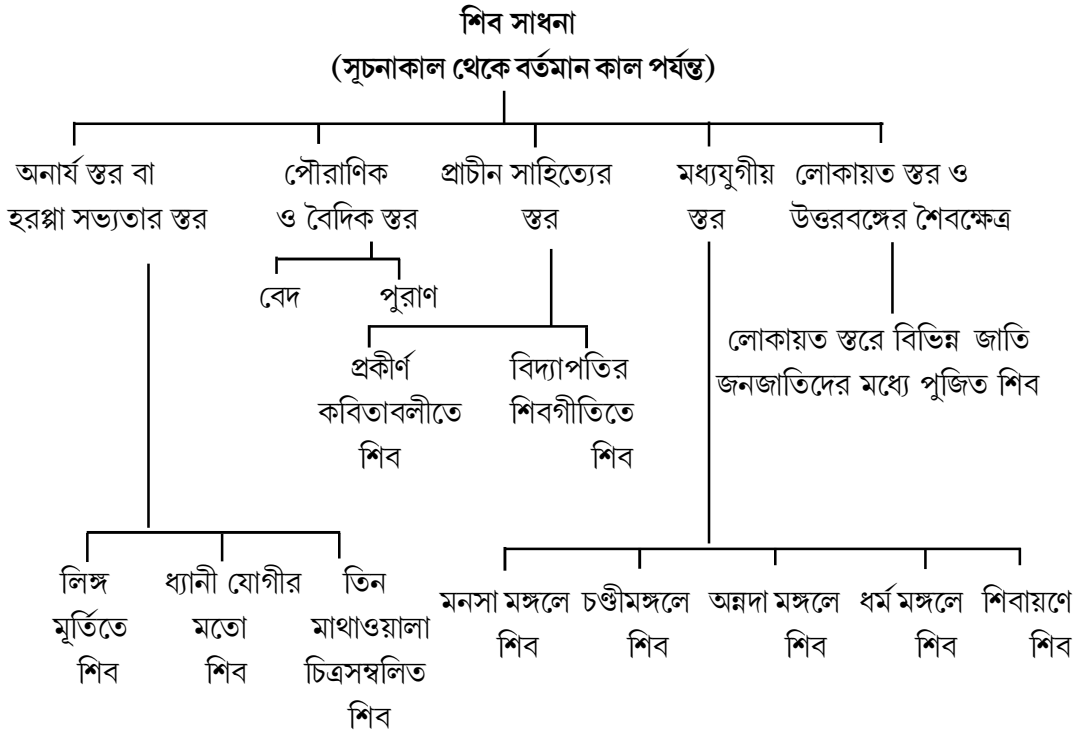

নিচে প্রত্যেকটি ভাগে শিব সাধনা কিভাবে হয়েছে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো। এতে হয়তো শৈবধারার সূচনা কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তনের ধারা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

অনার্য বা হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার স্তর ঃ

হরপ্পা সভ্যতার স্তরকেই অনার্য স্তর রূপে চিহ্নিত করা হয়। মনে করা হয় শিবের আবির্ভাব এই সময় থেকেই। তার প্রমাণ অবশ্য বিভিন্ন শিলালিপি। কিন্তু হরপ্পা বা মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার পূর্বেও এই ধারা ছিল কিনা এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ভাবে কিছু বলা যাবে না। কেননা, সেই সময়ের কোনো প্রমাণ নেই বললেই চলে। আমরা জানি খ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৩,০০০ হাজার বছর আগে

সিন্ধু সভ্যতা বৈষয়িক দিক থেকে সভ্যতার চরম শিখরে ছিল। সেই সময়ের নগর সভ্যতাই তার প্রমাণ। তবে এই ধরণের উন্নত বৈষয়িক বাতাবরণের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসী সকল ধর্মাচারণের ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক প্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এই সকল প্রতীকের ভিতর শিব লিঙ্গই প্রধান বলে ধরা হয়।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একত্রে এদেরকে ত্রিদেব বলা হয়। কিন্তু এদের মধ্যে মহেশ্বর বা শিবকেই একমাত্র দেবাদিদেব বলা হয়। ব্রহ্মা বা বিষ্ণুকে বলা হয় না। তবে এদের মধ্যেও বারংবার সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে। এরকম হবার কারণ হল শিব এক গোষ্ঠীর দেবতা এবং ব্রহ্মা ও বিষ্ণু আর এক গোষ্ঠীর দেবতা। আসলে তাদের সংঘাত দুই জনগোষ্ঠীর সংঘাত। আবার এদের সমন্বয় দুই জনগোষ্ঠীর সমন্বয়। এই সমন্বয় আসলে এদের পারস্পরিক কোমলতার সহাবস্থান। আর্য সভ্যতার ব্রাহ্মণ্য দেবতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু এবং অনার্য সভ্যতার তথা আদিম জনগোষ্ঠীর আরণ্যক দেবতা শিব। আসলে এই অনার্য সংস্কৃতির মানুষদের দীর্ঘদিন পর আর্যীকরণ ঘটলে তাদের এই উপাস্য দেবতাদের নিয়েই দ্বন্ধ দেখা যায়। তবে এদের এই উপাস্য দেবতা শিব যে আদিম জনগোষ্ঠীর শিকার নির্ভর দেবতা এ নিয়ে নানান মিথও লুকিয়ে রয়েছে। সেই মিথের আশ্রয় নিলে শিবকে অনার্য দেবতাই বলা সঙ্গত হবে। এই মিথটি হল— লুব্ধক নামে এক ব্যাধ শিকার না পেয়ে সারাদিন ঘুরে এলে রাত্রিবেলা এক পবিত্র বেল গাছে আশ্রয় নেয়। সেখানে সে রাত্রি যাপন করে। রাত্রি যাপনকালে সে দেখতে পায় গাছের পাতা ও শিশিরের জল মাটিতে পোঁতা শিব লিঙ্গ রূপী পাথরের উপর পড়ছে। তখন তিনি নিজেকে মহাদেবের বরে মহাপূণ্যবান বলে মনে করেন এবং তার মৃত্যুর পর শিব দূতেরা যমদূতদের পরাস্ত করে তাদের হাত থেকে তার আত্মাকে কেড়ে নিয়ে কৈলাসে হাজির হন যথাকালে। এছাড়াও শিবের সাজসজ্জা এরকমই কিছু প্রমাণ করে। এবিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে—''অতএব দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈদিক দেব-সমাজের মধ্যেই এই অনার্য দেবতা নিজের স্থান করিয়া লইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে রুদ্র দেবতার এই বৈদিক পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অনুকরণে তাহার এক শান্ত সমাহিত শিব মূর্তির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।''[৮] তবে এর পাশাপাশি একথাও বলতে হয় যে অনার্য সম্প্রদায় মূলত মাতৃদেবীর আরাধনাতেই বেশি প্রবৃত্ত ছিল। এজন্যও অবশ্য সিন্ধু সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের দিকে নজর দিতে হয়। সেই সময় মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় শিব লিঙ্গ, যোনী প্রতীক, মাতৃকামূর্তি, সন্তান সঙ্গে মাতা, গর্ভবতী নারী মূর্তি প্রভৃতি মাতৃদেবীর আরাধনার কথাই প্রমাণ করে। সবগুলি যে মাতৃকা আরাধনার প্রমাণ এমন কথাও বলা যায় না। তবে এগুলি যে উর্বরতা সাধিকা, সে বিষয়ে সকলেই হয়তো একমত হবেন। প্রাগৈতিহাসিক যুগে

মাতৃদেবীর কিছু প্রমাণ পাওয়া গেলেও বা অনার্যরা মাতৃদেবীর কল্পনা করে তার প্রতিষ্ঠা করলেও পুরুষ দেবতার আধিপত্য সেখানে ছিল না। কিন্তু হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতায় কয়েকটি পুরুষ মূর্তির নিদর্শন দেখে সেখানে পুরুষ দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। আসলে এখানে তিনধরণের মূর্তির পরিচয় পাই। এই তিন ধরণের মূর্তিও যে শিব সেখানেও কোনো দ্বিমত নেই। ঐতিহাসিকের বক্তব্য থেকেই তা স্পষ্ট করা যেতে পারে, ''This representation has the heast three concepts which are usually associated with Siva viz. That he is (i)trimukha (three faced), (ii) Pasupati (Lord of animals) and (iii) Yogiswara or Mahayogi. The first two aspects are apparent from the seal it self. The deity is sitting cross-leggeal in a padmasana posture with eyes turened towards the tip of the nose which evidences the Yogiswara aspects of the deity. It has been suggested by some Scholars that this Siva-cult was borrowed by the Indo-Aryans from the Idus culture but as there is a reference to Siva in the Regveda it self.''[৯]

আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতার শিবকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি —

১) লিঙ্গ মূর্তিতে শিব

২) ধ্যানী যোগীর মতো মূর্তিতে শিব

৩) তিন মাথাওয়ালা চিত্র সম্বলিত শিব

স্যার জন মার্শাল এই তিনটিকেই শিবের রূপ বলে অভিহিত করেছেন।[১০] এখানকার শিলমোহর -গুলিতে তিন মাথাওয়ালা একাধিক শিবের মূর্তি পাওয়া যায়। হরপ্পাবিদ্যার প্রথম আচার্য স্যার জন মার্শাল তাঁকে পৌরাণিক শিব দেবতার আদিরূপ বলে মনে করেন। তবে হরপ্পা সভ্যতাকে কেন্দ্র করে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও এবিষয়ে সকলে একমত। কেননা ভারতীয় পুরাণে শিবের যে একাধিক নামের বর্ণনা পাওয়া যায় তার সঙ্গে শিলমোহরের তিন মাথাওয়ালা মূর্তির প্রকরণগত অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। শ্রী হরিনাথ শর্মা দলৈ এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন— ''এই খনন -কার্য্যত আবিষ্কৃত যিমানবোর আরু অবিকৃত মূর্ত্তি পোয়া হইছে, সেই বোরোর কিছুমান দেবীমূর্ত্তি, কিছুমান যোগমূদ্রাত ধ্যানস্থ- পুরুষ-দেবতার, অর্থাৎ শিব-মূর্ত্তি আরু কিছুসংখ্যক ভগ্ন-শিলাখণ্ড শিবলিঙ্গ বুলি চিহ্নিত। এই মূর্ত্তিবোরো প্রমাণ করিছে যে, সেই যুগত তার অধিবাসীসকলে শিব আরু দেবীগ হয়তো কিবা প্রকারে নহয় কিবা প্রকারে উপাসনা করি একপ্রকার ধর্মীয় -জীৱন

অতিবাহিত করিছিল।''[১১]

তবে হরপ্পা কিংবা মহেঞ্জোদড়ো স্থান নাম থেকেও বোঝা যায় এটি শিবকেন্দ্রিক সভ্যতা। ড. পল্লব সেনগুপ্ত এ বিষয়ে বলেছেন —'' মহেন্দ্র (শিব)- দৃঢ় (দুর্গাপুরি) মহেঞ্জোদড়ো, এই ভাষাগত বিবর্তন খুবই স্বাভাবিক। স্মরণযোগ্য, ঋগ্বেদের ইন্দ্র হলেন ' পুরন্দর' এবং 'দৃঢ়হা' অর্থাৎ নগর এবং দুর্গ ধ্বংসকারী। হরাপ্পা নামটিও এভাবে বিশ্লেষণ করা আদৌ অসম্ভব নয়: 'হর' (শিব) শব্দের উত্তরপদ হিসেবে 'আপ্পা' থেকে গেছে; সিন্ধু জনপদবাসীরা এই শহরকেও সম্ভবত শিব (তদানীন্তন ভাষায় তাঁরা তাঁকে যা বলতেন সেইরূপে) নামাঙ্কিত করেছিলেন। 'আপ্পা' -বাচক দ্রাবিড় প্রত্যয় আমাদের অপরিচিত নয়, সম্ভবত আদি-দ্রাবিড় ভাষাতেও তা বিদ্যামান ছিল এবং সেটিই এখনো টিকে আছে।''[১২]

আবার মহেঞ্জোদড়োতে এমন কতগুলো শিলমোহর পাওয়া যায় যে মূর্তি ধ্যানে মগ্ন যোগী। একেও আদি শিব দেবতা বলা হয়েছে। এই আদি শিব যোগাসন ভঙ্গিমায় বসে থাকেন। তাঁর গলায় কয়েকটি হাড় দেখা যায়। অনেকেই মনে করেন এই হাড়গুলি হল সাপ। শুধু তাই নয় এই মূর্তির হাতে বালা বেষ্টিত। আবার তিন মাথার উপরে এক জোড়া সিংহ বসানো মুকুট আমরা দেখতে পাই, যার পরিধানে কিছু নেই। স্বাভাবিকভাবে উলঙ্গ এই দেবতা যার পুরুষাঙ্গটি উর্দ্ধমুখী। এসব বর্ণনা থেকেও বোঝা যায় এই দেবতা শিব যা অনার্য।

সাম্প্রতিক কালে দেখা যায় প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে শিবের প্রধান প্রতীক লিঙ্গ। যা মূর্তি পূজার থেকেও বেশি জনপ্রিয়। যদিও হরপ্পা সংস্কৃতি থেকেই শিব ও শক্তির সম্মিলিত রূপের প্রতীক হিসেবে গৌরীপট্ট ও শিব লিঙ্গের প্রচলন আছে। যার প্রমাণ সেই সময়ের শিলমোহর গুলিতে পাওয়া যায়। সেদিক থেকে এগুলিকেও শিব লিঙ্গ বলে মনে করা হয়। যদিও পরবর্তীকালে এই লিঙ্গ ও গৌরীপট্টের উপর শিব রাত্রি উপলক্ষ্যে জল ও দুধ ঢালা হয়। এই প্রথাও আদিম যৌনপূজার প্রবহমাণ ধারা। এই লিঙ্গ পূজা পরবর্তীকালে বৈদিক যুগে যথেষ্ট নিন্দিত ছিল। কিন্তু হরপ্পা সভ্যতায় তা সর্বজন স্বীকৃত। আর এই কারণেই পুরুষ দেবতার প্রতীক পুরুষ চিহ্ন দ্যোতক কিছুটা দীর্ঘপ্রস্তর খণ্ড এবং মাতৃ দেবতার প্রতীক আর একটি বর্তুলাকার প্রস্তর খণ্ড। এই ধরণের লিঙ্গ উর্বরতার প্রতীক হিসেবেই কাজ করে। আদি শিব ও আদি দূর্গা হিসেবে এই ধরণের প্রতীক পূজা হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতাতেও বহুল প্রচলিত। পরবর্তীকালে শিবলিঙ্গের ও গৌরীপট্টের এই গাঢ় সান্নিধ্য বাস্তব রূপের ওপর আধ্যাত্মিকতার শীলিত সজ্জাবিন্যাস করে হর-গৌরীর অর্ধনারীশ্বর মূর্তির কল্পনা করা হয়েছে।[১৩]

বৈদিক ও পৌরাণিক স্তর ঃ

বেদ যে সময় রচনা করা হয় সেই সময়কালকেই আমরা বৈদিক যুগ হিসেবে মনে করি , খ্রিস্টপূর্বাব্দ ২,৫০০ থেকে ৫০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়। এই সময় যেসব দেবদেবীর পরিচয় আমরা পাই সেগুলি প্রাচীন শাস্ত্র বেদের মধ্যেই নিহিত আছে। সেখান থেকেই এই সময়ের দেব-দেবীদের আমরা নিরূপন করতে পারি। এইসব দেবতারা হলেন - অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য, রুদ্র , মরুৎ, বোম, বরুন প্রভৃতি। এইসব নাম থেকেই স্পষ্ট এরা এক একজন ঋষি। বৈদিক যুগে শিব বলে আমরা কোনো দেবতাকে পাই না। এখানে শিব রুদ্র দেবতায় পরিণত হয়েছেন। 'এই রুদ্র দেবতার পরিকল্পনা আর্যদের নিজস্ব। ভারতের প্রবাসী আর্য ও নিবাসী অনার্যে যতই সংঘাত বাধুক না কেন, সম্পূর্ণ আর্যেতর একটি দেবতাকে স্বীয় দেবগোষ্ঠীতে স্থান দিতে বাধ্য হবার মতো অবস্থা আর্য সমাজে ও মানসে তখনও অনাগত। আর্যদের সঙ্গে ভারতে আগত জনৈক শক্তিশালী উগ্রদেবতাই ঋগ্বেদের রুদ্র। স্থানীয় অনার্য প্রমথের সঙ্গে তাঁর বিস্ময়কর সাদৃশ্য ছিল। এবং প্রাথমিক সংমিশ্রণও সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর চরিত্রের মূল ভিত্তি স্থাপনায় আর্য জাতিকে অপর কারও দ্বারস্থ হতে হয়নি।'[১৪] বৈদিক যুগে এই শিব রুদ্র দেবতায় পরিণত হয়েছে। তবে এখানে তিনি ভয়ঙ্কর ধ্বংসের দেবতা। শুধু তাই নয়, এখানে তিনি প্রতীক বা মূর্তি মতে গ্রহণীয় হননি। জানা যায় এই সময়ে শিব শিশ্নদেব (লিঙ্গ) বলে যথেষ্ট নিন্দিত হতেন। কিন্তু প্রাগার্য জনজীবনে তিনি ছিলেন একমাত্র দেবতা। এই সময়ে রুদ্রই হলো আদি শিবের বৈদিক প্রতিরূপ। রুদ্রের বুৎপত্তিগত অর্থ দেখে নিলেই বোঝা যাবে শিব এই সময় ভয়ঙ্কর দেবতা ছিলেন। 'রুদ্র' কথাটি রূদ ধাতু থেকে এসেছে। যার অর্থ যে রোদন করে বা রোদন করায়। আবার রোদন কথার অর্থ চোখের জল, তাই রুদ্র বলতে বোঝায় যা গর্জণ করে বা বর্ষণ করায়। প্রকৃতি জগতে এই কাজটি করে মেঘ। এজন্য বর্ষণশীল মেঘকেও রুদ্র বলা হয়। বৈদিক ব্যাখ্যানুযায়ী রুদ্র হলেন অন্তরীক্ষের দেবতা। অন্তরীক্ষে বৃষ্টি ও বিদ্যুতের সঙ্গে গর্জণ করে বলেই এই দেবতার নাম রুদ্র। যিনি ধ্বংসের দেবতা। তিনি বজ্রের দ্যোতক, ঝড়ঝঞ্জার দেবতা, মরুৎ বা বিদ্যুৎ তার পুত্র। তাই তিনি সাক্ষাৎ ধ্বংস এজন্যই তিনি পাহাড়ের উপর পুঞ্জিভূত কালো মেঘ বা গর্জণশীল মেঘ ধারণ করে থাকেন। একারণে তিনি গিরিশ, জটাজটধারী, কর্পদী, মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি তার ডমরু ধ্বনি।[১৫]

এসব কারণেই বৈদিক ঋষিরা প্রকৃতির ধ্বংসাত্মক রূপের মধ্যে রুদ্রকে প্রত্যক্ষ করতেন। যা কিছু মানুষের মধ্যে অনিষ্টকর ও প্রাণনাশক তাই তাঁরা রুদ্রের সঙ্গে যুক্ত মনে করতেন। রুদ্র ধ্বংসের দেবতার জন্য সবাই তাঁকে ভয় করতো, তবে তিনি শুধু ভয়ঙ্কর নন, তিনি কল্যাণকারীও বটে। স্তবকারীদের তিনি ধন, জন, আয়ু,বল, প্রভৃতি প্রদান করে তাদের রক্ষা করেন। একারণেই

তিনি ভয়ঙ্করতার পাশাপাশি বরাভয়দাতা রূপেও পরিচিত। বাহ্যিক রূপের মধ্যেও তার এই ভয়ঙ্করতার প্রকাশ পাওয়া গেলেও প্রকৃত অর্থে তিনি সুন্দর। কেননা তার গলায় থাকে বিধিরূপের হার। যে হার আমরা কালীর রূপ কল্পনার মধ্যে পেয়ে যাই। রুদ্রের গলার হারই তার মুণ্ডমালার আদিরূপ।

রুদ্রের বিবিধ পরিচয় পাওয়া যায় যজুর্বেদে। এখানেই তিনি সব শ্রেণীর মানুষের দেবতা। এমনকি চোর ডাকাতদেরও দেবতা। এখানেই তিনি শিব রূপে পূজিত। যদিও অথর্ব বেদে অসিত রুদ্রের কথা আছে। সেখানে তিনি মৃত্যুর প্রতীক। কারণ সেখানে তিনিও কালো এবং মৃত্যুও কালো। কিন্তু যজুর্বেদ তা নয়। সেখানে তিনি সৃষ্টির দেবতা। সেখানে তিনি শান্ত , কল্যাণময়। আসলে বেদের যে চারটি ভাগ রয়েছে সেই চতুর্বেদের মধ্যে একমাত্র যজুর্বেদে এসে রুদ্র কল্যাণময় দেবতায় পরিণত হন। তখন রুদ্র ও শিব মিলে মিশে একাকার হয়ে যান। এই সময় ধ্বংস ও মঙ্গল দুই কাজই তিনি সাধন করেন। তখন রুদ্র দেবতার আবার কতগুলো নাম ছিল—পশুপতি, ব্রহ্ম, মহাকাল, মহাদেব প্রভৃতি। যেমন অথর্ববেদ ও আরণ্যক রুদ্রকে ব্রহ্ম বলা হয়েছে। আবার বেদ সংহিতাতে শিবকে বলা হয়েছে পশুপতি। কিন্তু বিবর্তনের ধারায় এই রুদ্র দেবতাই আবার পরবর্তীকালে শিবে পরিণত হয়েছে। তবে এই রুদ্র বা শিবের মূলভাবনা যে অনার্যদের কাছ থেকে গৃহীত তারও পরিচয় আমরা যজুর্বেদে পাই। ''যেমন ঋগ্বেদে তাঁহাকে মনুষ্য গবাদির সংহারক, ব্যাধি-সংক্রামক, অসুর, প্রলয়ী ও দুর্গম বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। যজুর্বেদে রুদ্রের ভীষণ ও বিধ্বংসী শক্তি এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণের উল্লেখ আছে, মানুষ ও পশু সংরক্ষণের জন্য তাঁহার নিকট সকাতর আবেদন জানানো হইয়াছে; অথর্ববেদে তাঁহাকে, ভূতপতি-পশুপতি- যাতুধানী-উগ্র-সহস্র চক্ষু প্রভৃতি বিচিত্র বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, সন্তানবৃদ্ধি কামনায় যজমান তাহার নিকট মনুষ্যসহ পঞ্চপ্রাণী বলি দেন। তৈত্তরীয় আরণ্যক বাজসনেয়ী সংহিতায় তাঁহাকে চোর-ডাকাত অন্ত্যজদের দেবতা, নির্ঘন্টুতে 'তস্করাং পতি, এবং তিথিতত্তে 'নানা ম্লেচ্ছ গণৈঃ পূজ্যতে সর্বদস্যুভিঃ' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।''[১৬] বৈদিক যুগের এই রুদ্র দেবতার সঙ্গে অনার্য শিবের অনেক মিল পাওয়া যায়। কেননা অনার্য শিব সাধারণত ব্যাঘ্র চর্ম, গলায় সাপের মালা পরিধান করেন। এছাড়াও সারাদিন ভূত, প্রেত নিয়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়ান। গাজা, ভাঙ, ধুতুরা সেবন করেন, চিতা ভস্ম তার আভরণ এবং বৃষ তার বাহন। অর্থাৎ এটিও অনার্য শিবেরই একটি রূপ, সে রুদ্র দেবতা হিসেবে বৈদিক যুগে পূজিত হত সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এখানেও এই রুদ্রভাবনা যে লোকায়ত সমাজ থেকে উঠে এসেছে সে বিষয়ে মতের সমর্থন মেলে। গুরুদাস ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা কাব্যে শিব' গ্রন্থে এরকমই মত উল্লেখ করেছেন— ''প্রাচীন

দেবতাদের অনেকে বীর পূজার আশ্রয়ে গড়ে ওঠা। আর্য ভাবনায় শক্তিমান নেতার দেবত্বে উপনীতি যে দুর্লভ নয়, ভারতের ইতিহাসে তার পরিচিতি আজও মেলে। তাই অনেকে মনে করেন, বেদের রুদ্র এমনই কোন জনপ্রিয় বীরনেতা।''[১৭] এবিষয়ে আরও সমর্থন পাওয়া যায় আশুতোষ ভট্টাচার্যের 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে। সেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন বৈদিক রুদ্র দেবতার মধ্যেই অনার্য উপকরণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়। আসলে বৈদিক দেবসমাজেই এই অনার্য দেবতা নিজের স্থান করে নেবার প্রয়াস পেয়েছেন। যদিও পরবর্তী পৌরাণিক সাহিত্যে রুদ্রদেবতার এই বৈদিক পরিকল্পনার সঙ্গে ধ্যানী বুদ্ধের অনুকরণের এক শান্ত সমাহিত শিব মূর্তির পরিকল্পনা করা হয়েছে।[১৮] যদিও বৈদিক শিবের এরকম মূর্তির পরিচয় হরপ্পা মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতাতেই পেয়ে থাকি। এই মূর্তিই আবার বিবর্তনের ধারায় পৌরাণিক সাহিত্যে সন্নিবেষ্টিত হয়। আর এই পৌরাণিক সাহিত্যের মধ্য দিয়েই প্রধানত আর্য ধর্ম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারিত হয়। যার জন্য এই দেবতার চরিত্রমুখী বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকেই বাংলায় প্রচার লাভ করেছে। যার উপর ভিত্তি করেই বাংলার লৌকিক শৈব ধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে।

পৌরাণিক যুগ ঃ

''পুরাণ হল পুরাণের বিবরণ, যেহেতু পুরাকালে অর্থাৎ অতীতে এরূপ ঘটনা ঘটেছিল, তাই এর নাম পুরাণ।''[১৯] অর্থাৎ পুরাতন কাহিনীকেই সংক্ষেপে পুরাণ বলা যেতে পারে। এই পুরাণকে ঐতিহ্যমণ্ডিত ধর্মীয় সাহিত্য বলে আখ্যা দেওয়া হয়। জনশ্রুতি থেকে জানা যায় মহাকবি বেদব্যাসই অষ্টাদশ মহা-পুরাণ ও অষ্টাদশ উপ-পুরাণ রচনা করেন। যদিও মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে রচনাকালগত অনেক পার্থক্য রয়েছে। মোট ১৮টি উপ-পুরাণে যেসব দেবদেবীর প্রসঙ্গ রয়েছে তারাও পৌরাণিক। আবার ১৮ টি মহা-পুরাণে উল্লেখযোগ্য দেবদেবীরা হলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দূর্গা, চণ্ডী,সরস্বতী কার্ত্তিক, গণেশ, শিতলা, কুবের ইত্যাদি। অবশ্য এরা এক একজন এক একটি শক্তির প্রতীক। 'দেবী ভাগবত' এ মৌনকের অনুরোধে সূত অষ্টাদশ পুরাণের নাম উল্লেখ করে বলেছেন, 'ম' অর্থাৎ মকরাদি পুরাণ দু'খানি, 'ভ' অর্থাৎ ভগবাদি পুরাণ দুইখানি, 'ব্র' তিনখানি, 'ব' চারখানি, আর 'অ', 'না', 'প', 'লিং', 'গ', 'ক',এবং 'স্ক' — স্কন্দ এই অষ্টাদশ পুরাণ।[২০] অর্থাৎ মৎস পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ভাগবত পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বামন পুরাণ, বরাহ পুরাণ, বায়ু পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, অগ্নি পুরাণ, নারদ পুরাণ, পদ্ম পুরাণ, লিঙ্গ পুরাণ, গড়ুর পুরাণ, কুর্ম পুরাণ ও স্কন্দ পুরাণ। এগুলি হল মহা-পুরাণ। এছাড়াও আরও কিছু উপ-পুরাণ আছে। নারদীয় পুরাণ, নারসিংহ পুরাণ, কালিপুরাণ, শিবপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মানবপুরাণ ইত্যাদি।

প্রায় প্রত্যেকটি পুরাণের গঠন ও বিষয় একই রকমের। এগুলির মধ্যে বিষ্ণু পুরাণ, পদ্মপুরাণ, শিবপুরাণ উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশী পুরাণের মধ্যেও কোথাও ব্রহ্মা, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও বা শিবের আধিপত্য দেখা যায়। পুরাণে এইভাবে দেবতাদের আধিপত্য মূলত সমসাময়িক সমাজের মানুষের ধর্মীয় আধিপত্যের ইতিহাস। সমাজে যখন যে ধর্মের মানুষ প্রাধান্য পেয়েছে, তখন সেই ধর্মের দেবতাদেরও আধিপত্য নজরে আসে, পুরাণগুলি মূলত সেই ইতিহাসেরই বার্তা বহন করে। [২১]

পৌরাণিক যুগে শিব রুদ্রের স্থান দখল করে আছেন। শৈব পুরাণগুলিতে শিবের মাহাত্মবর্ণিত হয়েছে। সেখানে শিব দেবাদিদেব মহাদেব। শৈব পুরাণের মতে তিনি বেদেরও আদি দেবতা। এখানে তাকে পরম ব্রহ্ম ও অন্যান্য দেবতাদের জীবরূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আবার বামন পুরাণে শিবকে সর্বদেবময় রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তাঁর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে সেখানে বলা হয়েছে তুমিই বিষ্ণু , তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই মৃত্যু, তুমিই সূর্য-চন্দ্র, তুমিই ভূমি, তুমিই জল, তুমিই যজ্ঞ-নিয়ম, তুমিই অতীত-ভবিষ্যৎ, তুমিই আদি-অন্ত। আবার লিঙ্গ পুরাণে শিব কেবল দেবতা নন, তিনি এই মহাবিশ্বের নিয়ন্ত্রকও বটে। ''সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র মহেশ্বরই কর্ত্তা তিনি সৃজন সময়ের রজোগুণময়, প্রতিপালনের সময়ে স্বত্ব গুণময় , প্রলয়কালে তমোগুণময় হইয়া ক্রমে তিন প্রকার হইয়াছেন। যেহেতু শিবই ব্রহ্মা , বিষ্ণু, মহেশ্বর সর্ব্বময়; সেহেতু ব্রহ্মাধিপতি শিবময় দেবাদিদেব মহেশ্বরই প্রাণীদিগের স্রষ্টা, প্রতিপালক ও সংহারক। এই ব্রহ্মাণ্ডে এই সমস্ত লোক আছে ও ব্রহ্ম রূপী শিবই ইহার কর্তা।''[২২] বায়ু পুরাণে শিবকে হিরণ্য গর্ভ ভগবান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে তার বিশ্বমূর্তির রূপ বর্ণিত হয়েছে,

''অব্যক্তং বৈ যস্য যোনিং বদন্তি
ব্যক্তং দেহং কালমন্তর্গতঞ্চ।
বহ্নিং বক্তং চন্দ্রসূর্যৌ চ নেত্রে
দিশঃ শ্রোত্রে ঘ্রাণমাহশ্চ বায়ুম।
বাচো বেদাংশ্চান্তরীক্ষং শরীরং।
ক্ষিতিং পাদৌ তারকা রোমকূপান।।''[২৩]

অর্থাৎ শিবের উৎপত্তি অব্যক্ত, তাঁর দেহ ব্যক্ত অর্থাৎ প্রকাশিত। তাঁর দেহের অন্তর্গত সমূহকাল। অগ্নি তাঁর মুখ, চন্দ্র ও সূর্য তাঁর নেত্রদ্বয়, দিক সমূহ তাঁর কর্ণ, বায়ু তাঁর ঘ্রাণ, বেদ তাঁর বাক্য, অন্তরীক্ষ তাঁর শরীর, পৃথিবী তাঁর পদদ্বয়, তারকাগণ তাঁর রোমকূপ, এগুলি ছাড়াও 'স্কন্দ পুরাণে'ও শিবের প্রতিভার নানান রূপের বিকাশ ঘটেছে। শিব যেহেতু পরম পুরুষ তাই তাঁর

মাহাত্ম্য প্রকাশ করার ক্ষমতা কারও নেই। আর শিব যেহেতু মহাদেব তাই তাঁর সাধনা ছাড়া এই নর সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। আর শিব জ্ঞানই বেদের সার কথা 'সারার্থং বেদ বেদানাং শিব জ্ঞানমানকুলম।'[২৪] ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, বরাহ পুরাণ, প্রভৃতি পুরাণেও শিব বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত। এছাড়াও সেই সময়ের বিখ্যাত গ্রন্থ পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য', মথুরা শিলালেখ', (যা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে উৎকীর্ণ হয়) এই সময়ে একটি তাম্র মুদ্রা প্রভৃতি উপাদানের মধ্যেও আমরা শিব উপাসকদের পরিচয় পাই। যেমন- 'পতঞ্জলির মহাভাষ্য', গ্রন্থে 'শিবভাগবত' সমাজের কথা আছে। আবার মথুরা শিলালেখতে কয়েকজন শৈবাচার্যের পরিচয় মেলে। এছাড়াও একটি তাম্রমুদ্রায় দণ্ডকমণ্ডলুধারী একটি মানুষ ও তার পাশে ষাড়, অন্যপিঠে একটি লিঙ্গ— এসব থেকেই প্রমাণিত হয় যে খ্রিষ্টের জন্মের আগেও শৈব ধর্ম জনপ্রিয় এবং প্রচারিতছিল। সেই মুদ্রাটিরও সময় সীমা প্রায় খ্রিঃপূঃ দ্বিতীয় শতক। পরে বিভিন্ন পুরাণে শিবকে নতুন করে নিজেদের মতো করে খোলস পড়ানো হয়।

প্রাচীন সাহিত্যের স্তর ঃ

হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা থেকে পৌরাণিক যুগ পর্যন্ত যে শিবের আমরা পরিচয় পাই তাতে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে আছেন। তাতে যে তার গুরুগম্ভীর ভাবের পাশে লোকায়ত ভাব নেই তা নয়, তবে পুরাণে তা সীমিত। পুরাণ পরবর্তীকালে শিব যে আবার তার খোলস পরিত্যাগ করেছে তার প্রমাণ এই প্রাচীন সাহিত্যগুলি। কেননা এরপর তার আবারও লোকায়ত রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন সাহিত্যের স্তরের সময়সীমা আমরা মূলত খ্রিস্টের জন্মের ৬০০ বছর থেকে তুর্কী আক্রমণ ও তৎপরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত ধরে নিতে পারি। এই সময় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ' পাওয়া যায়, পরে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকে এককভাবে পাওয়া গেলেও অর্থাৎ কৃষ্ণকথাকে নিয়ে আলাদা ভাবে কাব্য রচনা করা হলেও শিব যে একবারে উপেক্ষিত থেকে গেছেন তা নয়। সেই সময়ের প্রকীর্ণ কবিতাবলী এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনায় বিদ্যাপতির 'শিবগীত'ই তার প্রমাণ। আমরা এখানে প্রাচীন সাহিত্যের এই ধারাগুলি ধরে শৈব ঐতিহ্যের ধারা আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

প্রাচীন যুগের প্রকীর্ণ কবিতাবলী ঃ

প্রকীর্ণ কথার অর্থ হল ক্ষুদ্র বা আকারে ছোট। অর্থাৎ ছোট চার বা পাঁচ পঙক্তিতে রচিত এককভাব বহনকারী কবিতাবলীই হল প্রকীর্ণ কবিতা। এগুলি মূলত বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম

নিদর্শন চর্যাপদের আগে রচিত। চর্যাপদ যেমন বাঙালীর রচিত প্রথম বাংলা সাহিত্য। কিন্তু এগুলি বাঙালী রচিত অবাংলা সাহিত্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রচিত এই অখণ্ড সাহিত্যগুলিকে পরে এক জায়গায় সংকলন করা হয়েছে। এরকমই কয়েকটি সংকলন হল গাথাসপ্তশতী, শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত, বিদ্যাধরের সুভাষিত রত্নকোষ প্রভৃতি। সমকালীন সমাজ জীবনের নানান চিত্র এর মধ্যে উঠে আসে । এগুলি ছাড়া সেই সময়ের চিত্র তুলে ধরার মতো আর কোনো কিছুই নেই বলে সমালোচকেরা মনে করেন। তাই সমসাময়িক সমাজের দলিল হিসেবে এই প্রকীর্ণ সাহিত্যগুলির গুরুত্ব রয়েছে। এর বিষয় বস্তু সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন — ''সংস্কৃতে রচিত শ্লোকে অনেক সময় লোকজীবনের স্বরূপটি যথাযথভাবে ফুটে উঠতে পারেনি, কিন্তু এই সাতশো শ্লোকে প্রাকৃত ভাষার বাহনে সেই বাস্তব জীবন-চেতনা (অনেক সময়ে স্থুল রতিরঙ্গের নির্বাদ বর্ণনা) বহুদূরের দেশ-কাল থেকে একালে এসে পৌঁছেছে। ভর্তৃহরির 'শৃঙ্গার শতক' এবং অমরু (অমরুক) নামে কোনো কবির শতকসংগ্রহ (অমরুশতক) বাদ দিলে গাথাসপ্তসতীর সাতশো শ্লোকে মানুষের দৈনন্দিন বাস্তবজীবন ও তার বিরহ মিলনের অশ্রুবেদনা এবং রাগরক্তিম কামনার অনুরূপ দৃষ্টান্ত সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্লভ বললেই চলে।''[২৫] আবার অন্যত্র অধ্যাপক করুনাসিন্ধু দাস লিখেছেন —''আটপৌরে বাস্তব লোকজীবনের সুখ, দুঃখ, কাম-ক্রোধ-লোভ-আশা-হতাশা প্রকীর্ণ কবিতায় ঠাঁই পেয়ে আসছে নানা পরিস্থিতিতে বিচিত্র ভঙ্গিতে । এ বিষয়ে হালের প্রাকৃত গাথা সপ্তসতী ও অমরুর অমরুশতক পথিকৃৎ এই মর্যাদা পেতে পারে।''[২৬]

'সদুক্তি কর্ণামৃত' এই সময়ে একটি প্রকীর্ণ কবিতার সংকলন। সেখানেও পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যগুলির মতো শিব-পার্বতী কোন্দলের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ভোজদেব রচিত একটি শ্লোকে বর্ণিত আছে —

''কস্মাৎ পার্বতী নিষ্ঠুরাসি সহজং শৈলোদ্ভবানামিদং
নিঃ স্নেহাসি কুতো ন ভস্ম পুরুষঃ স্নেহং কচিন্নিন্দতি
কোপস্তে ময়ি নিস্ফলঃ প্রিয়তমে স্থানৌ ফলং কিং ভবে
দিত্থং নির্বচনীকৃতো দয়িতয়া শম্ভুঃ শিবায়াস্তু বঃ ।।''[২৭]

অর্থাৎ 'হে পার্বতী! কি কারণে তুমি আমার প্রতি নিষ্ঠুর হয়েছ? অবশ্য এ তোমার পক্ষে সহজ স্বাভাবিক, কারণ তুমি পর্বতজাতা। কি কারণে তুমি আমাকে ভালোবাসো না? এই ভস্মাবৃত পুরুষ (শিব)কোথাও তোমার স্নেহকে (ভালোবাসাকে) নিন্দা করেনি। হে শিব প্রিয়তমে। আমার প্রতি তোমার নিস্ফল অকারণ কোপ। দয়িতা (স্ত্রী) কর্তৃক এরূপ নিস্ফল কোপের পরিণাম কি হতে পারে জান ? যিনি নির্বাচনীকৃত বচন রহিত অর্থাৎ যাকে বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না এরূপ

শম্ভু ভগবান শঙ্কর তোমাদের সকলের কল্যানে নিমিত্ত হোন।[২৮]

হালের 'গাথাসপ্তশতী'র অনুকরণে দ্বাদশ শতকে রচিত গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যা সপ্তশতী' গ্রন্থে ১৮৩ নং শ্লোকে হর-পার্বতীর পাশা খেলার বর্ণনা রয়েছে। সেই পাশা খেলায় পণ হিসেবে চুম্বন উপস্থাপিত হয়েছে —

'' কো বেদ মূল্য মদক্ষদ্যূতে প্রভুনা পনীকৃতস্য বিধোঃ।
প্রতি বিজয়ে যৎপ্রতিপণমধরং নন্দিনী বিধতে।।''[২৯]

অর্থাৎ এই পাশা খেলায় শিব জয় লাভ করলে প্রতিপণ হিসেবে ধরনন্দিনী অর্থাৎ পার্বতী অধর দান করেন।

অন্যদিকে কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম ' নাটকে যে মিলন উপস্থাপিত হয়েছে তার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে 'সুভাষিত রত্নভাণ্ডারগার'এ এক অজ্ঞাত নামা কবির কিছু শ্লোক সংকলিত হয়েছে। যে শ্লোক থেকে স্পষ্ট যার মূল চরিত্র হল শিব এবং পার্বতী। সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে নব সঙ্গমে গৌরী শিবের সঙ্গে আবদ্ধ হয়েছে। তাই লজ্জায় সে অবনত। আর সেই লজ্জা বশত সে একবার সামনের দিকে এগোচ্ছেন আবার আর একবার পিছনে ফিরে আসছেন। বন্ধু ও বধূজনের কথায় মুখ তুলে বরের দিকে তাকাচ্ছেন। আবার সম্মুখে বরকে দেখার পর ব্যকুল হয়ে উঠছেন, গৌরীর এমত অবস্থায় শিব হাসতে হাসতে তাকে আলিঙ্গন দান করেছেন।[৩০]

এগুলি ছাড়াও আরও বহু প্রকীর্ণ কবিতার মধ্যে শিবের এমন রূপ ফুটে উঠে যা লোকায়ত। এতদব্যতীত এসব ক্ষুদ্র কবিতাবলীতে তৎকালীন সাধারণ মানুষের নানান সুখ-দুঃখের চিত্র শিবের প্রতীকে ফুটে উঠে।

বিদ্যাপতির শিবগীতিঃ

বিদ্যাপতি বাংলার কবি নন, মিথিলার কবি। যদিও এ নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানান বাতবিতণ্ডা রয়েছে। তবে তিনি যেখানকারই কবি হোন না কেন তার প্রায় সমস্ত রচনাই মৈথিলি ভাষায় রচিত। আলোচ্য শিবগীতিও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি বলে পণ্ডিতদের ধারণা, মৃত্যু ১৪৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ — এটিও পণ্ডিতদের ধারণা। তবে বিতর্কে না গিয়ে বলা যায় তার মূল সময় সীমা বিশেষ করে শিবগীতি রচনার সময়কাল চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বা পঞ্চদশ শতাব্দীর শুরুতে। অন্যদিকে প্রকীর্ণ কবিতাগুলি অনেক আগের রচনা হলেও সংকলন হয় প্রায় দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে। সুতরাং এগুলির ভিত্তিতে শিব চরিত্রের মধ্য দিয়ে প্রায় কয়েকশো বছরের সামাজিক বিবর্তন লক্ষ্য করা যেতে পারে। প্রকীর্ণ কবিতাবলীতে আমরা খুব

বেশি করে কৃষক শিবের পরিচয় পাইনি। কিন্তু বিদ্যাপতির শিবগীতিতে গৃহী শিব কিংবা কৃষক শিবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদ্যাপতির এই শিবগীতির সঙ্গে অবশ্য পরবর্তীকালের মঙ্গলকাব্যগুলির অনেক সাযুজ্য লক্ষ্য করা যায়। কেননা এখানে শিব বিবাহ যাত্রায় যাচ্ছে তার সঙ্গীদের নিয়ে, সঙ্গে তার হাতে ডমরু এবং গায়ে বিভূতি বিভূষিত, আবার বুকে বিষধর সাপ। শিবের এই চিত্র দেখে তাঁর মায়ের উদ্বেগের সীমা নেই। সর্বদাই দুশ্চিন্তা, এমন বরের সঙ্গে উমা সংসার করবে কি করে?

''ঘর নাহি ধন নাহি ভাই সহোদর ।
জাতিক কোন বিচার।।
তনিক উমা ঘরনী ভয় রহতি
থিক হমরা ধিক্কার।
সাপ বাঘ ভূষণ লখি
বাচতি কোন প্রকার।।''[৩১]

আবার ১০৮ নং গানে দেখা যায় শিব ভিক্ষা করে যতটুকু ধান পেয়েছেন তা বাঘের ছালে শুকোতে দিয়েছেন। অন্যদিকে উমা ভাতের জল বসিয়ে এসে দেখে তা বৃষ খেয়ে ফেলেছে। অবশ্য কৈলাসবাসীর কাছে উমা পরে চাল ধার করতে যান, কিন্তু কেউই তা দেন না। গৌরী তখন অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে ত্রিশূল ভেঙে লাঙ্গল গড়ে চাষ আবাদের পরামর্শ দেন। পরের গানগুলিতে অবশ্য শিবকে দেখি গৌরীর পরামর্শমতো কৃষি কাজে মন দিতে।

''ত্রিশূল ছোড়য়ে শিব কার বনৌহ্নি।
ভাঙ্গ ঘোটনা কে হরীস।।
জটা তোড়ি শিব হরল ধা বনৌলহ্নি
হর কয়লহ্নি সমতুল।''[৩২]

এইভাবে শিব কৃষিকাজে মন দিলেন। শিবের এই দুরাবস্থা অবশ্য তৎকালীন সমাজের মানুষের দুরাবস্থা। শিবের এই কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে সেই সময়ের কৃষিকাজের প্রচলনের আভাস পাওয়া যায়।

মধ্যযুগীয় স্তর ঃ

অখণ্ড বাংলায় মধ্যযুগে শৈব ধারার ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যার পরিচয় পাই মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের মধ্যে। মধ্যযুগ হিসেবে আমরা মূলত পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ

শতাব্দী পর্যন্ত সময় সীমাকে নির্ধারণ করি। এই দীর্ঘ সময়ে অবশ্য অনেকগুলি সাহিত্য ধারা উঠে আসে। যেমন পদাবলী সাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, নাথ সাহিত্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে একাধিক মঙ্গলকাব্যের পরিচয় এই সময় পাওয়া যায়। যেগুলির মধ্যে শিব চরিত্র বিদ্যমান। আবার বাকি শাখাগুলিতে যে পাওয়া যায় না তা নয়। বিক্ষিপ্তভাবে সর্বত্রই শিব প্রসঙ্গ ছড়িয়ে রয়েছে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণের পর বাংলার বুকে যে অরাজকতা চলে এবং তৎপরবর্তীকালে ধর্মান্তরিতকরণের যে প্রবল প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তারই ভিত্তিতে তথাকথিত হিন্দুধর্মের মানুষেরা নিজধর্মকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য লৌকিক দেবতাদের পুনঃপ্রচার শুরু করেন। এদিক থেকেই বিভিন্ন লোকায়ত দেবতারা বিশেষ করে মনসা, চণ্ডী,ধর্মঠাকুর, অন্নদা, শিব প্রমুখেরা প্রতিষ্ঠা পায়। তবে শিব এখানে যেন ভিন্ন মাত্রা লাভ করেন। কেননা যে অনার্য শিব গাঁজা, ভাঙ, ধুতুরা সেবন করে, বাঘছাল, হাড় মালা পরিধান করে এখানে সেই শিবই প্রাধান্য পেয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে শুরু করে অষ্টদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যেই এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এখানে তিনি কৃষির দেবতায় পরিণত হয়েছেন। যার সূত্রপাত অবশ্য বিদ্যাপতির শিব গীতিতেই আমরা পেয়ে যাই। এছাড়াও শিবের আর একটি রূপ, দক্ষ যজ্ঞ নাশের যে চিত্র আমরা পাই তা পৌরাণিক প্রসঙ্গ। কিন্তু এই যোগীমহেশ্বর মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে দেখা দেন নেশাখোর, শ্মশানচারী অর্ধনগ্ন বাঘছাল পরিবৃত, ভিক্ষুক, অলস, কামুক, পত্নীভীত গৃহস্থ হিসেবে ।এই রকম শিবকে কেন্দ্র করে হর-পার্বতীর যে কলহ আমরা বিভিন্ন মঙ্গল কাব্যে লক্ষ্য করতে পারি তাতে যেন সেই সময়ের প্রতিচ্ছবি হিসেবেই উঠে আসে। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য অবলম্বনে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দিলেই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে।

মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দক্ষ-যজ্ঞ ও মদন ভস্ম সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে কলহ প্রবন অলস পেটুক শিবের প্রকৃতিগত সমন্বয়ের প্রশ্ন থেকে যায়। কিন্তু কবি ধ্যান গম্ভীর অচঞ্চল শিবের মধ্যে শিশু সুলভ চাঞ্চল্য পৌরাণিকতাকে লৌকিক ভাবনায় মিলিয়ে দেন। দক্ষের সামনে সতীর দেহ ত্যাগের কথা যখন শিব শোনেন তখন মর্মন্তুদ কণ্ঠে শিব বলে ওঠেন—

''কোথা গেল প্রাণ প্রিয়া আমারে ছাড়িয়া।
কেমনে দেখিব প্রাণ তোমা না দেখিয়া।।''

এখানে শিবের এই উক্তি দেখে মনে হয়, এযেন কোনো পুরাণের দেবতা নয়, এযেন মর্ত্য পৃথিবীর কোনো পত্নী অনুরক্ত প্রেমিক পুরুষের কথা। শুধু তাই নয়, শিবের অঙ্গভূষণেও মেনকা স্তম্ভিত। কেননা শিবের চরণে নুপুর হিসেবে সাপ, কোমরে কোটিবন্ধ হিসেবে সাপ, এমনকি পৈতাও

সাপের। এমন দৃশ্য দেখে মেনকা বিলাপ করতে থাকেন--

''অঙ্গ কঙ্কন সাপ সাপের পইতা
চক্ষু খাইআ এমন বরে দিলাঙ দুহিতা।।''

এছাড়াও অন্নদামঙ্গল কাব্যে শিব-পার্বতীর বিবাহ, তাদের গৃহত্যাগ, ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বন, পার্বতী মেনকার কোন্দল, খাবার পরিবেশনের চিত্র প্রভৃতি দেখেও শিবকে মর্ত্য পৃথিবীর ধূলি-ধূসরিত মানুষ হিসেবেই মনে হয়। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকেই শিবের ভিক্ষাবৃত্তির এরকমই পরিচয় দেওয়া হল—

''নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে একদিন পেট ভরে খাই।।
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে।।''

এই একই ভিক্ষাবৃত্তির চিত্র অবশ্য রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন কাব্যের মধ্যেও দেখা যায়। সেখানে আমরা দেখি ঘরজামাই হিসেবে শিব শ্বশুরবাড়িতে শ্বশুরান্ন গ্রহণ করবেন, এটা সে মানতে পারেনি তাইতো নিজের জীবনকে তিনি ধিক্কার দেন। আর এই ঘৃণাবশত নিজ স্ত্রী- পুত্রদের নিয়ে শিব শ্বশুরালয় ত্যাগ করে কৈলাসে ঘর বাঁধেন এবং সেখানে জীবিকা হিসেবে ভিক্ষাবৃত্তিকে গ্রহণ করেন।

''এই হেতু মহেশ্বর কৈলাসে করিল ঘর
নগরে মাগিয়া খায় ভিক্।''

এই ভিক্ষার সামগ্রী পার্বতী রান্না করলে শিব তা তৃপ্তি সহকারে ভোজন করেন। অন্যদিকে বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যেও শিবের লোকায়ত ধ্যানধারণা ফুটে ওঠে, সেখানে শিবকে আমরা কামুকরূপে দেখতে পাই। অন্যত্র যে পাই না তা নয়—— এই চিত্র সর্বত্রই পাওয়া যায়। কামোন্মাদনায় তিনি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। অযোনিসম্ভবা মনসার জন্ম রহস্যের মূলে আছে শিবের এই কাম উদ্দীপনা। বিজয়গুপ্ত দেখিয়েছেন চণ্ডী সৃজিত পুষ্পবনের অপূর্ব শোভা দর্শন করে শিবের হৃদয় উত্তেজিত হয়ে উঠে —

'' কে বোঝে দেবের মতি যে দেব সৃষ্টির পতি
হেন শিব পীড়িত মদনে ।।
কামে ব্যাকুল শিব কাতর চঞ্চল জীব
রতি লোভে হইল প্রবেশ।

কামেতে হইল ভোল স্ত্রী ফল গাছে দিল কোল

আচম্বিতে খসে মহারস।।''

এই মহারস থেকেই মনসার জন্ম। পুষ্পবনে একাকিনী সেই মনসাকে দেখে শিবের চিত্ত আরও চঞ্চল হয়ে উঠে —

''বনমধ্যে পদ্মাবতী আছে একাকিনী।
পুষ্প তুলিতে তথা গেল শূলপাণি।।
একাকিনী আছে কন্যা হইয়া পুষ্পবন।
কন্যার রূপ দেখিয়া বিস্মিত ত্রিলোচন।।
এক দৃষ্টে হইয়া শিব চাহে ঘন ঘন।
কোথা হইতে দিব্য কন্যা আইল পুষ্পবন।।''

এই চিত্র শুধু মনসামঙ্গলই নয়, অন্নদামঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যেও এর পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'গ্রাম্য সাহিত্য' গ্রন্থে তাই যথার্থ মন্তব্য করেছেন—'' কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন এবং তাঁহাদের শিখররাজি আমাদের আম বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাহারাও নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাহাদের স্থান হইত না।''[৩৩] সহমত পোষণ করে আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন যে —'' গৃহধর্ম পালনের মধ্যেও যে আধ্যাত্মিক চরিতার্থতা সার্থক হইতে পারে, এ'দেশের কবিগন তাঁহাদের লৌকিক শিবের পরিকল্পনায় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন, অতএব বাংলার শিব পৌরাণিক আদর্শানুযায়ী যোগী নহেন, বরং আদর্শ গৃহী।''[৩৪]

লোকায়ত স্তর ও উত্তরবঙ্গের শৈব ঐতিহ্য ঃ

বিশেষ বিশেষ সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের আচরণ ধারা যেমন বদলায় ঠিক তেমনি পালটে যেতে পারে বিভিন্ন সংস্কৃতিতে বিভিন্ন দেবদেবীর চরিত্র। তাই শুধু হরপ্পা বা মহেঞ্জোদড়ো, বেদ, পুরাণ বা মঙ্গল কাব্যই নয়, বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যেও শিবের এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। একই শিব বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে গিয়ে নামের দিক থেকে কিংবা পূজা পদ্ধতির দিক থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হয়। আর এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সেই জাতির বা জনজাতির জীবন চর্চার পরিচয় আমরা খুঁজে পাব। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতি-জনজাতির মধ্যেই এই ধারা স্পষ্ট। যেমন বোডো বা মেচরা 'শিব'কে 'বাথৌব্রাই' বা 'শিব্রাই' রূপে পূজা

করেন। আবার ধীমালদের কাছে এই শিব 'দান্তাবেরাং' নামে পরিচিত। একইভাবে রাভাদের সংস্কৃতিতে মইষঠাকুর, ওঁরাওদের সংস্কৃতিতে 'বরপাহাড়ী' সাওঁতালদের সংস্কৃতিতে 'মারাংবুরু ' এবং মুণ্ডাদের সংস্কৃতিতে 'বরদেও' রূপে পূজিত। রাজবংশী সমাজেও এই শিব বিভিন্ন নামে পরিচিত--ডাংধরা, বুড়াঠাকুর, সৈন্ন্যাসী, ঢাংঢিং প্রভৃতি। এগুলি প্রত্যেকটি শিবেরই লৌকিক রূপ বলে জানা যায়। তবে স্থানভেদেও একই দেবতার নানান পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। যেমন উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে একই দেবতা 'মহারাজা' নামে পরিচিত। যা আবার তরাই ডুয়ার্সে ভিন্ন নামে পূজিত হয়। অনেকক্ষেত্রে বৈদিক যুগের শিবের রূদ্রদেবতার অনুরূপে 'মাশান' বা 'মহাকাল' রূপে পূজা করা হয়। উত্তরবঙ্গের সর্বত্র স্থানেই শিবের এই রকম নানা রূপভেদ দেখা যায়। তাই সঙ্গত কারণেই আমরা বলতে পারি একদিকে যেমন আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর নির্ভর করে এই পরিবর্তন দেখা যায়, তেমনি স্থান ও কালভেদেও এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। এই কারণেই গিরিজাশংকর রায় উল্লেখ করেছেন —''উত্তরবঙ্গে শিব নানা নামে ও রূপে পূজা মান্যতা পাইয়া আসিতেছেন। শিবের এই জাতীয় আঞ্চলিক নাম ও রূপগুলিকে গ্রাম ঠাকুর হিসেবেও অনুমান করা যায়। সুতরাং তাহাদের মূলে কৃষিকৃত্যের পরিকল্পনা থাকা খুবই স্বাভাবিক।''[৩৫] সেখান থেকেও স্পষ্ট যে শিব এতদঞ্চলে কৃষি দেবতা রূপেই পরিচিত। তাই এখানকার শিবের যে পূজা হয় তা এই অঞ্চলের কৃষি উৎসবের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই করা হয়। উত্তরবঙ্গের ছয়টি জেলাই কৃষিনির্ভর। এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন — ''যে সকল জাতির মধ্যে কৃষিকার্য প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কৃষিকার্যের জন্য এক দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে ইনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা বলিয়া পূজিত হন। .....কোচ কৃষক সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈবধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।''[৩৬]

কোচবিহার জেলার শৈব ক্ষেত্র ঃ

উত্তরবঙ্গে শৈবধারা যে দীর্ঘদিন থেকে বহমান, সেই ঐতিহ্য আজও অবশ্য বহন করে চলেছে উত্তরের প্রাচীন শৈবক্ষেত্রগুলি। এই শৈবক্ষেত্রগুলিও যে অনেক প্রাচীন-তা পুরাণ সমসাময়িক প্রচলিত নানান মিথ থেকে স্পষ্ট। উত্তরবঙ্গের আসাম সীমান্তে অবস্থিত কোচবিহার জেলা যাকে অবশ্য শৈব ভূমির পীঠস্থান বলা যায়। কোচবিহারের এই রকমই একটি শৈব ক্ষেত্র হল বানেশ্বর মন্দির। কোচবিহার শহর থেকে ১৩ কি.মি উত্তরে অবস্থিত বিখ্যাত এই মন্দির। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোচবিহার মহারাজা প্রাণনারায়ণ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে যে অসুররাজ বান শিবের উপাসক ছিলেন। কৈলাসে শিবের তপস্যা করে তিনি বর লাভ করেন। এই বরে শিব

তাকে শর্ত দেন যে কৈলাস থেকে বান কাঁধে করে এই শিবলিঙ্গ তাঁর রাজ্যে নিয়ে যাবেন। মাঝখানে কোথাও রাখা যাবে না। যদি মাঝপথে বানরাজা সেই লিঙ্গকে কোথাও রাখেন তবে সেখানেই শিব অবস্থান করবেন, সেই স্থান তিনি ত্যাগ করবেন না। এমন কথায় রাজি হয়ে বান রাজা শিব লিঙ্গকে কাঁধে করে নিজ রাজ্যে যাবার সময় মাঝপথে (বানেশ্বরে) এসে ভীষণ প্রস্রাবের বেগ দেয়। সেই বেগ সম্বরণ করতে না পেরে বান সেখানে ব্রাহ্মণবেশী নারায়ণের হাতে শিব লিঙ্গ প্রদান করে প্রস্রাব করতে যান। ফিরে এসে বান দেখেন যে শিবলিঙ্গ মাটিতে অবস্থান করছে, ব্রাহ্মণের কোনো হদিস নেই। বান তখন সেখানেই তপস্যায় বসেন এবং শিব দর্শন লাভ করেন। শিব তখন তাকে দেখা দিয়ে অমরত্ব লাভ করার কথা বলেন এবং সেই লিঙ্গকে সেখানেই স্থাপন করার কথা বলেন এবং এও বলেন যে এই শিব 'বানেশ্বর শিব' নামে পরিচিত হবে। যেহেতু এই শিব বানের ঈশ্বর তাই এটি বানেশ্বর। অন্যদিকে বানেশ্বর যে উপাচারে এই শিবকে পূজা দেবেন শিব সেটাই গ্রহণ করবে। পরে বান অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন আচারে এই দেবতার পূজা করেন, যে ধারা আজও বহমান। নিত্য অন্নভোগের দ্বারা এই পূজা সমাপ্ত হয়। কোনো দিন আমিষ এবং কোনো দিন নিরামিষ ভোগে এই পূজা হয়। ভারতের খুব কম মন্দিরেই এই আমিষ ভোগের প্রচলন রয়েছে। আমিষ ভোগে কবুতরের মাংস কিংবা পাঠার মাংস প্রয়োজন হয়। এই কবুতর কিংবা পাঠা শিবের সামনে উৎসর্গ করা হয়। ভিন্ন রীতিতে অসুর রাজ বান যে নিয়মে পাঠা উৎসর্গ করেছেন, ঠিক সেই নিয়মে কবুতরকে আছাড় দিয়ে মারা হয়, যাতে রক্তপাত না হয়। একারণে পাঠাকে ফাঁসে ঝুলিয়ে তার মাথায় পাথরের আঘাতে মেরে ফেলা হয়। পরে তারই মাংস এই ভোগে ব্যবহার করা হয়। এখনও অবশ্য এই রীতি চলছে। স্থানীয়রা মনে করেন এটি অনার্য প্রথা। কিন্তু কোচবিহারের পণ্ডিত শ্রী হিমাদ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্যের মতে এ টি আর্য প্রথা। বৈদিক সভ্যতায় যে যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে তা সাধারণত দুই প্রকার — ১) ক্রতু এবং ২) যজ্ঞ। ক্রতুতে পশুবধের বিধান আছে। কিন্তু যজ্ঞে নেই। দেবরাজ ইন্দ্রকে শতক্রতু বলা হয়। ক্রতুতে পশুবধের নিয়ম হলো ফাঁস দিয়ে মাথায় কীলকের আঘাত করা , তাতে রক্তপাত হবে না। আর তন্ত্রের বিধান হলো খড়্গ দিয়ে ছেদন করা ও রক্ত পাত করা। এখানে প্রথম নিয়মটি মেনেই বধ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বানরাজা শিবলিঙ্গকে রেখে যে প্রস্রাব করতে যান, সেই প্রস্রাব থেকে পরবর্তীকালে একটি নদীর উদ্ভব হয়। যার নাম রংতি (বহাতি নদী)। বানেশ্বর শিব মন্দির থেকে সামান্য কিছু দূরেই এই নদী বহমান। এই নদীর জল আজও কালো এবং অপবিত্র বলেই জনসমাজে প্রচলিত। এই নদীর জল দিয়ে কেউ স্নান বা গুরুত্বপুর্ণ কাজে ব্যবহার করে না। নদীর যে ভাবে উৎপত্তি হয় , এর এরকম কোনো ভূগোল নেই।

এখানে মন্দির গৃহ দুটি। একটি মূল মন্দির, যেটি প্রাণনারায়ণ প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরটি চতুষ্কোণ যুক্ত, উপরে গম্বুজ। এই মূল মন্দিরে বানাসুর কর্তৃক আনীত শিবলিঙ্গ ব্যাতীত আর একটি মূর্তিআছে। অনেকে মনে করেন সেটি বানাসুরের মূর্তি, কেউ মনে করেন এটি শিবের বাহন নন্দীর। অপর মন্দির গৃহে রয়েছে তিনটি মূর্তি — বানেশ্বর শিব, মুক্তেশ্বর শিব এবং অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। এছাড়াও আছে জাগ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ, জলেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং অনন্তনারায়ণ শিলা। এখানেও নিত্যপূজা হয়। শুরু থেকেই অবশ্য মৈথিলি ব্রাহ্মণ দ্বারা এর পুজা হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে ঘটা করে পূজা হয় এবং মেলা বসে। এছাড়াও বছরে দুবার জাগ্রেশ্বর ও অনন্তনারায়ণকে চৌদলায় করে ভক্ত সমাগমে মদনমোহন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। তার অবশ্য ভিন্ন মিথ রয়েছে।

এটি ছাড়াও কোচবিহার থেকে পুণ্ডিবাড়ি যাবার পথে মূল রাস্তা থেকে প্রায় তিন কি.মি ভেতরে মধুপুর ধামের পাশে তোর্ষা নদীর তীরে হরিপুর শিব মন্দির অবস্থিত। এখানেও শিব রাত্রির দিন ঘটা করে এই পূজা করা হয়। এছাড়াও নিত্য পূজার ব্যবস্থা রয়েছে। এই দুটি মন্দিরই কোচবিহার দেবত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। এই মন্দিরের উৎপত্তি কবে থেকে সে বিষয়ে স্থানীয়রা সঠিকভাবে কিছু বলতে পারে না। তবে প্রচলিত মিথ থেকে এর প্রাচীনত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। প্রচলিত সেই মিথ থেকে জানা যায় যে বানাসুরের কন্যা উষাকে শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধ গোপনে বান রাজার পুরীতে ঢুকে উষার সম্মতিক্রমে এবং সখীদের সাহায্যে বিবাহ করেন। অনেকে অবশ্য অনিরুদ্ধের এই প্রবেশকে বলপূর্বক মনে করেন। পরে এই খবর বানরাজার কাছে এলে বানরাজা ঘটনা স্থলে উপস্থিত হন এবং অনিরুদ্ধকে বন্দি করেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের কাছে এই খবর পৌঁছালে তিনি বলরাম ও তাঁর পুত্র প্রদ্যুম্ন এবং অনেক সৈন্য সামন্ত নিয়ে অনিরুদ্ধকে উদ্ধার করতে আসেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য কোচবিহার সহ তৎসংলগ্ন অঞ্চল একদা বানাসুরের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তাই কৃষ্ণের আক্রমণের খবর বানাসুরের কাছে পৌছালে উভয়েই যুদ্ধ বিগ্রহে মত্ত হন। এমন সময় সেখানে মহাদেবের আবির্ভাব ঘটে। পরে এই শিব মহাদেব বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ ও ভক্ত বানাসুরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করান এবং ভক্ত বানাসুরকে অনুরোধ করেন তার কন্যা উষাকে অনিরুদ্ধের হাতে তুলে দেবার জন্য। পরে বানাসুর শিবের অনুরোধ ফেলতে না পেরে বর্তমান বানেশ্বরের অদূরে বৈকুণ্ঠপুরে বিশাল জাঁকজমক সহ উষা ও অনিরুদ্ধের বিবাহ দেন। এই উপলক্ষ্যে সেদিন মহাভোজ হয় এবং আজও এই ধারা বহমান। আজও মদন চতুর্দশীর দিন এখানে মহাভোজের আয়োজন করা হয় এবং এই ভোজে শিবও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এই ঐতিহ্য বজায় রেখে আজও সেই মহাভোজে বানেশ্বরের শিবকে এখানে নিয়ে আসা হয় এবং তিনদিন ধরে এখানে মদনকাম পূজা করা হয় এবং এই বিবাহ উপলক্ষে এখান থেকে আবার

বানেশ্বর শিবকে মদনমোহন বাড়িতে এনে উৎসব করা হয়। এই উৎসবে মদনমোহন মাছ, মাংস, ইত্যাদি আমিষ খাদ্য গ্রহণ করেন। শুধু তাই নয় সিদ্ধি পত্র দিয়ে সিদ্ধির নাড়ুও গ্রহণ করে বানেশ্বর শিব ও মদনমোহন আনন্দ উপভোগ করেন।

যে স্থানে বসে শিব কৃষ্ণ ও বানাসুরের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করান সেই স্থানে শিবের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে শ্রীকৃষ্ণ নিজে শিব মন্দির স্থাপন করেন, এবং পূজা দেন। এখানে দূত শিবের আশ্রয় দেন বলে এই মন্দিরের নামও শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে দেন 'হরিশ্বর'। পরে তা হরিপুরের পরিণত হয়।[৩৭]

বানেশ্বর কিংবা হরিপুর শিবমন্দিরই নয়, গোটা কোচবিহার জেলায় বেশ কয়েকটি শিবমন্দির উত্তরবঙ্গের এই দীর্ঘদিনের শৈব ঐতিহ্যের সাক্ষী হিসেবে রয়েছে। এইসব মন্দিরগুলির মধ্যে তুফানগঞ্জ মহকুমার দামেশ্বর শিবমন্দির, যাগুেশ্বর শিবমন্দির, দিনহাটা মহকুমার পাঁচমাথা মোড়ে অবস্থিত শিবমন্দির, সিতাইয়ের খামার বাড়ি শিবমন্দির, সদর কোচবিহার মহকুমায় সিদ্ধেশ্বরী শিবমন্দির শৈব ধারার ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে।

মালদহ জেলার শৈব ক্ষেত্র ঃ

উত্তরবঙ্গের আর একটি ঐতিহ্য বহনকারী জেলা হল মালদা। এই জেলাতেও ঐতিহ্য বহনকারী একাধিক শিবমন্দিরের পরিচয় পাওয়া যায়। যেগুলির বয়স প্রায় পাঁচ শতাধিক বছর বা তারও বেশি। এরকম কিছু শিবমন্দির সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হল।

মালদা জেলার সবচেয়ে প্রাচীন শিবমন্দির হল ইংরেজবাজারের পুরাতন শিবমন্দির। অতি প্রাচীন এই মন্দিরটিতে এখন আর পূজা হয় না, সেখানে জনসাধারণের যাতায়তও আর সেভাবে নেই। বর্তমান মন্দিরের ভেতর কোনো মূর্তিও দেখা যায় না, মন্দিরের পূর্বমুখি দরজাটিও এখন আর নেই। ভেতরে অনেকটা গর্ত হয়ে আছে, যা দেখে মনে করা যেতে পারে মন্দিরের ভেতরে মাটি খুঁড়ে মূর্তি সরানো হয়েছে। তবে ভগ্নপ্রায় বলে তা কতদিনের পুরাতন এবং এটি কোন দেবতার মন্দির তা প্রমাণ করাও কঠিন। মন্দিরের গাত্রে কোনো কালজ্ঞাপক উক্তি কিংবা মন্দির সংক্রান্ত কোনো তথ্য খোদাই আকারেও নেই। এক্ষেত্রে কতগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। অনুমানগুলিকে নিচে ক্রমান্বয়ে সাজানো হল।

১. মন্দিরের বাইরে কতগুলি নকশা দেখা যায়, যা দেখে মনে করা যেতে পারে যে এটি অষ্টাদশ শতাব্দী বা তারও আগের। ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমেও অবশ্য তাই জানা যায়।

২. এই মন্দির থেকে ২০০ মিটার দূরত্বে জহুরাতলা কালীমন্দির অবস্থিত। যেখানে প্রতি বৈশাখ মাসে ঘটা করে জহুরা দেবীকে কালী রূপে পূজা দেওয়া হয়। জানা যায় ঁছন্ব তেওয়ারী নামে এক

পরম সাধক ১০৮৩ বঙ্গাব্দে সিদ্ধিলাভের দর্শন পেয়ে সেখানে জহুরা দেবীর বেদি স্থাপন করেন। এবং মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তারপরেই সেখানে দেবীর উদ্দেশ্যে পূজা পাঠ হয়। আরও পরবর্তীকালে ছুন্ধ তেওয়ারীর বংশধর (পৌত্র)কৌলিক সাধক হীরারাম তেওয়ারী ১২১৩ বঙ্গাব্দে দৈব দর্শন লাভ করেন, যাতে দেবী ছিল বিকটা মূর্তি, রক্তবর্ণা এবং লাল জিহ্বা। তখন থেকে এরূপ দেবীর মূর্তিতেই জহুরা দেবী পূজিত হয়ে আসছেন। এই মন্দিরের গাত্রে উক্ত ভগ্ন প্রায় মন্দিরের কথা উল্লেখ আছে। সেদিক থেকে মনে করা যেতে পারে যে পাশের শিব মন্দিরটি জহুরা কালী মন্দিরের থেকেও পুরোণো। অর্থাৎ ১০৮৩ বা ১২১৩ বঙ্গাব্দের চেয়েও পুরোনো।

৩. আবার দুই মন্দিরের ভাস্কর্য দেখে মনে করা হয় শিবমন্দিরটি জহুরা কালীমন্দিরের থেকে অনেক প্রাচীন।

৪. জহুরাতলা কালীমন্দিরের দেওয়ালে এক স্থানে লেখা রয়েছে 'শ্রী শ্রী জহুরা চণ্ডীমন্দির'। এখান থেকেও স্পষ্ট চণ্ডী ও শিব পাশাপাশি অবস্থান করবেন। সেদিক থেকে ভগ্ন প্রায় মন্দিরটিকে শিবমন্দির বলা হয়তো অবান্তর হবে না।

ক্ষেত্রমীক্ষায় জানা যায়, সেখানকার স্থানীয় মানুষদের দাবি মতো ভগ্নপ্রায় মন্দিরের মূর্তিগুলি নাকি চুরি হয়ে গেছে।

মালদা জেলার প্রাচীন শিবমন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম আর একটি মন্দির হল আইহোমঠের পুরাতন শৈবমন্দির। মালদা জেলার ইংরেজবাজার শহর থেকে পাকুয়া নালাগোলা পথে ১৫ কি.মি উত্তর-পূর্ব কোণায় এই মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটিও ভগ্নপ্রায়। তবে এর পূজা এখনও চলছে। জানা যায় মুর্শিদাবাদের লালগোলা রাজা এই মন্দিরটি স্থাপন করেন। সেদিকে থেকে এর বয়স প্রায় এক হাজার বছরের কাছাকাছি। ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরের ভাস্কর্যের সঙ্গে জহুরাতলা গ্রামের ভগ্নপ্রায় মন্দিরের অনেক মিল পাওয়া যায়। মন্দিরের বর্তমান পূজারী যে বাড়িতে থাকেন সেটিও মন্দিরের সম্পত্তি এবং একই সময়ে তা নির্মিত। এই পরিবারই বংশানুক্রমে মন্দিরের দেখভাল করে। বর্তমান পূজারী জানান যে তাঁদের পূর্বপুরুষ এক সময় লালগোলা রাজার বিশেষ আমাত্য ছিলেন। সেই সুবাদেই তারা এই সম্পত্তির বর্তমান দাবীদার। বর্তমান মন্দিরের ভেতরে চারটি শিবলিঙ্গ ও একটি পাথরে খোদিত শুকর মূর্তি আছে। এছাড়া একটি পাথরের শিবমূর্তি পাওয়া যায়। জানা যায় এই শিবমূর্তিটি পরে মন্দিরে স্থাপন করা হয়েছে। এইসব মূর্তিগুলি সবই প্রাচীনতার পরিচয় বহন করে।

মালদা শহরে বাঁধ রোডের শিবমন্দিরটি 'খুনেশ্বর শিব' নামে পরিচিত। জানা যায় শহরের মধ্যস্থানে জুবিলি রোডের উপরে গোঁসাইদের তৈরি করা মন্দির এটি। প্রায় বর্গাকার এই মন্দিরটি

বারান্দা যুক্ত, মূল মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে সামনের দিকে (পূর্ব দিকে) তিনটি খিলান রয়েছে, তার পরেই মূল মন্দিরের ফটক। প্রায় শতাধিক বছরের এই মন্দিরে লিঙ্গরূপী শিবকে পূজা করা হয়। তিনটি বিভিন্ন আকৃতির শিবলিঙ্গ এতে রয়েছে, এছাড়াও মন্দিরগাত্রে প্রাচীন গণেশ মূর্তি এবং কয়েকটি শিব পার্বতীর মূর্তি রয়েছে। শিব পার্বতীর মূর্তিগুলি অবশ্য পাথরে খোদিত। যেগুলির মধ্য দিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এই সময়কাল নির্ণয় করতে পারেন। মন্দিরের বর্তমান পূজারী পণ্ডিত শিবানন্দ শাস্ত্রী পাঁচ পুরুষ ধরে এই শিবের পূজা করে আসছেন। তারা হলেন---

অম্বিকা মিশ্র
↓
রামনরেশ মিশ্র
↓
বৈদ্যনাথ মিশ্র
↓
রামকিশোর মিশ্র
↓
শিবানন্দ শাস্ত্রী (বর্তমান পূজারী)

পণ্ডিত শিবানন্দ শাস্ত্রীর কাছ থেকে জানা যায় এই মন্দির এবং মালদার ইংরেজবাজারে 'কালীতলা শিবমন্দির' একই সময়ে তৈরি, যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গোঁসাইরা। এই দুই মন্দিরে এখনও প্রায় ১০০ বিঘার মত জমি রয়েছে। পূর্বে এর নাম ছিল গঙ্গা মঠ।

বর্তমান যে মন্দিরটি নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সেটি হল আদিনাথ শিবমন্দির, যা বর্তমান আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত। মালদা জেলার গাজোল থানায় অবস্থিত ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এটি অবস্থিত। এটি এখন ভগ্নপ্রায়। যদিও এখন পুরাতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে এটিকে রক্ষণাবেক্ষনের জন্য লোক নিয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু এটি মন্দির না মসজিদ তা নিয়ে এখনো বিতর্ক আছে। বর্তমান এটি আদিনা মসজিদ নামেই পরিচিত। কিন্তু এর ভেতরে এবং বাইরে যে দেওয়াল রয়েছে সেখানে একাধিক হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি দেখা যায়। শুধু তাই নয় নানান হিন্দু প্রতীকও রয়েছে। এছাড়াও মসজিদের মাঝখানে উমা-মহেশ্বরের মন্থনরত অবস্থায় এক ভগ্নপ্রায় ভাস্কর্য রয়েছে। এইসব চিহ্নই বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। অনেকেই বলেন দীর্ঘদিন এতদঞ্চলে মুসলমান শাসনের ফলে এই পরিবর্তন হওয়াটা স্বাভাবিক। ড. সুস্মিতা সোম উল্লেখ করেছেন— ''আদিনা মসজিদে হিন্দু দেবালয়ের উপকরণ ব্যবহৃত হওয়ার অনেক নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব দিকের ভগ্ন প্রাচীরের এক প্রস্তরলিপি থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর একটি লিপি যা এখানে পাওয়া গিয়েছে। এর পাঠোদ্ধার করেছেন শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার তার আটটি অক্ষরের শেষ ৬ টি অক্ষর হলো 'শ্রীউতঙ্ক শিবা'। অর্থাৎ এটি উতঙ্ক নামীয় কোনো ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরের লিপি। এছাড়া আদিনা মসজিদের পূর্বে প্রবেশপথ যা উত্তর দিকে রয়েছে সেটি একটি

মন্দিরের গর্ভগৃহ বলেই মনে হয়, যা হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী পূর্বমুখী। শুধু তাই নয়, ভগ্ন শিবলিঙ্গটি স্থাপিত হয়েছে বাদশাহী তখতের পাশের কষ্টিপাথরের অলংকরণ করা দেওয়ালের উপরিভাগে। শিবলিঙ্গবিহীন গর্তসহ একটি গৌরী পট্টও পড়ে রয়েছে একপাশে। দুটি গণেশ মূর্তি সহ অক্ষত দুটি দ্বার আদিনা মসজিদের পূর্ব ও পশ্চিমের প্রাচীরে লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া পশ্চিমদিকের বাইরে দেওয়ালে একটি পত্রাকৃতি খাঁজ কাটা চৈত্য গবাক্ষও দেখা যায়। দুটি আয়তাকার লম্বা স্তম্ভের উপর রাখা এর শীর্ষদেশও মন্দিরের মতো, এর শিখরটি একটি ঘটে বসানো কুঁড়ির অর্ধাংশের মতো। স্তম্ভ দুটিতে সুন্দর কারুকার্য, এর মাঝখানে কোনো বড় মূর্তি ছিল যা বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে।''[৩৮] এরমক অনেক মূর্তি, অনেক নিদর্শন আজও দেওয়ালে ভগ্নপ্রায় অবস্থায় আছে। এরকম হিন্দুদের শুধু ভগ্নপ্রায় মূর্তি থেকেও মনে করা যেতে পারে যে হিন্দুমন্দির প্রমাণের চিহ্ন এভাবেই লোপাটের চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়াও ইতিহাস অবলম্বনে আমরা জানতে পারি যে তুর্কি আক্রমণের সময় আমাদের বাংলায় সবচেয়ে বেশি অরাজকতা তৈরি হয়। বিশেষ করে গজনীর মামুদের আক্রমণেই হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করা হয়। এই সময়ই তাঁবা পৌত্তলিকতা বিদ্বেষের ফলে পাল যুগের তৈরি বহু স্থাপত্য, মন্দির ভেঙ্গে ফেলা হয়। যার চেষ্টা উত্তরবঙ্গেও হয়েছে। সেদিক থেকে 'আদিনাথ শিবমন্দির' আদিনা মসজিদে রূপান্তরিত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

এগুলি ছাড়াও মালদা জেলায় যে সমস্ত শৈব ক্ষেত্রগুলির পরিচয় পাওয়া যায় তার একটি তালিকা দেওয়া হল —

১. গৌড়রোড বাশুলিতলার শ্রী শ্রী গৌড়েশ্বর শিবমন্দির।

২. ইংরেজবাজার সাদুল্লাপুরের শিবমন্দির। এটি ইংরেজবাজারের গৌড় এলাকায় সাদুল্লাপুর শ্মশানের বিপরীত দিকে ভগ্ন প্রায় অবস্থায় রয়েছে দেউল আকৃতির এই মন্দির।

৩. অমৃতি শিবমন্দির, মালদা থেকে প্রায় ৪ কি.মি দূরে অবস্থিত।

৪. মখদুমপুরের শিবমন্দির, এটি ইংরেজবাজার শহরের প্রাচীন শিবমন্দির।

৫. পুরাতন মালদহের প্রাচীন শিবমন্দির, এটি পুরাতন মালদহের পূর্ব দিকে মহানন্দা এবং বেহুলা নদীর সংযোগস্থলকারী স্থানের পূর্বপাড়ে ভগ্নপ্রায় এই মন্দিরটি অবস্থিত।

৬.পুরাতন মালদহের ধোপা পাড়ায় সর্বরীর শিবমন্দির অধিষ্ঠিত।

৭.পুরাতন মালদহের সর্বরীতে, মহানন্দা এবং কালিন্দীর সঙ্গমস্থলে তেলমুণ্ডির শিবমন্দির অবস্থিত, এটি তুফানপোদ্দারের শিবমন্দির নামেও পরিচিত।

৮. ইংরেজবাজার থেকে প্রায় ৭০ কি.মি উত্তরপূর্বে চাঁচল থানার কলিগ্রামের শিবমন্দির একটু

অন্যরকম।

৯. চাঁচলের হাতিন্দা শিবমন্দির --- হাতিন্দার পাশে একটি ফাঁকা মাঠে রয়েছে সুদৃশ্য এই শিবমন্দির।

১০. চাঁচল শিববাড়ি যেটি চাঁচলের রায়পাড়ায় অবস্থিত।

১১. রাণীর শিবমন্দির যেটি কালিয়াচক থানার অন্তর্গত শেরশাহী গ্রামে রাণীবাড়ি বলে প্রসিদ্ধ এক বৃহৎ অট্টালিকার চত্বরে অবস্থিত।

জলপাইগুড়ি জেলার শৈব ক্ষেত্র ঃ

উত্তরবঙ্গের শৈব সাধনার কথা বলতে গেলে জলপাইগুড়ি জেলার নাম অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। কেননা এই শহরে থেকে মাত্র ১৫ কি.মি দূরে ময়নাগুড়ি থানার 'জল্পেশ' মহাপীঠ অবস্থিত। যার অধিষ্ঠিত দেবতা শিব। এটি উত্তরবঙ্গ তো বটেই, বলা হয় সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শৈব ক্ষেত্র। এখানে শিবের কোনো মূর্তি নেই, এখানে রয়েছে শিবের অনাদি লিঙ্গ। তবে এই মন্দিরটি কত প্রাচীন এবং এটি কে নির্মাণ করেন সে সম্পর্কে নানা জনের নানা মত রয়েছে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় এই মন্দিরটি কোচ মহারাজা প্রাণনারায়ণ ১৬৩২-৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পুনর্নির্মাণ শুরু করেন। তবে তিনি এটির কাজ শেষ করতে পারেন নি। পরবর্তীকালে মহারাজা মোদনারায়ণ এর কাজ শেষ করেন। যা আবার ১৮৯৭ এর ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যায়। পরে ১৯২৭ সালে তা পুনরায় নির্মাণ করা হয়। এখনও এই নির্মাণটিকেই দেখা যায় বলে মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে 'মধুপর্ণী' পত্রিকা থেকে জানা যায় — ''ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল শ্রী এম. এস. ভ্যাটস্ থেকে শ্রীউপেন্দ্রনাথ বর্মণ পর্যন্ত অনেকেই এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে নানাবিধ মত প্রকাশ করেছেন। শেষ সিদ্ধান্ত আজও হয়নি। প্রবাদ এই যে কোচবিহারের মহারাজা প্রাণনারায়ণ একটি স্তম্ভশীর্ষে গাভীদের দুগ্ধ দান করতে দেখে পরে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে এখানে মন্দির নির্মাণ করেন। নরনারায়ণ, এমন কি বীরনারায়ণ প্রভৃতি কোচ-রাজগণ কর্তৃক জল্পেশ শিব প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়।''[৩৯] আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে আসলে এই জল্পেশ্বর কে? এই প্রসঙ্গে মনকরের মনসামঙ্গল কাব্য থেকে যা জানা যায় তা হল —

''কামতাইর রাজা বন্দো রাজা জল্পেশ্বর
একশত মহিষী বন্দো অঠার কুমার।।''[৪০]

এখান থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে 'জল্পেশ্বর' কামতার রাজা ছিলেন। আমরা জানি জলপাইগুড়িতে 'পৃথু' নামে এক রাজা ছিল। অনেকেই পৃথু রাজা এবং জল্পেশ্বর রাজাকে এক বলে মনে করেছেন। কিন্তু বুকানন হেমিল্টন এই দুজনকে আবার এক বলে মনে করেননি। খান

চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ উল্লেখ করেছেন জল্পেশ মন্দিরের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ পশ্চিমে ‘পৃথু রাজার গড়ে’ জল্পেশ্বরের রাজধানী ছিল। এখান থেকে স্পষ্ট পৃথু রাজার পর জল্পেশ্বরের আবির্ভাব। সেক্ষেত্রে দু’জন রাজা আলাদা। তবে হয়তো এদের ব্যবধান খুব বেশি নয়। আবার পৃথু রাজা সম্পর্কে জানতে পারি যে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে পৃথু রাজা বখতিয়ার খলজিকে পরাস্ত করেছেন। সেদিক থেকে এই সময়ের পরেই জল্পেশ্বরের আবির্ভাব হয়েছে বলে মনে করা হয়। আবার অন্যদিক থেকে যদি দেখি তবে দেখবো কামতা রাজ্যের আবির্ভাব পঞ্চদশ শতকে। কামতা রাজ্যের প্রথম রাজা কান্তেশ্বর ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে হুশেন শাহের কাছে পরাজিত হয়। এইসব দিক থেকে বিচার করে আমরা ১২০৬ থেকে ১৪৯৮ এর মধ্যবর্তী সময়েই কান্তেশ্বরের সময়কে ধরে নিতে পারি। আর এই লিঙ্গের আবির্ভাব প্রসঙ্গে মধুপর্ণী পত্রিকায় বলা হয়েছে — ‘‘প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে জল্পেশ মন্দির সংস্কারকালে জল্পেশদেবের আকার, বিস্তৃতি ও গঠনশিল্প কিরূপ তা দেখার জন্য লিঙ্গের চারদিকের মাটি আটফুট সরানো হয়। এই সময় লিঙ্গমূর্তি পরীক্ষা করে প্রসিদ্ধ নৃ-তত্ত্ববিদ শরৎচন্দ্র মিত্র মত প্রকাশ করেন যে এটি সাধারণ পাথর নয়। আকাশ থেকে পতিত উল্কা পিণ্ড। এই জন্যই লিঙ্গ মূর্তিতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মিত্র মহাশয় আরবের কাবা মসজিদে মুসলমান কর্তৃক চুম্বিত উল্কা প্রস্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। জল্পেশ শিবলিঙ্গের মতো এটিও উল্কাপিণ্ড এবং পবিত্র বলে স্বীকৃত। তিনি লিখেছেন--- আকাশ থেকে এই উল্কাপিণ্ডকে মাটিতে নেমে আসতে দেখে উত্তরবঙ্গের কোচ ও মেচ জাতীয় আদিম অধিবাসীগণ এটিকে অদৃশ্য দেবতা বলে মনে করে এবং এটির পূজা করতে শুরু করে। এই তথ্য জল্পেশ মন্দিরকে নূতন মর্যাদায় ভূষিত করবে। পরবর্তীকালে রাজা পৃথু (জল্পেশ্বর), কান্তেশ্বর, প্রাণনারায়ণ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজা বিভিন্ন সময়ে মন্দিরটি সংস্কার করেন।’’[৪১]

এতদঞ্চলের জল্পেশ মন্দির সম্পর্কে প্রচলিত মিথ থেকে জানা যায় যে, মহারাজা জল্পর পাঁচ পুত্র ছিল। বৃদ্ধ বয়সে মহারাজা সমস্ত সম্পত্তি সন্তানদের ভাগ করে দিয়ে তপস্যার জন্য বনবাসে যান। এরপর মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র ‘সুবাহু’ মন্ত্রীপরিষদ ডেকে মন্ত্রণা করে যে মহাদেবের যজ্ঞ করে তাকে সন্তুষ্টি করলে যুদ্ধে জয় লাভ করা যাবে। আর তাতে তিনি সম্রাট হতে পারবেন। মন্ত্রীরা এই জাতীয় হিংসাত্মক যজ্ঞ করতে দেবার জন্য রাজি হন না। কিন্তু সুবাহু তাদের কথা না মেনে যজ্ঞ শুরু করে দেন। জানা যায় পাঁচ যজ্ঞ থেকে ‘কৃত্তত্তরা ’ নামে এক শক্তি উৎপন্ন হয় এবং তার তেজ এবং প্রতাপে সকল পুরোহিত ব্রাহ্মণ, মন্ত্রীগণ ও পাঁচ ভাই এর মৃত্যু হয়। ফলে রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি হয়। যে সমস্ত প্রজারা জীবিত ছিলেন তাদের মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান ব্যক্তি বনে গিয়ে রাজা জল্পোর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সমস্ত বৃত্তান্ত শোনান এবং রাজাকে অনুরোধ করেন

তিনি যেন ফিরে গিয়ে রাজপাট সামলান যাতে রাজ্যে শান্তি ফিরে আসে।

এরপর মহারাজা জল্প উক্ত স্থানে চলে আসেন এবং মনপ্রাণ দিয়ে লিঙ্গরূপী শিবকে আরাধনা করেন। এতে মহাদেব ভীষণ সন্তুষ্ট হয়ে রাজাকে বরদান করতে চান। তখন রাজা দেবাদিদেবের কাছে বর প্রার্থনা করে বলেন-- হে দেবাদিদেব মহাদেব, যদি আপনি বর দিতে চান তাহলে এমন বর দিন যাতে নর-নারী আপনার প্রতি ভক্তি ভাবনার আরাধনা নিয়ে আসে, তাদের সর্বসিদ্ধি হয়। তখন মহাদেব রাজা জল্পের বর প্রার্থনায় খুশি হন, এবং বর দান করেন। মহাদেব খুশি হন কেননা সে নিজের জন্য কিছুই না চেয়ে প্রজাবৃন্দের জন্য চেয়েছেন। আর এতেই এই অনাদিলিঙ্গকে মহাদেব 'জল্পেশ্বরের লিঙ্গ' নাম দিয়ে দেন। জানা যায় তখন থেকেই এই লিঙ্গের নাম 'জল্পেশ্বর শিবলিঙ্গ'।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের আরও একটি উল্লেখযোগ্য শৈব ক্ষেত্র হল জটিলেশ্বর শিবমন্দির। পূর্বডহর এই মন্দিরের অধিষ্ঠিত দেবতা হলেন লিঙ্গরূপী শিব। যা ময়নাগুড়ির পূর্বদিকে জল্পেশ মন্দির থেকে ৪ কি.মি দূরত্বে অবস্থিত। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় জটিলেশ্বর এবং জল্পেশ দুই ভাই। এদের মধ্যে জটিলেশ্বর আগে পূজা পাবেন এবং পরে পাবেন জল্পেশ। এ প্রসঙ্গে একটি মিথ থেকে জানা যায় যে, মহাদেব অনুচর নন্দী নাকি এই জায়গায় সাধনা করে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাকে বর দিয়েছিলেন। যে এই অঞ্চলে কোথাও পূজা দেবার আগে প্রথম পূজা দিতে হবে এই মন্দিরে। সেটল্‌মেন্ট রিপোর্টে ময়নাগুড়ি তহশীলে পূর্বডহর নামটি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন---'প্রথমে পূজ্য দেবতা' অর্থাৎ 'মহাদেব'। এছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে আরও চারটি শিব মন্দির রয়েছে--- জল্পেশ্বর, জটেশ্বর, বটেশ্বর এবং সোদরখাই। এই পঞ্চশিবের মধ্যে জটিলেশ্বর সবার আগে পূজা পাবেন।[৪২] পূর্বোক্ত মিথের ইঙ্গিত হয়তো সেদিকেই রয়েছে। মন্দিরটি অনেক প্রাচীন এবং কাটা পাথরের নির্মিত। যার গাত্রে বিভিন্ন দেব-দেবী ও নৃত্যরতা গণেশ প্রভৃতি ভাস্কর্য রয়েছে।

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকে ময়নাগুড়ি ও জল্পেশের মধ্যবর্তী মাধবডাঙ্গা গ্রামে বটেশ্বর মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটিও শিবের মন্দির। মন্দিরটির চূড়া বর্তমানে ভগ্ন। এই মন্দিরের সঙ্গে অনেকেই গৌহাটির কামাখ্যা মন্দিরের মিল খুঁজে পান, বিশেষ করে স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে। এটি ছাড়াও জেলার রাজগঞ্জ ব্লকে ভদ্রেশ্বর শিবমন্দিরের হদিশ পাওয়া যায়। এখানকার শিব ভদ্রেশ্বর নামে পরিচিত। মন্দিরটি রাজগঞ্জ থেকে প্রায় ৮ কি.মি দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হুদুগছ গ্রামে অবস্থিত। এছাড়াও উল্লেখ্য এই শিবের নামে সেখানকার স্থান নাম চিহ্নিত হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার শৈব ক্ষেত্র ঃ

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ঐতিহ্যবহনকারী বিভিন্ন শৈবক্ষেত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নড়বড়িয়া শিবমন্দির। যদিও এটি লোক দেবতা হিসেবেই বেশি পরিচিত। এই শিব সম্পর্কে এতদঞ্চলে বিভিন্ন কিংবদন্তি ছড়িয়ে রয়েছে। এই মন্দিরটি জেলার টাঙ্গন নদীর পাড়েই অবস্থিত।

বর্তমানে নড়বড়িয়া শিবলিঙ্গের অবস্থান দেখলে বোঝা যায় লিঙ্গটি উত্তর-পূর্ব দিকে হেলে আছে। এরূপ হবার পিছনে একটি কিংবদন্তি এখানে প্রচলিত আছে। সেই কিংবদন্তী থেকে জানা যায় যে, এক সময় নড়বড়িয়া শিবের প্রচুর ধন সম্পত্তি ছিল। সেই ধন-সম্পত্তির লোভে এক গুণিন তা চুরি করতে আসে। গুণিন বুঝতে পারে যে যদি নড়বড়িয়া শিবের ধন চুরি করতেই হয় তবে তাকে তার স্থান থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। একারণে গুণিন সারারাত ধরে নড়বড়িয়াকে তাড়ানোর চেষ্টা করে এবং লিঙ্গের চারপাশে মাটি খনন করতে থাকে। এভাবে সারারাত ধরে সেই মাটি খনন চলতে থাকে, কিন্তু কিছুতেই তাকে সে উচ্ছেদ করতে পারে না। বরং যত মাটি খনন করে শিব লিঙ্গ তত বাড়তে থাকে। সে জানে যেনতেন প্রকারে যদি নড়বড়িয়াকে উচ্ছেদ করা যায় তবে তার সমস্ত ধন সম্পত্তি সে নিজের হাতে নিয়ে আসতে পারবে। তাই হতাশ হয়ে সে অন্য উপায় বের করে। পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের কাঠ জোগার করে তাতে আগুন লাগিয়ে নড়বড়িয়াকে পুড়িয়ে ফেলবার মতলব করে এবং সেই মতলববশত সে পার্শ্ববর্তী বনজঙ্গলে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে তার উত্তাপে শিবলিঙ্গ ফুটতে থাকে এবং সেখান থেকে বিকট শব্দের সৃষ্টি হয়। এভাবে সমগ্র জঙ্গল যখন দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে, তখন নড়বড়িয়া নিজের বিপদ বুঝতে পারে। কিছুতেই সে বাঁচবার পথ খুঁজে পায় না। এমন সময় নড়বড়িয়া বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতে থাকে। সেই চিৎকার শুনে ওপার থেকে মাশান ঠাকুর এপারে আসে এবং নড়বড়িয়ার বিপদ লক্ষ্য করে। তখন মাশান নড়বড়িয়াকে বাঁচানোর জন্য পার্শ্ববর্তী টাঙ্গন নদীর জল এক পা দিয়ে আটকে দেয়। ফলে সমগ্র জল অগ্নিদগ্ধ নড়বড়িয়ার উপর দিয়ে বয়ে যায়। এতে আগুন নিভে যায় এবং নড়বড়িয়া শিব উদ্ধার পায়।

এভাবে নড়বড়িয়া উদ্ধার পেল ঠিকই, কিন্তু আগুনের তাপে তার মাথার অনেকটা অংশ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। জানা যায় মাশান ঠাকুরের এই উপকারের জন্য তখন থেকে নড়বড়িয়া মাশান ঠাকুরের দিকে মাথা নত করে থাকে। এই প্রচলিত কিংবদন্তী প্রায় কুশমণ্ডির সমস্ত মানুষের মনে অটুট রয়েছে। যার প্রমাণ পাই আজও এখানকার মানুষেরা এই শিবকেই রক্ষাকর্তা হিসাবে মনে করে।

শুধু তাই নয় শিবরাত্রিতে এখনও এতদঞ্চলের মানুষেরা কঠিন ব্রত পালন করে। শিবের

মাথায় জল ও দুধ ঢালার জন্য আগের দিন রাত্রি থেকেই শুরু হয় লোকের আগমন। সারারাত ধরে উপোস থেকে শিবের ধ্যানে কিংবা শিব নাম জপ করে ভোরবেলা পার্শ্ববর্তী নদী থেকে জল নিয়ে আসে এবং তা শিবলিঙ্গের উপরে ঢেলে নিজেদের ব্রত সমাপ্ত করে। শিব ভক্তরা ধুতুরা ফুল, বেল, বেলপাতা, তুলসীপাতা, ফল প্রভৃতি নড়বড়িয়ার সামনে উৎসর্গ করে। এবং জানা যায় এতে তারা প্রয়োজন মতো ফল লাভ করে।

এতদঞ্চলের মানুষের রক্তের সঙ্গে যেন এই নড়বড়িয়া মিশে আছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় সমাজে প্রচলিত নড়বড়িয়া পাঁচালি থেকে। স্থানীয় লোককবিরা খুশি হয়ে এই নড়বড়িয়ার মাহাত্ম্যের কথাকে সামনে রেখে দীর্ঘপাঁচালি রচনা করেন। এই পাঁচালি থেকে নড়বড়িয়ার মাহাত্ম্যটুকু আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এখানে সেই পাঁচালির কিছু অংশ তুলে দেওয়া হল।

শিব নড়-বড়িয়ার ভাবনা

বার মাসে শিব থাকে একেলা একেলা
টাংগীল নদীর ধারে কাটে তার বেলা।
দূর্বা বান্ধা ধাম তার আম পাতার গুহা
কেহই নাহি জানে শিব নড়-বড়িয়া।
শিব ভাবে ভক্ত বিনে কে পূজিবে তারে
ভক্ত নাহি জানে আছি টাংগীলের ধারে
দেখা নাহি পায় লিঙ্গ চিহ্ন মাত্র সার
কেমনে মাহাত্ম্য করি জগতে প্রচার।
বহু যনি এক লিঙ্গ মাথা নড়ং বড়ং
মুই বড় জাগ্র শিব তাই নড়ং চড়ং।
সতী দেহ যে খানেতে পতিত ভূতলে
স্বয়ং শিব সতী তথা থাকে দুই মিলে।
এ মহাতীর্থ বেতাহার নড়-বড়িয়া
ভক্ত কৃপা হেতু তাই আজি বিরাজিয়া।
উপকার না করিলে কেন দিবে পূজা
উপকার করিলে তবে পূজবে প্রজা।

এই ভাবি -

নড়-বড়িয়া ভিখারি উপ যে ধরিল
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিল।
দেখিল এক সতী নারী নাম কুবতী
মধ্য বয়সের সেই সুন্দরি যে অতি
গাভুরা সুন্দরি নারী পুত্র নাহি কোলে
দুঃখ তার বার মাস পুত্র নাই বলে।
মানে ভাবে শিব, এই তার ভক্ত হবে
যোগ্য শিশ্যা করিব যে তাকে এই ভবে।
যেন -তেন প্রকারে পরিচয় জানাব
সকাল সন্ধ্যা মোর আরতী করিতে বলিব।
মোর ভক্তিতে পাবে কোলে পুত্র সন্তান
মোর বরে পাবে এই দুঃখে পরিত্রাণ।

এই ভাবি একদিন নিঝুম দিবসে
কুবতির ঘরে নিজে বার্তা দিতে আসে।
কে মাগো ঘরতে আছ ভিক্ষা মাগি দ্বারে
আসিয়াছি তব দ্বারে ভিখ দেহ মোরে।
শুনি ভিখারির ডাক সুন্দরী কুবতি
ভিক্ষা লয়ে দ্বারে এল অতি শিঘ্র গতি
ভিখারি বলে কৈনা তুমি যে ভগবান
ভুক্ত দিনে তুমি মোরে অন্ন দিলে দান।
না ভাবি না বিচারি ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিবে
তমার যাহা কামনা তার কাছে চাবে।
কামনা বাসনা পুরে ভিখারী ব্রাহ্মণ
তুচ্ছ ভাবে না দেখি-অ ভিখারির মন।
কুবতি কহে ঠাকুর দুঃখ বার মাস
ধন সম্পত্তি জোত জমি কে করে চাষ।

হেন সুন্দর গতরে হয়ে আছি বাঞ্ছা
তব দয়া ঠাকুর পরা অ মন বাঞ্ছা।
কুবতি বলে মোর পুত্র সন্তান নাই
ভিখ মাগি তব কাছে এক পুত্র চাই।
বর দিনু সতী কৈনা কর শিব ধ্যান
সকাল সন্ধ্যা শিব ধ্যান হবে কল্যাণ
মোরে খুজি পাবে টাংগীল নদীর ধারে
কাথা দিনু খুজো প্রয়োজন যদি পরে।
ব্রাহ্মন উপী শিব গেল যে দেশান্তরে
শিব নাম জপে কৈনা অন্তরে অন্তরে।

ভিখারির কাথা শুনে কুবতির আনন্দ
পূর্ণিমার রাত্রি সম আলোকিত অঙ্গ।
মনেতে ফুটি ফুল বহে মৃদু মন্দ বাতাস
স্ফূর্তি হল দেহ তরঙ্গ মনে নাই হুতাস

ভিখারি ব্রাহ্মণের উপদেশ

কুবতির দুঃখের কাথা শুনিয়া ভিখারি ব্রাহ্মণ
নিরখিয়া দেখে কুবতির গাভুর যৌবন।
সুন্দর অঙ্গের সভা মুখে সদা হাসি
এ কৈনার এই দুঃখ যেন ফুটা ফুল বাসি।
চিকন আকাশে মেঘ অকালতে তার
রটিয়াছে তার বাঞ্ছা বাঞ্ছা পারাতে প্রচার।
এমন কৈনার দুঃখ জগতে থাকিতে না পারে
কিছু ভুল আছে নিশ্চয় স্বামী-স্ত্রীর গতরে।
জমি হয়ত ঠিকে আছে বিজে নাই প্রাণ
মৃত বীজ পরিলে ভূমে তাতে নাহি জন্মে সান।

এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ তারে কহিলেন সকল
মহাভারতের অমৃত কথায় কৈনা আছে-সেই কৌশল।
এক সত্য কাথা কহি মহাভারতের
সর্ব হর সুখ-দুঃখ মহাকাব্য জগতের।
সেই মহাভারতে পাণ্ডু নামে ছিল এক রাজা
নিজ কর্মদোষে পেল রতিকালে সাজা।
ব্রাহ্মণের অভিশাপ তার শৃঙ্গারে যে মৃত্যু
না জন্মনিল কুন পোষ্য রাজ্য চালনা হেতু।
দুই স্ত্রী পূর্ণ যৌবনা নাম কুন্তী-মাদ্রী রানী
পরমা সুন্দরী গাভুরী পদ্ম সমমানী।
শৃঙ্গার লালসা মনেতে রাজার
ব্রহ্ম শাপ মনে পরে বারবার
মদন বানে জরজরিত রাজার অন্তর
দেখিয়া দুই রানীর গাভুর গতর।
জানিয়া ব্রাহ্মণের শাপ রাজার উপরে
কুন্তী-মাদ্রী দুঃখভাবে অন্তরে অন্তরে।
ফুলে যদি নাহি ফুটে ভমরার হুল
কেমনে বৃদ্ধি হবে ফুলের বংশ কুল।
শৃঙ্গার করিলে রাজার মৃত্যু যদি হোবে
মৈথুন না করিলে পুত্র কিভাবে জন্মাবে।
পুত্র পৌত্র কামনা স্বামীর বর্তমানে
পুত্র নিলে স্বামী মৃত্যু দেখিব নয়নে।
এই চিন্তায় দিন কাটে রানী কুন্তি-মাদ্রী
ইহা দেখি পাণ্ডু রাজের কাতর হইল হৃদী।
একদিন পাণ্ডু-নৃপ-কুন্তি -মাদ্রির সনে
বসিল নিগুঢ় আলোচনায় আনন্দিত মনে।

আমি উপদেশ করি দোহে পৌষ্যের কারণে

বংশ রক্ষা হয় যেন ইহা ভাবো মনে।
মম দিতে ক্ষমতা নাই সন্তান সন্ততি
এই বর দিলাম যে তোমাদের প্রতি।
বলিলেন সুমধুর সুরে তবে পাণ্ডু কুলপতি
মম হতে না জন্মালে-অ তমরা যুগে যুগে সতী।
এই উপদেশ দিল ব্রাহ্মণ কুবতির কানে
পাণ্ডু বংশের কাথা পরলোক ইহলোক জানে।
এত না ভাবিয়া তুমি কর দেবতার পূজা
দেবতা তুষ্ট হইলে ঘরে আসবে প্রজা।
ঘরেতে না থাকিলে বস্তু ক্রয় করা উচিত
বংশ রক্ষা হেতু না ভাব হিতা হিত।
স্বামী-স্ত্রী দুজনাতে এক ভাবনা চাই
সংসার সুখের হয় না থাকে নাই নাই।
আর এক কাথা কহি কৈনা সংসারের
গৃহ হিনে ঘর দিলে পূণ্য তমাদের।
আর বার্তা কৈনা দিই তব কল্যাণে
সদা ভাবো এই কাথা মানুষ সেবনে।
নারায়ণ হৈতে নর ভবে হৈল সৃষ্টি
এই শাস্ত্র মত কাথা যুগে যুগে কৃষ্টি।
ভিখারী ব্রাহ্মণ রূপী দেবতা ঈশ্বর
শিব আসল শক্তি নিত্য তুমি পূজা কর।
এই উপদেশ দিয়া চলিলাম অন্তরে
ইহা শাস্ত্রের সত্য কাথা পৌষ্য সৃষ্টি তরে।

শাশুরির গঞ্জনা

নিত্যি নিত্যি শ্বাশুরি ভেদ-কান্দুরি কান্দে
কহে এই মাগী বহু হয়ে দুঃখ পদে পদে।

সুন্দরী গাভুর গতর খালি জীবনের ত বাঞ্ছা
ইশ্বর দিয়াছে উপ খাই বুঝি গাঞ্জা।
ধনশ্বর কুষিয়ার যেনং মাগীটার গতর
তার উপর যৌবন দেখি ছড়া বুড়া নেতর।
এখুন ধরিয়া মাগী ঠাকুর ভজনা
সান-বেহান কপাল ঠুকে ঠাকুরের ঠিনা।
কি যে করিবে পাথর শিব বেতাহার
টাংগীলের পাহাড়ায় দিন কাটে তার।
টাংগীলের জলে শিব নিত্য করে স্নান
প্রেম-পিরিতি সব তাকেই করে দান।
বারমাসে থাকে জল বহে টান ঢিল
সে কারণে নর নাম থুইয়া টাংগীল।
শিব নড়-বড়ি ডাকি বহে চুখু নদি
ঠাকুর হয় কি বাঞ্ছা মাগীর দরদি।
নিরামিষ অন্ন খায় থাকে উপবাসী
মানুষ সেবায় হৈলে সবার দাস দাসী
যে যাহা চাহায় তাকে সেই করে দান
নর-নারীর দুঃখে যে কান্দে তার প্রাণ।
পুখুর ভরা মাছ আর গলা ভরা ধান
বছর বছর ধন সম্পতির যেন ভরাবান।
বেটা বকে মাকে কুবতিকে কেন কহ মন্দ
তার কৃপাতে ধন-সম্পতি ঘরে ছে মা ছন্দ।
আন্ধুন বারুন সব করে ত কুবতি
কেন তাকে কষ্ট দিচ্ছ অন্যায় তার প্রতি
কুবতিকে বেহা করি মোর কুন অভাব নাই
কুবতিকে কর গঞ্জনা আমি দেখতে পাই।
মুই হয়তো অক্ষম মাগে নয়ত কুবতি
কারো অঙ্গের আছে ঘারতি না জন্মে সন্ততি।

দেহ ক্ষেত্রের কাথা মা কে বলিতে পারে
প্রকৃতির খেলা মাগে জন্ম-জন্মন্তরে।
বেটার কাথাতে শ্বাশুরি না দেয় কান
কহে বেটা অন্য একটা বহু জুড়ি আন।
আনকে চানকে শ্বাশুরি কু কাথা বলে,
না দেখিনু নাতি পুতি জীবন অস্তাচলে।
বৃদ্ধা কালের সাধ খেলাই নাতি-পুতি
বেটা বহু হইল মোর বাঞ্ছা মাগী সতী।
মোর বেটা অন্ধ-কানা বহু কুবতির যৌবনে
তাকে ছাড়া অন্য কইনা নাহি ধরে মনে।
অত করি কহুং বেটা কোর অন্য একট বেহা
যে বহুর কলাত ছুয়া কান্দবে কাহা কাহা।
শুনি কুবতির চক্ষু হয় অশ্রু নদী
কে করিবে উপকার কে আছে দরদী।
ভরা সুন্দর বুক তার ছুয়া নাহি খায়
কুবতি ভরা বুক আছে অবহেলায়।
কুবতি সুন্দরি দিন সুখে দুঃখে যায়
পূজে নড়-বড়িয়া সে সকাল সন্ধ্যায়
বলে সৃষ্টি দাতা শিব এ বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডে
এক পুত্র ভিখ মাঙ্গি মোর গর্ভ-ভান্ডে।
কুবতি দুঃখ কাথা নিম-তিতা সমান
যে পরে এই পাঁচালি সেই পুন্যবান।

শিব নড়-বড়িয়ার আত্মপ্রকাশ

বৈশাখ মাস ধর্মমাস ধর্মেতে বয়
গায়ে গায়ে হরি পূজা মহানন্দে হয়।
জৈষ্ঠে পাকা আম লোকে মহাসুখে খায়

গরমে গরমে লোক ঘামিয়া সিনায়।
আষাঢ়ে জমি বিলে কৃষক বাহে হাল
খরাক দিবা যায় বৌ পিঠে বান্ধি ছাওয়াল।
বর্ষায় জল বর্ষণে ভরে উঠে খাল
ব্যাঙ ব্যাঙি প্রেম করে পশায় ছা-য়াল।
শাউনে মাঠে মাঠে কৃষক উপে ধান
পেচ পেচা কাদুতে আঙ্গল পকা খান।
ভাদ্রে নয়া কৈনা যায় ভাদর কাটানি
জামাই সোহাগি শ্বাশুরি মন টানা-টানি।
আশ্বিনে দুর্গা মায়ের পাই আশির্বাদ
জমিতে চাষি করে শাখ-সবজি আবাদ।
কার্তিকে কালি পূজা চোক-চুন্দি গান
ডমনা ডুমনি সাজি মাংগি বেড়ায় ধান।
অঘনে নয়া চাউলের ঘর ঘর নবান্ন
আত্মীয় সজনে গারস খায় নয়া অন্ন।
পৌষে চাষি ধান কাটে ধানে ভরে গলা
বহু বেটিরা আনন্দে করে হাটা চলা।
মাঘে কাটাহারা জার ঝাপ টানা-টানি
তাঁতে পাটার ঝালং বুনে পারার নানি।
ফাল্গুনে আম গাছে গাছে আম্র মহুল
মৌমাছি মধুর লোভে ফুলে ফুটায় হুল।
চৈতে প্রখর রোদে শুকায় খাল বিল
মাছ খাই আকাশে যে সুখে উরে চিল।

এই ভাবে বার মাস কাটে কুবতির
মন তার চঞ্চল যে বড়ই অস্থির।
ভিখারি ব্রাহ্মণ বলে শাস্ত্র কাথা তারে
ভিখারি ব্রাহ্মণ কাথা সদা মনে পরে।

মহাভারতে আছে নাকি সব ঔষধী
কুবতি ভাবে সেই কাথা এই অবধী
কি ভাবে পান্ডু রাজের বংশ রক্ষা হয়
মহাভারতে তারই বংশ পরিচয়।
গৃহে না থাকিলে বস্তু ক্রয় করা যায়
এ কেমন শাস্ত্র কাথা ভাবিয়া না পায়।
বীর্য্য বীজ ভবে বংশ বৃদ্ধি করে
মনুষ্যের বীজ ক্রয় করিব কি করে।
এর মূল্য তত্ত্ব জ্ঞানী যে কহিতে পারে
এ তত্ত্ব বুঝিতে যাব টাংগীলের পারে।
সেথায় ভিখারি ব্রাহ্মণ করে যে বাস
তার কাছে শুনিব এ তত্ত্বের প্রকাশ।
সেই ভাবি একদিন গেল টাংগীলের ধারে
খুজিয়া বেড়ায় ব্রাহ্মণে নদীর পারে পারে।
নিঝুম গহিন বন দিনেতে আন্ধার
সুমধুর পখী ডাকে শুধু বনে তার।
কে দিবে উদ্দিশ তারে ব্রাহ্মণের ঘর
বলেছিল এ বনে আছে পরামপর।
কুবতি গাভুর অঙ্গে ফুটে বন কাটা
শিহরি উঠে অঙ্গ যে গায়ে দেয় কাটা।

কার কাছে পুছিবে ভিখারির খবর
ক্লান্ত অবসন্ন অঙ্গ কাপে থর থর।
পুছে বৃক্ষ-গুল্ম লতা ভিখারিকে জান
এ জঙ্গলে বাস তার দেখেছ কখন।
ডাহুক ডাহুকি তরা থাক চিরকাল
টাংগীলের জলে নায় সকাল বিকাল।
দুটা ঘুঘু প্রেম করে বৃক্ষ ঠালে বসে,

তমরা দেখেছে কি কুবতি জিজ্ঞাসে।

এভাবে কুবতি বনে করে হাহাকার
তার দুঃখে তাজা পুষ্প ঝরে বিথিকার।
সব মিথ্যা মায়া-জাল এভব সংসার
ঠক্ কি ব্রাহ্মণ তার মিথ্যা কাথা সার।
জীবনে বাঞ্ছা বাঞ্ছা শুনিম আর কত
এ জীবন করিম টাংগীল জলে গত।
ভাবিতে ভাবিতে তার চোখে এল জল
হঠাৎ করিয়া বন হইল উজ্জ্বল।
সুবাতাস লাগে অঙ্গে ঘ্রানে ফুল গন্ধ
চার দিক ফট ফটা মনে হাসে ছন্দ।
লতা-লতায় ফুটি নানা জাতের ফুল
মৌমাছি প্রজাপতি ফুলে ফুটায় হুল।
হুলের আঘাতে তাজা ফুটা ফুল হাসে
তাতেই ফুলে ফুলে সতেজ ফল আসে।
একই ফুলে বসে যে হাজার পতঙ্গ
ফুলের মধু খেয়ে খেয়ে তারা মাতঙ্গ।
মোর গাভুরী গতর এক ফুটা ফুল
স্বামী সর্বে সর্বা ভাবি তাকি আছে ভুল।
এমন ভাবনায় কুবতি হল মগ্ন।
মহাভারতের আছে নাকি তার মর্ম।

হঠাৎ দেখিল হাটে ভিখারি ব্রাহ্মণ
সেই উপজ্যোতি তার আছে এখন।
ঠাকুর ঠাকুর ডাকি পিছে পিছে ধায়
দেখে ব্রাহ্মণ সামনে জোরে হাটি যায়।
এই দেখে এই নাই জঙ্গল আন্ধারে

কহেছিল দেখা হবে বনের মাঝারে।
ফলিল ব্রাহ্মণের কাথা সত্য সত্য
মিথ্যা নয় ব্রাহ্মণ নিশ্চই পাম পুত্র
ঘর নাই বাড়ি নাই থাকে সে এখানে
এত ডাকি তবু-অ না ঢুকে তার কানে।
অদৃশ্য হইল ব্রাহ্মণ চক্ষু নিমেষে
কুবতি ভাবিল আছে এর আসে পাশে।
এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণে খুজিতে লাগিল
হঠাৎ করিয়া দেখে এক শিবলিঙ্গ।
আম পাতার গাছের গুহায় সে স্থান
কুবতির মনে পরে ব্রাহ্মণ বাখান
বলেছিল শুদ্ধমনে শিবে কর ধ্যান
সৃষ্টি দাতা শিব তব করিবে কল্যাণ
বেলাভাটি গড়ি যায় সূর্য্য ডুবে প্রায়
কুবতি আর না ব্রাহ্মণের দেখা পায়।
গোধুলা নামি আসে টাংগীলের ধারে
ভাষায় ফিরে পখিতার পথ অনুসারে।
কুবতি ভাবিল তবে হর গৌরি হরি
এবুঝি আসল শিব শিলা রূপ ধরি।
তাই টাংগীলের শুদ্ধ জলে করি স্নান
ভিজা কাপরে করিল শিবে ফুল দান।
তুলিয়া বনের ফুল গাঁথি ফুলমালা
শিব লিঙ্গে পিন্ধাইয়া ভিখ মাঙ্গে লালা।
আত্ম নিবেদন করে শিবে এ যৌবন
লুটাই ধরি সে শিবে করি আলিঙ্গন।
গাভুরি গতর সব শিবে নিবেদিল
স্পর্শ মাত্র শিব লিঙ্গে রমাঞ্চ জাগিল
হিয়ল হৈল গতর শিব আলিংগনে

শিব কৃপায় ছুয়া হয় সকলে জানে।
পুষ্ট হৈল তার দেহের অঙ্গ পতঙ্গ
শুদ্ধ হইল দেহ যে ছুই শিব লিঙ্গ।

কালে কালে গতী চলে আপন খেয়ালে
কুবতির আশা পূর্ণ হয় তলে তলে।
নড়-বড়িয়া কৃপা ব্রাহ্মণ উপদেশ
কুবতি ভাবিল যে সত্যি এই আদেশ।
এই ভাবে শিব যে আত্ম প্রকাশ করে
সে থাকি নড়-বড়িয়া থান ঘরে ঘরে।
কুবতি হৈতে শিব কাথা প্রচার হৈল
শিব লিঙ্গ দেখি গাও-বাসি ধন্য কৈল।
আশ্চর্য গঠন শিব ঘুরে চক্র প্রায়
কামনা-বাসনা পুরনে সবাই ঘুরায়।
গাওবাসীনি হৈল যে প্রথমে পূজারি
নড়-বড়িয়া শিব-হর নাম হৈল তারি।
সর্ব হর নড়-বড়িয়া দেশে প্রকাশ
পাঁচালিতে শিব মাহাত্ম্য হৈল প্রকাশ।[৪৩]

এখান থেকেই স্পষ্ট অবিভক্ত দিনাজপুরের ঐতিহ্য। যে ঐতিহ্য কালপরম্পরায় একটি শিব লিঙ্গ বহন করে নিয়ে চলেছে। এটি ছাড়াও দুই দিনাজপুরে আরও অসংখ্য শৈব ক্ষেত্র রয়েছে, সেগুলিও এই ঐতিহ্যের সাক্ষী।

তথ্যসূত্র ঃ

১. ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য , হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, প্রথম পর্ব, পৃ. ১।

২. মোহনলাল মণ্ডল, হাওড়া জেলার লৌকিক দেবদেবী, পৃ. ৭৮।

৩. অশোক রায়, বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিবলিঙ্গ, পৃ. ১১৫।

৪. তদেব, পৃ. ১১৬।

৫. তদেব, পৃ. ১১৬।

৬. তদেব, পৃ. ১১৮।

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য , বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ১৯৫-৯৬।

৮. তদেব, পৃ. ১৪২।

৯. R.C Mazumdar, The Indian Valley Civilization by A.D Pulaskar/" THE HISTORY AND CULTURE OF THE PEOPLE" Vol-I, e.d, p.190.1996.

১০. মিহির চৌধুরী কামিল্ল্যা, আঞ্চলিক দেবতা ঃ লোকসংস্কৃতি, পৃ. ১২৪।

১১. ড. শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা দলৈ, অসমত শৈব-সাধনা আরু শৈব-সাহিত্য, পৃ. ৪।

১২. পল্লব সেনগুপ্ত , পূজা-পার্বণের উৎস কথা, পৃষ্ঠা ২১৭-২১৮।

১৩. তদেব, পৃ. ২১৯।

১৪. গুরুদাস ভট্টাচার্য , বাংলা কাব্যে শিব, পৃ. ১০।

১৫. অশোক রায়, বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিবলিঙ্গ, পৃ. ১৩৬-৩৭।

১৬. ড. গিরিজাশংকর রায়, উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, পৃ. ১২।

১৭. গুরুদাস ভট্টাচার্য , বাংলা কাব্যে শিব, পৃ. ১০।

১৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য , বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ১৪২।

১৯. ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্যে ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, পৃ. ৯৮।

২০. বীরেশ্বর দেবশর্মা, দেবীভাগবত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৪।

২১. ড. খোকন কুমার বাগ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব-কাহিনী ঃ উপেক্ষিতের কথা, পৃ. ৩৪।

২২. পঞ্চানন তর্করত্ন অনুবাদিত লিঙ্গপুরাণ/পূর্ব্বভাগ/৩য় অধ্যায়, পৃ. ৪, ১৩৯৬।

২৩. ড. হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, প্রথম পর্ব, পৃ. ২০।

২৪. ড. খোকন কুমার বাগ , তদেব, পৃ. ৩৬।

২৫. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় , বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৮-৮০।

২৬. করুণাসিন্ধু দাস, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৮, পৃ. ২০৫।

২৭. সুরেশ চন্দ্র ব্যানার্জী সম্পাদিত, সুদুক্তি কর্ণামৃত, ফার্মা কে, এল, এম, ১৯৬৫, পৃ. ১১।

২৮. ড. খোকন কুমার বাগ , তদেব, পৃ. ৪৬।

২৯. কিশোরীমোহন মৈনান, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রকীর্ণ-কবিতার অনুসরণ, অসীমা প্রকাশনী, ১৯৯৯, পৃ. ৪৭৫।

৩০. তদেব, পৃ. ২৩১।

৩১. বিদ্যাপতির শিবগীতি, সুধীর রঞ্জন মজুমদার সম্পাদিত , কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২, পৃ. ১৩১।

৩২. তদেব, পৃ. ৬৩।

৩৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য , বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পৃ. ১৪৫।

৩৪. তদেব , পৃ. ১৪৬।

৩৫. ড. গিরিজা শংক র রায়, তদেব পৃ. XXV.

৩৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য , তদেব, পৃ. ১৪৪।

৩৭. শ্রী হিমাদ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, কোচবিহারে প্রাচীন প্রথার কিছু জানা ও অজানা কথা, পৃ. ৩৬-৩৭।

৩৮. সুস্মিতা সোম, মালদহ ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোকউৎসব, পৃ. ৮৩।

৩৯. অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), মধুপর্ণী, পৃ. ৮৪, নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, জলপাইগুড়ির মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা; বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা- ১৩৯৪।

৪০. শশী শর্মা (সমীক্ষক), কবি মনকর বিরচিত মনসা কাব্য, পৃ. ১৬।

৪১ অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), মধুপর্ণী, পৃ. ৮৪-৮৫, নির্মল চন্দ্র চৌধুরী, জলপাইগুড়ির মন্দির, মসজিদ ও গীর্জা; বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪।

৪২. অরবিন্দ কর (সম্পাদিত), জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৪৭০।

৪৩. সংগ্রহ- খুশি সরকার (৪৫), কুশমুণ্ডি, দক্ষিণ দিনাজপুর।

চতুর্থ অধ্যায়
উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি ও শিব

ভারতীয় জীবন সাধনায় শৈবধর্মের স্থান সর্বোচ্চে। সকল ভারতীয়দের কাছে শিব শাশ্বত, চিরসত্য। সভ্যতার সূচনাকাল থেকে মানুষ এই শিবকে গ্রহণ করেছে। আর এই শিবও সেই সময় থেকে এই সময় পর্যন্ত সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সমন্বয়ের কাজ করে যাচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় আর্য অনার্যের সমন্বয় শিবের মাধ্যমেই হয়েছে। এ চিত্র শুধু সেকালের নয়, একালেও তা দৃষ্টিগোচর হয়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জাতি-জনজাতির কাছে শিব বিভিন্ন রূপে পূজিত।এর ফলে এতদঞ্চলে ধর্মীয় সংঘাতের দানা বেধে ওঠার সুযোগ খুব কম। একারণেই সব ধর্মের কাছে শিবকেন্দ্রিক নানান কথা আজও গৌড়চন্দ্রিকা হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাইতো সকলের কাছে শিব নাম পরম পবিত্র, অসীম শক্তিসম্পন্ন এবং অপার শক্তির অফুরন্ত উৎসস্বরূপ। এই নামের মধ্যেই যেন চরম শান্তি বিরাজ করে। যে শান্তিতে সর্বপাপ ক্ষয় হয়, সমস্ত জড়তা কেটে যায়। পরম কল্যাণ হয় বলে আজও এতদঞ্চলের মানুষের বিশ্বাস। তাইতো বাঙালির মনে কথায় কথায় শিব নাম। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির প্রায় প্রতিটি উপাদানের মধ্যেই আমরা এই শিবের পরিচয় পাই।

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে শিব প্রসঙ্গ আলোচনা করার পূর্বে লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে সংক্ষেপে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। আসলে লোকসংস্কৃতির আলোচনায় যে লোকের কথা আমরা বলি সেই 'লোক ' বলতে নির্দিষ্ট কোনো একজন লোককে বোঝায় না। বোঝায় এমন একদল মানুষকে যারা একটি গোষ্ঠীগত সমাজের মানুষ। শুধু তাই নয়, তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো এই রকম হবে যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এবং বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলে এক ধরণের বিশ্বাস, সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, উৎসব প্রভৃতি পালন করে থাকে। আর সংস্কৃতি হল এসবের অনুশীলন, যা কালপরম্পরায় বহমান। অর্থাৎ এক কথায় লোকসংস্কৃতি হল সেটাই যাতে লোকমানসের প্রতিফলন ঘটে, যেখানে লোকসমাজের জীবনচর্যার রূপটির প্রকাশ পায়। এই লোকসংস্কৃতি কতগুলি উপাদানে গঠিত, যেগুলো লোকসমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই লোকসাহিত্য সেইসব উপাদান নিয়েই গঠিত হবে এটাই স্বাভাবিক। আলোচনার সুবিধার জন্য লোকসংস্কৃতির উপাদানকে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল,

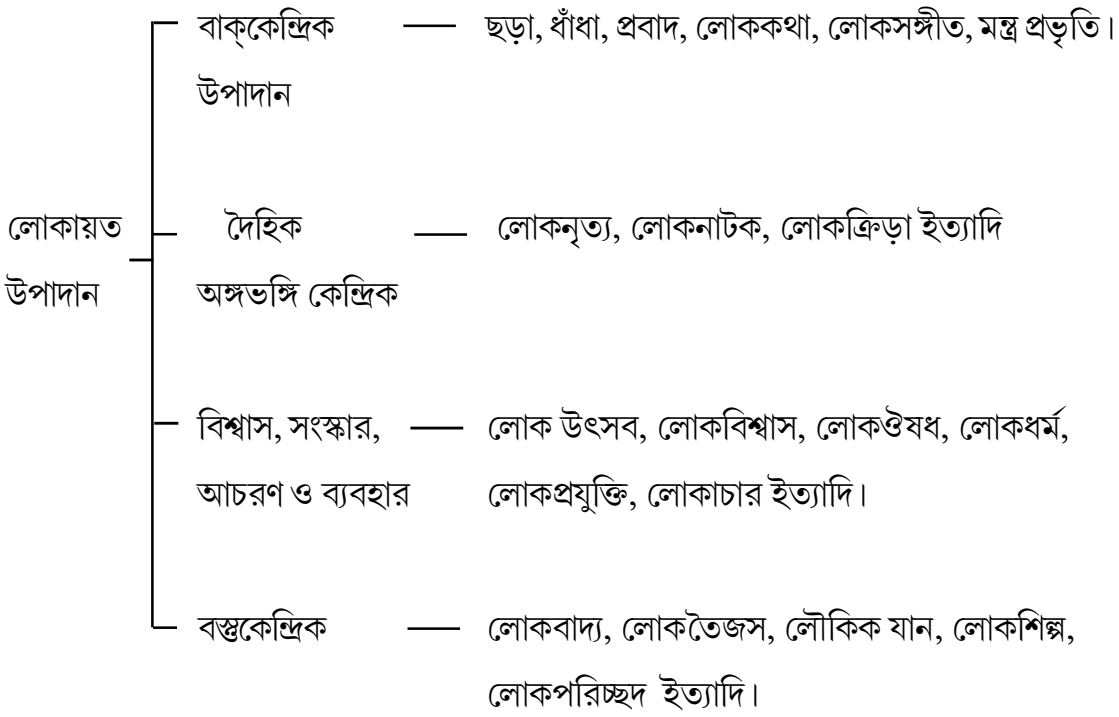

লোকায়ত উপাদান	বাক্‌কেন্দ্রিক উপাদান	——	ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, লোকসঙ্গীত, মন্ত্র প্রভৃতি।
	দৈহিক অঙ্গভঙ্গি কেন্দ্রিক	——	লোকনৃত্য, লোকনাটক, লোকক্রিড়া ইত্যাদি
	বিশ্বাস, সংস্কার, আচরণ ও ব্যবহার	——	লোক উৎসব, লোকবিশ্বাস, লোকঔষধ, লোকধর্ম, লোকপ্রযুক্তি, লোকাচার ইত্যাদি।
	বস্তুকেন্দ্রিক	——	লোকবাদ্য, লোকতৈজস, লৌকিক যান, লোকশিল্প, লোকপরিচ্ছদ ইত্যাদি।

এর বাইরেও হয়তো অনেক উপাদান থেকে গেল। তবে বেশির ভাগ উপাদানই মূলত এই চার পর্যায়ের অন্তর্গত। এই চার পর্যায়ের মধ্যে একমাত্র বাক্‌কেন্দ্রিক উপাদানের মধ্যে আমরা আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

আমরা জানি যে পুরাণে বিষ্ণু পালন কর্তা, ব্রহ্মা ছিলেন সৃষ্টি কর্তা এবং মহাদেব ছিলেন সংহারের দেবতা। কিন্তু তার পূর্বে বৈদিক যুগে শিব ভয়ঙ্কর, রুদ্রদেবতা নামেই পরিচিত। এই সময়েই তাঁর নটরাজের পরিচয় পাই। অর্থাৎ সূচনাকাল থেকে যে শিবকে আমরা পাই, সেই শিব হলেন সর্বশক্তিমান পরমপুরুষ। আর এই পরম পুরুষ দেবতা লোকায়ত সমাজে যেভাবে অবস্থান করেন তাতে সে যেন একেবারেই বৈদিক যুগেরই বিপরীত চরিত্র। কিন্তু কেন তিনি এরকম হলেন? এ প্রশ্ন আমাদের বারবার মনে জাগে। উত্তরে বলা যায় যে ‘আর্য-অনার্যের সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে বৈদিক যুগের পর থেকেই এবং সংহারক রূপ বর্জিত হয়ে জনমানসের সংখ্যা গরিষ্ঠতার মধ্যে নিজের স্থান করে নিলেন, আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে।’[১] একারণেই লোকসাহিত্য ধারায় প্রায় প্রতিটি উপাদানেই ‘শিব’ প্রসঙ্গ উঠে আসে। আসলে লোকসমাজে দেখা যায় চরিত্রগুলির সঙ্গে শিব যেন একাকার হয়ে গেছেন, শিবের ব্যক্তিগত জীবনাচারণ আর জনমানসের জীবনাচারণ যেন এখানে মিলে গেছে। যা লোককবিদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। সেখানে শিবের দেবত্বের জায়গা থেকে তার লোকায়ত চরিত্রেরই বেশি প্রকাশ ঘটেছে। বিভিন্ন লোকায়ত উপাদানের মাধ্যমে আমরা শিবের এই লোকায়ত দিকগুলি নির্দেশ করার চেষ্টা করতে পারি।

ক. প্রবাদে শিব

লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে 'প্রবাদ' একটি বলিষ্ঠ উপাদান। কেননা এটি যেমন খুব সহজ-সরল, সংক্ষিপ্ত অন্যদিকে তেমনি খুবই বাস্তব। এই প্রবাদের মধ্য দিয়েই যেন সব কিছু বলা সম্ভব। একারণেই হয়তো প্রবাদ সম্পর্কে বলা হয় 'A proverb is a short sentence based on a long experience' অর্থাৎ দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রকাশ করাই হল প্রবাদ। সমাজ অভিজ্ঞতার ফসল যেহেতু প্রবাদ, তাই এর সত্যতা বিচার করতে হবে সামাজিক তথা ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, কখনোই তা গাণিতিক সত্যতার মধ্য দিয়ে বিচার করা যাবে না। আসলে প্রত্যেকটি প্রবাদের অন্তরালে যেন জীবন্ত মানুষেরই কণ্ঠস্বর শোনা যায়। তাই এর মধ্য দিয়ে যে চিত্র আমরা পাব তা একদিকে যেমন বাস্তব তেমনি অন্যদিকে তা প্রত্যক্ষ। তবে প্রবাদ কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে বলা হয়ে থাকে। পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই তা ব্যক্ত করা হয়। তবে লোককবিরা মূলত এই প্রবাদের মধ্য দিয়ে একটা উপদেশ, ন্যায়-অন্যায়, উচিৎ-অনুচিৎ, সাবধান বাণী প্রভৃতি বিষয়কে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেন। পাশাপাশি একথাও মনে হয়, প্রবাদ যখন সৃষ্টি হয় তখন হয়তো লোককবিরা এত কথা মাথায় রাখেন না। তাদের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা একটি খণ্ডবাক্যের মধ্য দিয়ে বিষয় অনুযায়ী ব্যক্ত করেন মাত্র। তারপর সেই প্রবাদই কালপরম্পরায় বহমান হয়। প্রবাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে চূড়ামণি হাটি বলেছেন—''সংক্ষিপ্ত ও সরস ভঙ্গিতে বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যদানে প্রবাদ লোকসাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। ব্যঞ্জনা ও ভাষার ঐতিহ্যে প্রবাদের যেমন গুরুত্ব ঠিক ততটাই গুরুত্ব পেয়ে থাকে তার তথ্য।''[২]

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে জানা গেছে যে, বিশেষ কোনো বৈঠকী আলোচনায় গল্প-গুজবের সময় কথা প্রসঙ্গে মাঝে মধ্যেই কিছু প্রবাদ বেরিয়ে আসে। এভাবে প্রতিনিয়ত প্রবাদের আবির্ভাব হয়। যা হয়তো শেষ পর্যন্ত একটি প্রবাদের লড়াই হয়ে যায়। বৈঠকী আলোচনায় এই প্রবাদ মূলত মূল আলোচনাকে আরো সরস করে করার জন্য আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। এক্ষেত্রে যেন তাদের পাণ্ডিত্য প্রকাশের কোনো অবকাশ থাকে না। তাই লোকসমাজ কথায় কথায় আপন বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে পৌরাণিক দেবতা শিবকে নিয়ে আসে। নিচে শিব সম্পর্কিত এরকমই কিছু প্রবাদের আলোচনা করা হল—

১. ডুবি ডুবি জল খাবু ভাবিছিস শিবের বাপও টের পাবে না।

অত্যন্ত চতুর লোকের ক্ষেত্রে এধরণের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। এধরণের প্রবাদ স্থানীয় রাজবংশী ভাষায় গোটা উত্তরবঙ্গেই প্রায় প্রচলিত। কোনো চতুর লোক যখন একান্তে গোপনে

নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করতে চায়, অথচ দু একজন লোক যখন তা জেনে ফেলে তখনই এই ধরণের প্রবাদ বলে তাকে ব্যঙ্গ করা হয়।

২. নিজে না পাইস্ শংকরক ডাকাইস।

উদার মানুষের ক্ষেত্রে এই প্রবাদ প্রযোজ্য। নিজেই কিছু করতে পারে না সে আবার অন্যকে পথ দেখায় — অর্থাৎ 'নিজের ভাগ্য অনিশ্চিত জেনেও অন্যকে পথ দেখায়'-- এই অর্থেই এ ধরণের প্রবাদের ব্যবহার কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় বেশি দেখা যায়।

৩. কাউয়ার মুখত শিবের নাম।

অধার্মিক লোকেরা ধর্মের কথা বললে এ ধরণের প্রবাদ বলা হয়। অধার্মিক লোককে এখানে 'কাকের' সঙ্গে এবং 'ধর্ম' কে শিবের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

৪. ধান ভানতে শিবের গীত।

এটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত একটি প্রবাদ। মূলত সম্পূর্ণ বঙ্গেই এই প্রবাদ প্রচলিত। প্রাসঙ্গিক বিষয় আলোচনার সময় অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করা হলে এই ধরণের প্রবাদ ব্যক্ত করা হয়।

৫. শিব পূজায় শাঁখ বাজে না ষষ্ঠি পূজায় ঢোল।

প্রয়োজনের সময় আয়োজন না করে অপ্রয়োজনে বেশি আয়োজন করলে এই ধরণের প্রবাদ বলা হয়।

৬. ভাগীর জল শিবও না পায়।

পারিবারিক কলহ বাঙালীর প্রায় নিত্যদিনের সঙ্গী, সেই কলহের শিকার শুধু সেই পরিবারের মানুষেরাই নয়, তাদের নিত্যদিনের পূজার দেবতাও তার শিকার। কেননা যে পরিবারে অনেক লোকজন বাস করে, সেখানে পারস্পরিক হিংসা এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে যার ফলস্বরূপ সেই বাড়িতেই ন্যূনতম পূজা-অর্চনাও বন্ধ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে এই প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

৭. যতই কর শিব সাধনা,

কলঙ্কিনী নাম যাবে না।

একবার কোনো অপবাদ প্রচার হয়ে গেলে শত চেষ্টাতেও আর সেই অপবাদ দূর করা যাবে না। এমন অর্থেই উদ্দীষ্ট ব্যক্তির প্রসঙ্গে এই ধরণের প্রবাদ বলা হয়।

৮. দশে পূজলে পাথরও শিব হয়।

সকলে সমাদর করলে নিকৃষ্ট জিনিসও উৎকৃষ্ট হয়, এমন অর্থেই এ ধরণের প্রবাদের প্রচলন দেখা যায়। এর সমধর্মী একটি বাংলা প্রবাদও দেখা যায় —

''দশে মিলে করি কাজ।

হারি জিতি নাহি লাজ।।''

আসলে কোনো কাজকে যখন সমাজ মেনে নেয় তখন সেটা সম্মান পায়। আর যদি তা সমাজ মেনে না নেয় তবে সেই কাজের মতো লজ্জা আর থাকে না।

৯. ভরা গাজনে ঢাক ছেড়া।

'গাজন' মূলত একটি শিবকেন্দ্রিক উৎসব, এ কারণে এই প্রবাদকে গ্রহণ করা হয়েছে। মূল কাজ যখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যা প্রায় আর অল্প কিছু সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে, এমন সময় খুব সামান্য কারণে মূল কাজটাই পণ্ড হয়ে যায়— এরকম যে কোনো পরিস্থিতিতে এই ধরণের প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়।

১০. কামরূপেতে কাক মরেছে

কৈলাসতে হাহাকার।

এটি কোচবিহার জেলার প্রচলিত একটি প্রবাদ। এখানেও প্রত্যক্ষভাবে শিবের উল্লেখ নেই। তবে শিবের বাসস্থান কৈলাসের প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপন করা হয়েছে। কোচবিহার সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বৃহৎ অংশ একদা কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। এক স্থানের প্রসঙ্গ অন্য স্থানে ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রবাদের ব্যবহার দেখা যায়। এখানে কামরূপে কাক মারা গেলে সেখানে তার প্রভাব নেই। প্রভাব পড়েছে কৈলাসে। যদিও আক্ষরিক অর্থে কামরূপ ও কৈলাসের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই। এধরণের ঘটনা যেন আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী, যা লোককবিরা তাদের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন।

১১. গাজনের নাই ঠিকানা

তবে খালি ঢাকের বাজনা।

এটিও শিব সম্পর্কিত প্রবাদ। মূল কাজে লক্ষ্য না রেখে আনুষঙ্গিক কাজে সময় ব্যয় করা প্রসঙ্গে এ ধরণের প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

১২. মড়া কাকের আবার চড়কের ভয়।

আমরা জানি শিবের গাজনকে উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে চড়ক উৎসব বলা হয়। এই চড়কে একজনের পিঠে বাণ ফোড়ানো হয়। যাকে এই বাণ ফোড়ানো হয়, তার সাময়িকভাবে কোনো ভয় ডর থাকে না। অর্থাৎ যার সর্বনাশ হয়ে গেছে তার আবার বিপদের ভয় কি? এমন অবস্থায় উদ্দীষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে এরকম প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

১৩. চড়কে ঢাকের কাঠি পড়লে চড়ক সন্ন্যাসীর পিঠ চুলকায়।

একটি ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনার যোগসূত্র বোঝাতে গিয়ে এরকম প্রবাদ ব্যবহৃত হয়।

১৪. শিবের সঙ্গে খোঁজ নাই, খালি গাজনের ঘটা ভারি।

অর্থাৎ মূল কাজে মনোযোগ না দিয়ে কেবল আয়োজনের দ্বারা সরগরম করে রাখা -- এমন অবস্থায় এই ধরণের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

১৫. তিন সন্ধ্যা খায়া নারী

তবে সেনে পোজে শঙ্করী।

এখানে শিবের স্ত্রী পার্বতীর কথা বলা হয়েছে। হিন্দু মতে যে কোনো পূজা দেবার আগে পূজারীকে উপোস থাকতে হয়। যদি সে উপোস থাকতে না পারে, তবে কোনো পূজাই সম্পন্ন হয় না। এখানেও পেটুক , তথা খাদ্য রসিকের পূজা দেবার প্রসঙ্গ এধরণের প্রবাদের ব্যবহারে স্পষ্ট হয়।

১৬. সাত ভাউজি নিকায় ঘর

দুয়ারত থোয় ত্যানা

সাকালে উটিয়া কয়

শঙ্করী মাগীর কাথা।

অথবা

সাত ভাউজি ভানে বাড়া

দুয়োরত ফেলায় তুষ

সাকালে উঠিয়া কয়

শঙ্করী মাগীর দোষ।

এটি মূলত কোচবিহার জেলার প্রচলিত একটি প্রবাদ। একান্নবর্তী পরিবারের দাম্পত্য কলহের চিত্র এটি। আমরা জানি শিবের সংসারও ছিল কলহে পূর্ণ। স্বয়ং শিব ছিলেন বহু পত্নীর স্বামী। ফলে স্ত্রীরা যে কোনো কাজে একে অপরকে দোষারোপ করতো। যা উত্তরবঙ্গের প্রায় প্রতিটি ঘরের চিত্র। এখানে সেইসব সংসারের সঙ্গে শিবের সংসারের যেন যোগসূত্র আনা হয়েছে উল্লিখিত প্রবাদের মধ্য দিয়ে।

১৭. মটরের নাই দাম

শিবের কি কাম।

সমাজে যে কোনো ভালো কিংবা খারাপ জিনিসের দায় যেন শিবের উপর। বিশেষ করে মানুষ কোনো কাজে ব্যর্থ হলে তার দায় গিয়েও পড়বে শিবের উপর ।

১৮. শিব গড়তে বানর গড়া।

অর্থাৎ একটি কাজ করতে গিয়ে সেটা শেষ না করে অন্য কাজের সূচনা করা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। পরে কোনো কাজই এরা শেষ করতে পারে না, মানুষের এরকম ব্যবহারও লোককবিদের নজর এড়ায়নি। তখন তারা এধরণের প্রবাদ বলে থাকেন।

১৯. সকল ব্রতী করলো যোশী

বাকি আছে শিব চতুর্দশী।

সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা নিজেদের কাজটুকু জানে বলে তাদের অহংকারের সীমা থাকে না। সেই অহংকারের বিদ্বেষবশত অভিজ্ঞ লোকমানস এধরণের প্রবাদ ব্যবহার করেন।

২০. করে না মনসা পূজা

এক্কেবারে শিবের ঘটা।

সহজ সরল কাজে মনোনিবেশ না করে অত্যন্ত জটিল কাজে হাত দেওয়া অর্থেই এই ধরণের প্রবাদের ব্যবহার নজরে আসে। এও যেন মনুষ্য স্বভাব। সেই স্বাভাবিক স্বভাবের প্রতিই এখানে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা হয়েছে।

২১. কাজীর কাছে শিব রাত্রি।

ভিন্ন মতাবলম্বীর কাছে নিজের মতের প্রসংশা পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে তর্কটাই বাড়াবার সম্ভাবনা থাকে। এই প্রবাদের মধ্য দিয়ে সাবধান বাণী দেওয়া হয়েছে।

২২. লক্ষ্মী হইল ভিটা ছাড়া, শঙ্কর হইল ভিখারী।

শিবের আর এক নাম শঙ্কর। কেউ উপকার করতে চাইলে, সেই উপকার গ্রহণ না করে তা উপেক্ষা করলে এরকম প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

২৩. আকন্দে যদি মধু পাই

তবে কেনে কৈলাসেতে যাই।

সহজ লভ্য বস্তু পেতে দুর্গম স্থানে যাবার প্রয়োজন হয় না। প্রথমে সহজ ভাবেই তার চেষ্টা করা প্রয়োজন। না পেলে ধীরে ধীরে দুর্গম স্থানে যেতে হয়।

২৪. বৈদ্যে বাঁচায় প্রাণ

শিবের বাড়ে মান।

একজন কাজ করে অন্যজন ফল ভোগ করে, এমন অর্থেই এই ধরণের প্রবাদের ব্যবহার।

২৫. শিবের উপুরা ভরসা করি

না পুজিলুং বিষহরি।

সকলকে মান্যতা দিয়ে চললে বিপদ হবার সম্ভাবনা কম।

২৬. শিবের দুয়োরত কুড়িয়ার থান।

দেবস্থানে অলস ব্যক্তিদের বিনা কাজে আড্ডা বোঝাতে এরকম প্রবাদ ব্যবহার করা হয়।

২৭. শিব ঠাকুর কলা না পায়

ছোবচুন্নির ছিন্নি।

অর্থাৎ সমাজে অধিক সম্মানীয় ব্যক্তিদের থেকে কম সম্মানীয় ব্যক্তিদের বেশি আপ্যায়ন করা হলে এমন মন্তব্য করা হয়।

খ. ধাঁধায় শিব

লোকসাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে ধাঁধাকে ধরা হয়। প্রশ্ন এবং উত্তরের আকারেই ধাঁধার কায়া গঠিত হয়। ফলে ধাঁধার মধ্যে সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তার 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' এ ধাঁধার অর্থ দিতে গিয়ে বলেছেন যে ধাঁধা হল কৌতুককর কুট প্রশ্ন বা হেয়ালী। পল্লীর অতিসাধারণ মানুষের লোকশিক্ষার একটি উপায় হল ধাঁধা। ধাঁধার মধ্যে সঞ্চিত থাকে প্রতিদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা। আর সেই অভিজ্ঞতা পল্লীগ্রামের সাধারণ মানুষেরা প্রশ্নের আকারে নির্মাণ করে থাকেন।' ধাঁধায় যে প্রশ্ন করা হয় তা মূলত রূপকের আশ্রয়েই করা হয়। তাই উত্তরটি যদি আগে থেকে জানা না থাকে তবে খুব তাড়াতাড়ি এর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। যদিও ধাঁধার মধ্যেই তার দু-একটি ইঙ্গিত দেওয়া থাকে। এই ইঙ্গিতকে সূত্র হিসেবে ধরে নিয়েই ধাঁধার উত্তর দিতে হয়। এর জন্য প্রশ্ন কর্তা এবং উত্তরদাতাকে তীব্র বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হয়। আসলে ধাঁধা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্যই অনেক সময় আমাদের চেনা জগৎকে অপরিচিত করে তোলে। ওয়াকিল আহমেদ তাঁর 'বাংলা লোকসাহিত্য ঃ ধাঁধা' গ্রন্থে জেমস এ কেলসো (James A Kelso)-এর ধাঁধা সম্পর্কিত একটি মতকে তুলে ধরেছেন— "A genuine folk riddle is a spontaneous expression coming from the depths of the soul of a pepole or a race. Riddles are, therefore in a real sense the vox populi."[৩] অর্থাৎ ধাঁধা হল স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ । যা একটি গোষ্ঠীর অতলে অবস্থিত তার ইতিহাসকে পুনরুত্থান করতে পারে। এসব কারণেই ধাঁধাকে তিনি সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর বলেছেন।

ধাঁধার যে বৈশিষ্ট্যগুলি রয়েছে সেগুলি নিচে সূত্রাকারে আলোচনা করা হল—

১. ধাঁধার মধ্যে একটি পরিণত শিল্প ও রসবোধ ও সূক্ষ্ম চিন্তার প্রকাশ থাকে, যা উন্নত

লোকসমাজ থেকে সৃষ্টি, আদিম সমাজ থেকে নয়।

২. লৌকিক ধাঁধা জনশ্রুতিমূলক। এদের উত্তরও জনশ্রুতি মূলক। ব্যক্তিগত বুদ্ধির দ্বারা এদের মীমাংসা সম্ভব নয়।

৩. ধাঁধা কখনোই এককভাবে উপভোগ্য হতে পারে না। এর মধ্যে একজন প্রশ্নকর্তা ও একজন উত্তরদাতা থাকেন।

৪. ধাঁধার মধ্যে রূপকের ব্যবহার থাকে।

৫. ধাঁধার মধ্যে দুটি মূল উপাদান থাকে, একটি হ্যাঁ বাচক (Positive) এবং একটি না বাচক (Negetive)

৬. ধাঁধার মধ্যে সম্বোধন ও আক্রমণাত্মক ভঙ্গি থাকে। আক্রমণাত্মক ভঙ্গি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ দুইই হতে পারে।

৭. ধাঁধার লক্ষ্য হাস্যরসও হতে পারে, আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে বুদ্ধির অনুশীলন বা জ্ঞানের চর্চা এর চরম লক্ষ্য নয়, নির্মল হাস্যরস সৃষ্টিই এর চরম লক্ষ্য।

৮. ধাঁধার মাধ্যমে আঞ্চলিকতার পরিবর্তে জাতীয় বিশেষত্ব প্রকাশ পায়। বিভিন্ন জাতীয় সংস্কৃতির বাহনই হল ধাঁধা।

৯. ধাঁধা গদ্য বা পদ্য উভয়ভাবেই তৈরি হতে পারে।

ধাঁধা লোকসাহিত্যের প্রধান ও প্রাচীনতম অঙ্গ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই উপাদান আজও সমানভাবে বংশপরম্পরায় বহমান হয়ে ঐতিহ্য বহন করে চলছে। সমগ্র বাংলায় অবিমিশ্রভাবে এই শাখার সমানভাবে চর্চা হয়ে চলছে। তাই বঙ্গের সর্বত্র এর নাম এক নয়, স্থানভেদে এর নাম বিভিন্ন রকম হয়ে থকে। নিচে ধাঁধার সমনামগুলি একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হল[৪]—

সমনাম	**মূল শব্দ**	**স্থান**
কথা	কথা	ময়মনসিংহ
কিচ্ছা / কেচ্ছা	কিস্‌সা (আরবী শব্দ)	দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ)
ছোল্লক	শ্লোক	দিনাজপুর (উত্তর ও দক্ষিণ)
দস্তান	দাস্তান (ফারসী)	চট্টগ্রাম
দিঠান	দৃষ্টান্ত	সিলেট
পঁই	প্রশ্ন	সিলেট
পিলিকা	প্রহেলিকা	নোয়াখালি
ফড়ই/ফরই		মেদিনীপুর

সমনাম	মূল শব্দ	স্থান
ফষ্টি	পরিহাস	মুর্শিদাবাদ
মান		চলন বিল (রাজশাহী)
শিমাসা	সমস্যা	সিলেট
ছোল্লক/ ছিল্লুক	শ্লোক	কোচবিহার
হেয়ালি	প্রহেলিকা	জলপাইগুড়ি

এইসব সমনাম বাদ দিয়েও অন্যত্র হয়তো আরও নাম পাওয়া যায়।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে এরকম এক তীক্ষ্ণ বুদ্দিদীপ্ত বিষয় গ্রামের নিরক্ষর মানুষের মাথায় এল কি করে? উপরন্তু আবার শিবের মতো একজন সর্বকালীন দেবতার সেখানে ঠাঁই বা হল কি করে? উত্তরে প্রথমেই বলতে হল গ্রামের নিরক্ষর মানুষ মানেই কিন্তু অশিক্ষিত মানুষ নয়। শুধু পুথিগত বিদ্যাতেই শিক্ষিত হওয়া যায় না, তার জন্য চাই বাস্তব জ্ঞান। গ্রামের এইসব মানুষদের রয়েছে এই বাস্তব জ্ঞান। বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ বাদ দিয়েও চোখ কান খোলা রেখে বাইরের সমাজ থেকেও অনেক কিছু শেখা যায়। পুথিগত বিদ্যার সঙ্গে এই শিক্ষাই হল স্বশিক্ষা। লোকসাহিত্যের রচয়িতারা এভাবেই গ্রামের বিভিন্ন আসর, যাত্রাগান, চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নানান পৌরাণিক, লৌকিক ও অন্যান্য কাহিনী শুনতো এবং এখান থেকেই পৌরাণিক বিভিন্ন চরিত্র, দেবদেবী সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা তৈরি হত। পরে সেইসব কাহিনীর সঙ্গে, সেইসব চরিত্রের সঙ্গে বাস্তব চরিত্রের সামঞ্জস্য রেখে একএকটি ধাঁধা তৈরি করতেন। অবশ্য এইসব ধাঁধা কোনো পরিকল্পনা করে তৈরি হত না। নিজের মনে অজান্তেই তা তৈরি হত। আমরা জানি এক-একটি বিশেষ অঞ্চলে এক-একটি দেবদেবী মহাসমারোহে পূজিত হয়। স্বাভাবিকভাবে সেই দেব-দেবীর প্রভাব সেখানে পড়বে এবং এই প্রভাবের ফলেই সেই দেবদেবীকে নিয়ে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথাও তৈরি হবে যা লোকশ্রুতি হিসেবে সেই সমাজে প্রচলিত থাকবে, যার মধ্যে দেবতার মাহাত্ম্য নিহিত থাকবে। এভাবেই তা ধীরে ধীরে আঞ্চলিকতার সীমা অতিক্রম করবে। উত্তরবঙ্গের শিবও এরকমই একজন প্রভাবশালী দেবতা। ফলে তাঁকে কেন্দ্র করেও লোকমানস নানানভাবে চর্চা করে। একারণে পৌরাণিক শিব তাঁর মাহাত্ম্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ করে এতদঞ্চলের মানুষের সঙ্গী হয়ে পড়েন। অর্থাৎ এভাবে শিবও একদিন তাঁদের হাতে পড়ে স্বর্গভূমি থেকে মর্ত্যপৃথিবীতে চলে এলেন। এবং এতদঞ্চলের মানুষের সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে যান। একারণেই প্রবাদের মধ্যেও যেমন কথায় কথায় শিব প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন তেমনি ধাঁধাতেও শিব প্রসঙ্গ বারবার করে চলে আসে। বিশেষ করে শিবের গাজন উৎসবে প্রচলিত ধাঁধাগুলি সেই সাক্ষীই

বহন করে। আসলে শিবের গাজন হল কৃষিকেন্দ্রিক লোকউৎসব যা শস্য ও উর্বরতার প্রতীক। অধিক শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যেই গাজন উৎসব করা হয়। পূর্বেও আলোচনা করে দেখানো হয়েছে যে এটি মূলত প্রতীকপূজা। মাটিতে যে চড়ক গাছ পোঁতা হয় তা শিবলিঙ্গের প্রতীক, মাটি হল পার্বতীর জননাঙ্গের প্রতীক। নিচে উত্তরবঙ্গের কিছু প্রচলিত ধাঁধার নমুনা দেওয়া হল, যেখানে এই শিব প্রসঙ্গ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১. ''তিন ভিতি তিন তাল
মধ্যে আছে মহাকাল
মহাকালে ডিম পারলে
কেহ গোনাইতেনাহি পারে''

(উত্তর ঃ উনুনের মধ্যে হাঁড়িতে ভাত ফুটছে, সেখানে কত ভাত আছে তা কেউ গুনতে পারে না।)

-- প্রসঙ্গত এখানে বলা প্রয়োজন যে উত্তরবঙ্গে শিব মহাকাল নামে পরিচিত।

২. ''কালাও নোয়াও কালীও নোয়ায়
নোয়ায় শঙ্করী
স্বামীর মস্তকে পাও দিয়া
আছে কোন নারী।''

(উত্তর ঃ তুলসী।)

শঙ্করী হলেন শঙ্করের স্ত্রী। আর শঙ্কর হলেন স্বয়ং শিব। শিবের স্ত্রীর কথা প্রত্যক্ষভাবে থাকলেও পরক্ষে এই ধাঁধায় শিবের কথাই বলা হয়েছে।

৩. ''জলে (অকালে) হারাচি শিব ঠাকুর
রাস্তাত হারাচি ভাই
নাই উপজিতে মাও হারাচি
তারে উদ্দেশ্যে যাই।''

(উত্তর ঃ কচ্ছপ/দুরা)

৪. ''জন্মকালে রক্ত বর্ণ
চকু সারি সারি
কৈলাসের শিব নোমায়
কিন্তুক জটাধারী

মাছ নোমায় মসং নোমায়
সর্বলোকে খায়
ওটা কোন জিনিস কনতো বায়।''

(উত্তর ঃ আনারস)

এরকম আর একটি ধাঁধার সন্ধান অন্যত্র পাওয়া যায়। প্রথমটি কোচবিহার ও দ্বিতীয়টি মালদা জেলায় পাওয়া যায়।

৫. ''নাল নীল রক্ত বরণ
চকু সারি সারি
রাম নোমায় শিব নোমায়
মাথাত জটাধারী।''

(উত্তর ঃ আনারস)

৬. ''বাপে নাই জন্ম দিলেক, জন্ম দিল পরে
জন্মের সময় ছাওয়ার মাও না আছিল ঘরে।''

উত্তর ঃ কুশ (রামায়ণ)অথবা পুরাণ মতে শিব।

এখানেও নেপথ্যে শিবের কথাই বলা হয়েছে। মনসার যখন জন্ম হয়েছিল তখন তার মা ঘরে ছিল না। পুরাণ ও বিভিন্ন মঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায় শিবের বীর্য পদ্ম পাতা বেয়ে পাতালে প্রবেশ করে। এবং সেখান থেকেই মনসার জন্ম হয়। এই প্রসঙ্গকে সামনে রেখেই এরকম ধাঁধার আবির্ভাব। সমধর্মী আর একটি ধাঁধা উল্লেখ করা হলো--

৭. ''জন্ম দিল না জন্মদাতা, জন্ম দিল হরে।
যখন মনসার জন্ম হইল মা ছিল না ঘরে।।''

(উত্তর ঃ ডিম ফুটে মুরগীর বাচ্চা হওয়া)

এখানেও হর হল শিব। পূর্বোক্ত ধাঁধার সঙ্গে এর মিল রয়েছে।

৮. ''যোগী নোমায় শিব (সন্ন্যাসী) নোমায়
মাথায় হুতাশন
ছাওয়া নোমায় পোয়া নোমায়
ডাকে ঘন ঘন
চোর নোমায় ডাকাত নোমায়
বর্শা মারে বুকত

বেটা নোমায় বেটি নোমায়
বসিয়া থাকে মুখত।''

(উত্তর ঃ হুকা)

৯. ''জলে তার জন্ম, কারিগরে গড়ে
শিব নয়, শঙ্করী নয়, মাথার উপর চড়ে।''

(উত্তর ঃ মুকুট/শোলার মুকুট)

১০. ''শিব নয়, শিবানী নয় জন্ম তার চামে
স্বগগের দিকে মুখ করে থাকে, পা দিই তার গালে।''

(উত্তর ঃ জুতা)

১১. ''উপর হাতে পড়িল লাটিম ভূঁইত আগুন জ্বলে
হামার শিব যে পাকে যায় সেপাকে যোগাড় পড়ে।''

(উত্তর ঃ ভূমিকম্প)

১২. ''আগে ধারটি শিব মূর্তি পেছনে গৌর-নিতাই।
তিলক ছাপটি নিয়ে প্রভু দেশে দেশে যাই।।''

(উত্তর ঃ পোষ্ট কার্ড)

১৩. ''বক বসে সারে সারে শিব করে তপ
এ শ্লোক যে না পারবে, ছবুড়ি তার বাপ।''

(উত্তর ঃ কুমুদ ফুল)

১৪. ''এক বৃক্ষের দুই মূল ছ'মাস অন্তর ধরে ফুল
মহাদেব আগে, সেই ফুল কৃষ্ণপূজায় লাগে।''

(উত্তর ঃ অর্শফুল)

১৫. ''উপরে পাটি নিচে পাটি পাটি ঝন ঝন করে।
কৈলাসতে আগুন নাগিলে কেউ না নিবাতে পারে।''

(উত্তর ঃ কৈলাস বলতে এখানে উচু দুর্গম রহস্যময় কাল্পনিক স্থানকে বোঝানো হয়েছে)

১৬. ''সাড়া পৃথিবী নড়ে, মহাদেবের আসন ধরে
গার মাংস খুলি খায় তবু রাও না করে।'' (পোয়ালের পুঁজি)

১৭. ''আগায় খস খস গোড়ায় মৌ
যে না বলতে পারে সে শিবঠাকুরের বৌ।''

(উত্তর ঃ আখ)

গ. লোকসঙ্গীত শিব

লোকসঙ্গীত পরিবেশিত হয় স্বতঃস্ফূর্তভাবে। শ্রুতিই যার মাধ্যম এবং স্মৃতিই যার সংরক্ষক। আর মুখোচ্চারিত ধ্বনি বা শব্দই হল সঙ্গীতের প্রাণ। এর মধ্য দিয়েই সঙ্গীতের ভিত্তি স্থাপিত হয়। পরে তার উপর আবেগ ও অনুভূতি বর্ষিত হয়ে সুরের মাধ্যমে তা ব্যক্ত হয়। এই লোকসঙ্গীতের ধারা হল মৌখিক, যা বংশ পরম্পরায় বহমান। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে একটি মাত্র ভাবকে অবলম্বন করে গীত হবার উদ্দেশ্যে যা রচিত তাই হল লোকসঙ্গীত। অর্থাৎ লোকজীবনের গানই হল লোকসঙ্গীত। এই প্রসঙ্গে Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend (সংক্ষেপে SDFML) গ্রন্থে George Herzog বলেছেন — "Folk song are best defined as songs which are current in the repertory of a folk group, the study of their origine is another matter."[৫]

লোকসঙ্গীতের ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহার ভিন্নতর তাৎপর্য বহন করে। এক্ষেত্রে ছন্দ অলঙ্কার ব্যবহারের বিশেষ কোনো নিয়ম নেই। উদাহরণস্বরূপ উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতের কথা বলা যেতে পারে। এখানে এমন কিছু শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলি আলাদা করে তাদের বৃত্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। যেমন--- মাহুত বন্ধু, মৈশাল বন্ধু, গাড়িয়াল ভাই। এই তিনজনই যেন উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া গানের নায়ক। সমগ্র উত্তরবঙ্গে এই ভাওয়াইয়া এতটাই বিস্তৃত ও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে যে এই অঞ্চলের অন্যান্য লোকসঙ্গীতগুলিও এর সুরেই গাওয়া হয়। যেমন বিয়ের গান, বিভিন্ন ব্রত কথার গান ইত্যাদি। এগুলি মূলত চটকা ও দরিয়া সুরেই গাওয়া হয়।

এধরণের সঙ্গীতের উৎপত্তির কথা বলতে গিয়ে ড. সুখবিলাস বর্মা লিখেছেন -"আদিম মানুষ একত্রে জড়ো হয়ে নাচ ও গানের মাধ্যমে তাদের আনন্দ অনুভূতির প্রকাশ করেছে। সংগীত হল মনের আবেগ প্রকাশের প্রচীনতম মাধ্যম। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের সুন্দর সহজ সরল অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হত সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও কাহিনী গান করে শোনাতো, পাথরে পাথর দিয়ে, কাষ্ঠখণ্ডের উপর কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে অথবা কাষ্ঠ নির্মিত ঢাল প্রভৃতির উপর তীক্ষ্ণ পাথরের আঘাতের সাহায্যে তারা গানের বা নাচের ছন্দ রক্ষা করত।"[৬] এভাবেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। ধীরে ধীরে মানুষের যখন বিবর্তন ঘটতে লাগলো, মানুষ যখন উন্নত জীবে পরিণত হল, বাসস্থান, আগুন ও কৃষির ব্যবহার শিখে গেল তখন এই সংগীতের ক্ষেত্রও ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকলো। তৈরি হল শ্রম সঙ্গীত। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজায় (যে সমস্ত দেবদেবী একেবারে নিজস্ব, শাস্ত্রে যার উল্লেখ

নাই) আনন্দ বিনোদনের জন্য গীত গাওয়া হতে লাগলো। অবশ্য তা পরে শুধু আনন্দ বিনোদনেই থাকলো না। তা শেষ পর্যন্ত সেই দেবদেবীর মাহাত্ম্য সূচক গানে পরিণত হল। যেগুলো শাস্ত্রীয় সংগীতের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। সেই ধারা বংশ পরম্পরায় আজও বহমান। উত্তরবঙ্গের এরকম প্রত্যেকটি লোকায়ত পূজাতেই এই সঙ্গীতের ব্যবহার দেখা যায়। এখানে শিব সম্পর্কিত কিছু লৌকিক পূজায় ব্যবহৃত সে সমস্ত সঙ্গীতই তুলে ধরা হয়েছে। যেখানে শিব তাদের ঘরের মানুষ, ঘরের দেবতা হয়ে উঠেছে। নিচে এরকমই কিছু সঙ্গীতের ধারা আলোচনা করা হয়েছে।

দেল'এর গানে শিব প্রসঙ্গ

বাঙালীর কাছে শিব অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা। সমগ্র ভারতবর্ষেই শিব লিঙ্গরূপেই বেশি পরিচিত। প্রমাণস্বরূপ আমরা পশ্চিমবঙ্গের তথা উত্তরবঙ্গের অলিতে গলিতে এই শৈব মূর্তি অপেক্ষা লিঙ্গের প্রাধান্য বেশি দেখি। আসলে এই লিঙ্গপূজার মধ্যেই শিবের আদিম ইতিহাস নিহিত আছে। পুর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিব সৃজন শক্তি ভিত্তিক কৃষি দেবতা। জানা যায় আর্যরা এদেশের আসবার অনেক আগেই এদেশের লোক শিব পূজা করতো। তাইতো এই দেবতাকে কেন্দ্র করে সমগ্র উত্তরবঙ্গে লোকঐতিহ্য গড়ে উঠেছে। আর এ কারণেই সর্বত্রই শিবের আভাস পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গভূখণ্ডের মূল নিবাসী নমঃশূদ্র সমাজও কিন্তু এর ব্যাতিক্রম নয়। তাদের নানান উৎসবেও এই শিব একাত্ম হয়ে উঠেছে। যার পরিচয় পাই আমরা দেল উৎসবের মধ্যে।

দেল উৎসব মূলত নমঃশূদ্র সমাজের এক বলিষ্ঠ ও ঐতিহ্যবাহী লৌকিক ধর্মানুষ্ঠান। এই উৎসবকে গাজন বা নীল পূজাও বলা হয়ে থাকে। পূর্বেই আমরা এই গাজন সম্পর্কে বলেছি। আসলে এই উৎসবের প্রধান লক্ষ্য শিবের বন্দনা। যার মধ্য দিয়ে শিবের দাম্পত্য সম্পর্কের কথা বলা হয়। এখানে শিবকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নামিয়ে আনা হয়েছে। আসলে শিবের মাধ্যমে নমঃশূদ্র সমাজের জীবন যাপনের চিত্রই এর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। নীল পাটকেই নমঃশূদ্র সমাজ দেল বলে থাকে। আবার তাকে অনেক সময় গৌরীপাটও বলা হয়। আর দেলের উৎসব সাধারণত সিন্দুর লিপ্ত কাঠের নির্মিত পাটকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এই দেলকে কেন্দ্র করে কয়েকজন সন্ন্যাসী নিযুক্ত হয়। সন্ন্যাসী সাধারণত গ্রামের ছেলেদের মধ্য থেকেই নির্বাচন করা হয়। তারা চৈত্র সংক্রান্তির আগে, যেদিন থেকে দেলকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরা হয়, তখন থেকে তারা নিরামিষ আহার করে থাকেন। এদের সকলের পরনেই লাল শালু থাকে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে এরা যে মাগন সংগ্রহ করে তাই দিয়ে মূল অনুষ্ঠান পর্ব শেষ করতে হয়। লক্ষণীয় এই সময় এরা হর -গৌরী বিষয়ক নানান গান পরিবেশন করে। যেসব গানকে দেলের গান বলা হয়। এই রকম গানের

পাশাপাশি এরা হর-গৌরীর সঙ সেজে গ্রাম থেকে মাগন সংগ্রহ করে। তবে শুধু হর-গৌরী বিষয়ক গানই নয়, পাশপাশি বিভিন্ন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, সমসাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করেও এরা গান রচনা করে থাকেন। প্রত্যেকটি গানই আখ্যানধর্মী। যেমন হর-গৌরী বিষয়ক আখ্যানে গৌরীর শাখা পরা, শিবের বিবাহ প্রভৃতি বিষয় ফুটে ওঠে। নিচে এরকমই একটি গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল —

গৌরীর শাখা পরা

‘‘দেবের দেব মহাদেব কৈলাস পর্বতে।
দুর্গা বিনে ব্যকুলিত হচ্ছে ভোলানাথে।।
যে দেশে গিয়াছে গৌরী যাব সেই দেশে।
ভজিব পার্বতীর মন শাঁখারির বেশে ।।
বিশ্বকর্মার নাম ধরে শিব ডাকে ঘনঘন।
অস্ত্র হাতে নিয়া বিশ্ব দিল দরশন।।
বিশ্ব বলে ওহে প্রভূ খারাপ আমার মন।
আমাকে ডেকেছেন আপনি কিসের কারণ।।
এসেছ বিশ্ব ভাল তুমি বাটার তাম্বুল খাও।
গৌরীরও দুই বাহুর শাঁখা গড়াইয়া দাও।।
এই কথা শুনিয়া বিশ্ব শঙ্খ হাতে নিল।
গৌরির দুই বাহুর শাঁখা গড়াইয়া দিল।।
কাঁধে ছাতি কাঁখে পুঁথি শাঁখা তাতে নিল।
গৌরীর হাতে শাঁখা পড়া সমাপন হল।
সবে মিলে বাহুতুলে শিব দূর্গা বল।।’’[৭]

শিবের বিবাহ

‘‘এ নিশি প্রভাতকাল স্বর্ণ দিবাকর।
হস্তে ঝাড়ি লয়ে শিব চক্ষে ছিটায় জল।।

এই কথা শুনিয়া নারদ করিল গমন।
শিবের কৈলাসে গিয়ে দিল দরশন।।
শিব বলে নারদ ভাগ্নে শোন দিয়া মন।
শীঘ্র করি আমার বিয়ের কর আয়োজন।।
নারদ বলে বুড়ো বয়সে বেটার এমন ঘটা।
বুড়ো বয়সে বিয়ে করতে চায় নিবংশেরও বেটা।।
এই কথা বলিয়া নারদ করিল গমন।
দক্ষ রাজার গৃহে গিয়ে দিল দরশন।।
নারদ বলে ওহে রাজা শোন দিয়া মন।
আমি যে এসেছি গৃহে শিবের বিয়ের কারণ।।
রাজা বলে ওহে নরদ আসছ ঘটক হয়ে।
দেখা দেখি বরটি কেমন দেখ আমার মেয়ে।।
রাণী বলে ওহে রাজা তুমি তো ছাগল।
ভবানীকে দিচ্ছ বিয়া জামাইতো পাগল।।
পাগল নয়রে ছাগল নয়রে শ্রী জগতের নাথ।
ভব বন্ধন পার করিবে হইবে ভব পার।।
তারপর বাড়িতে এল কুলের পুরোহিত।
আগে আগে বলে ঠাকুর পরে বলে শিব।।
এই খানেতেই শিবের বিয়ে সমাপন হল।
সবে মিলে বদন ভরে শিব দুর্গা বল।।”[৭]

এই ধরণের গান নমঃশূদ্র সমাজে দীর্ঘদিন থেকে বয়ে চলেছে ।[৭] এর বিষয়বস্তু বহু চর্চিত হলেও পরিবেশনার ক্ষেত্রে এসব গান সর্বদাই অভিনবত্বের পরিচয় বহন করে আর এ কারণেই তো আজও এইসব গান আমাদের বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করে না, বরং আকৃষ্ট করে। এছাড়াও এর বিষয়বস্তু মিথ নির্ভর হলেও এর সুর এবং কথা নিজস্ব । এখানে পৌরাণিক চরিত্র, শিব, উমা, নারদ, প্রমুখেরা যেন লৌকিক জীবন ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে।

ধরম ঠাকুরের গানে শিব প্রসঙ্গ

লৌকিক মতে বৈশাখ মাস ধর্মমাস। এই মাসে যে কোনো রবিবার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ ধরম ঠাকুরের পূজা করে থাকেন। সমগ্র বৈশাখ মাস জুড়ে ধরম ঠাকুরের নামে মাগন সংগ্রহ করা হয়। মাগন সংগ্রহের সময় ধরম ঠাকুরের গান পরিবেশন করা হয়। যে গান অনেকটাই উত্তরবঙ্গের প্রচলিত মেচেনি গানের মতো। নিচে এরকম একটি গানের দৃষ্টান্ত দেওয়া হল, যেখানে শিব প্রসঙ্গ বাদ যায়নি—

'শিবো শিবো গোঁসাই ভোলা মহেশ্বর
গাইতে শিবের বাণী যমক নাহি ডর
ছালা ভরি গাঞ্জা পেট ভরি মন্তর
সাকালে বইসে ঠাকুর বেলা হয় দুফুর।
... ...
উঠ উঠ ধর্মি লোক ধর্ম কয় যার
ধর্ম কড়ি দিয়া ধর্মক বিদায় কর।''[৮]

শিব খেলার গান

উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি থানায় এই শিব খেলার গান দেখা যায়। দুর্গাপূজার পর সমগ্র কার্তিক মাস জুড়ে যুগী সম্প্রদায়ের মানুষেরা গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরে 'শিবের গান' গেয়ে মাগন সংগ্রহ করে। যিনি এই গান পরিবেশন করেন তাকে একটি মালসায় বেলপাতা, প্রদীপ প্রভৃতি জ্বালাতে হয়, গৃহস্থবাড়ির তুলসী তলায়। তারপর গান পরিবেশন হয়। মূল গায়েনের হাতে থাকে ত্রিশূল। আসলে এইসব গানের মধ্য দিয়ে মূলত শিবের দাম্পত্য সম্পর্কের কথাই ব্যক্ত হয়। অন্ন, বস্ত্র সংকটে শিবকে কিভাবে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়, এই ধরণের গানের বিষয়বস্তুও তাই। আসলে এই সময় গানের মধ্যে দিয়ে শিবকে সামনে রেখে গায়েনরা তাদেরই দৈন্য দশার কথা ব্যক্ত করেন। বর্তমান আর এইসব গানের প্রচলন সেভাবে দেখা যায় না। নিচে এধরণেরই একটি গানের উল্লেখ করা হল —

১.পাটের গান ঃ

''বল শিব বল শিব
শিব যে এল মর্ত্যেতে

সবাই বলে ও মাদা ভাই
এমন নাম আর শুনি নাই।”[৯]

২. শিব খেলার গান ঃ

‘‘বন্দনা অংশ ঃ

পূব্বে বন্দনা করি ধম্ম নিরঞ্জন
উত্তরে বন্দনা করি মা কালির চরণ
পশ্চিমে বন্দনা করি পীর ও পয়গম্বর
দক্ষিনে বন্দনা করি ক্ষির নদীর সাগর
আকাশে বন্দনা করি আকাশেরও কামিনী
পাতালে বন্দনা করি মাও বসুমতি
চার কোনে বন্দনা করি মইধ্যে নাবি স্থান
লক্ষ্মি মাও লক্ষ্মি মাও লক্ষ্মি সরস্বতী
লক্ষ্মি মাও লক্ষ্মি মাও ত্রিভূবনে জানে
যার ঘরে আছে লক্ষ্মী দুয়ারে পঞ্চ গোলা
যার ঘরে নাই লক্ষ্মী জিয়ন্তে মরা
লক্ষ্মিরও পাঁচালী শুনহে গর্ভবতী নারী
পুত্র খানি হইলে হয় ধনের অধিকারী
কন্যাখানি হইলে হয় রাজ পাটের পুরী
ধম্মের আজ্ঞা মহাদেবের বর
এই আশির্বাদ দেও হে ভোলা মহেশ্বর
শিব বলো পা।’’[১০]

৩.

‘‘শিবোশিবো বন্দোঁ গোঁসাই
ভোলা মহেশ্বর
গাইলে শিবেরো বাণী
যমক নাইরো ডর।।
ছালা ভরি মালা শিবের
প্যাট ভরি মন্তর।।

সাকালে বইসে ঠাকুর সেবা
বেলা যায় গড়িয়া।
মুণ্ড হস্তে দিয়া কান্দে
গঙ্গা-দুর্গা।।
গঙ্গা-দুর্গা কান্দে
কার্তিক -নেরাই।
হাবাতিয়া শিবের ঘরে
অন্নমুঠি নাই।।

অন্ন অভাগে চণ্ডী
হইল দিগম্বরী
তৈলবিনা মাথার কেশ
বান্ধিতে না পারি।।
ভাশুর আইলো, শ্বশুর আইলো
অন্নপরোশন তাত্।
মোরো চণ্ডীর শাংকা নাইরো
নইজ্জা নাগে তাত।।

গাঞ্জা খায় স্যারে স্যারে
বিষেরে ভোজন।
আড়াই মুঠি চাউল হলে
হয় শিবের আন্দন।।

আন্ধিয়া-বাড়িয়া দিলেক
ভোলা শিবের আগে।
আড়াই মুঠি চাউলের ভাত খায়
গাঞ্জারো ধমকে।।

সেই না শিবের বাণী
কি বলিব হায়।
কার্তিক গনো দুইটি ছাইলা
ভোকেতে নালায়।।
কান্দিয়া কান্দিয়া ছাইলা
ঢেঁকিশালা যায়।
চাউলের গুণ্ডা বলি ছাইলা
ভাঙ্গের গুণ্ডা খায়।।
সাত মাসিয়া ছাইলার নগত্
কোন্দল নাগায়।
কোন্দলে ঘুচাইতে
চণ্ডীর দিনো যায়।।" [১১]

তিস্তাবুড়ির গানে শিব প্রসঙ্গ

উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে তিস্তাবুড়ির পূজা প্রচলিত আছে। সমগ্র বৈশাখ মাসের যে কোনো দিন তিস্তাবুড়ি দেবীর পূজা দেওয়া হয়। সাধারণতকোনো নদীর প্রান্তে বেদি করে সেখানে এই দেবীর পূজা হয়। এক্ষেত্রে লালনিশান চারি দিকে পোঁতা হয়। আবার জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার কিছু অংশে নির্দিষ্ট মন্দিরে মূর্তি সহ এই দেবীর পূজা হয়। সাধারণত অধিকারীরাই এই পূজা দিয়ে থাকেন। তবে নির্দিষ্ট কোনো মন্ত্র পাওয়া যায় না। বিভিন্ন ফল - বাতাসা প্রভৃতি এই পূজার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে কলা গাছের ভুরা প্রয়োজন বলে জানা যায়। সেটি এমন ভাবে তৈরি করা হয় যার চারি দিক কলা পাতা বা অন্য কিছু দিয়ে ঢাকা থাকে। কেননা এর মধ্যে একটি প্রদীপ বসানো হয়। যাতে সেটি নিভে না যায় তার জন্য এমন ব্যবস্থা করা হয়।

জানা যায় তিস্তার ভয়ঙ্কর রূপের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এতদঞ্চলের মানুষেরা এই দেবীর স্মরণাপন্ন হন। তবে এই দেবী যে নদীকেন্দ্রিক এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। প্রচলিত মিথ থেকে জানা যায় যে এই দেবী শিবের পরিবারেরই একজন। তিস্তা বুড়ির স্বামী এখানে ধরলা নদী, যা বুড়া ধরলা নামে পরিচিত। তাদের ছেলে ও মেয়ে যথাক্রমে করলা ও দুলালী। প্রসঙ্গত দুটিই বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার একটি নদী ও দিঘি হিসেবে পরিচিত। আবার অন্য আর একটি

মিথ থেকে জানা যায় যে তিস্তাবুড়ি শিবের বোন। অর্থাৎ শিব ঠাকুর এক ভাই ও তিন বোন। এই তিন বোন হলো তিস্তাবুড়ি, গিলাণ্ডিবুড়ি এবং সাঞ্জাইবুড়ি। লক্ষণীয় তিস্তা বর্তমান জলপাইগুড়ির উপর দিয়ে, গিলাণ্ডি ধূপগুড়ির উপর দিয়ে এবং সাঞ্জাইবুড়ি আলিপুরদুয়ারের উপর দিয়ে প্রবাহিত।

তিস্তাবুড়ির পূজা উপলক্ষে এতদঞ্চলে কিছু গান ও নাচের প্রচলন দেখা যায়। এখানে সেইসব গানের মধ্যে কিছু গান উল্লেখ করা হলো, যেখানে প্রসঙ্গক্রমে শিবের কথা এসেছে।

১. ‘‘পার্বতি ঃ শুনেকরে ভাঙর বুড়া
সদায় খাইস তুই ভাং ধুতুরা
বাড়ি ঘরের খবর নাই তোর
চলন গেদেরা
সদাই যাইস তুই কুচুনি পাড়া
তুই যে করিস চালাকি
সদায় ক্যানে দিস ফাকি
নদীর পাড়োৎ পড়িলো ধরা
সগায় দেছে সাক্কি
সারা গায়ে মাখিলো ছাই
সাজিলো তুই ভাবের গোঁসাই
পর পীরিতির লোভে বেড়াইস
নইজ্জা সরম নাই।

শিব ঃ শুনেক শুনেক চণ্ডী
তার কাথাতে মুই বন্দি
ক্যামন করি আসিলো হেটে
কায় দিলে তোক ছন্দি
শুনেক চণ্ডি কছ তোক
আর অপমান না করিস মোক
ভাঙের নিশায় হারাইসু দিশা
নাই মোর শুত্তি বোধ।
ভাঙের নিশা হলে ভারি
তাতে যাও মুই বাড়ি ছাড়ি

পার্বতি ঃ ঘরৎ নাই মোর একদানা
করি বেড়াইস কারখানা
গনেশ কার্ত্তিক ঢুলেছে ভোগে
তোর কি নাই জ্বালা।'' [১২]

২. ''ফাও কাথাতে ও মোর চণ্ডী
মাথাটা কোরলো ঘোল
নারদ মুনির কাথা ধরি
করিছিৎ গণ্ডোগোল
তোর নগত মোর সদায় গেকোন্দল
যত শয়তানি করে ওইনা নারদ মুনি
ক্যানে তুই ঝগরা করিস মুই তোর সোয়ামি
ধরা না যায় পরার সয়তানি।

শিব চণ্ডী ভিন্ন না হয় জানে সর্বজন
যুগে যুগে কত নীলা করিসে দনঝন
ক্যানে খালি করিস অপমান
পথমে জনমিলো তুই দক্ষ রাজার ঘরে
জগৎ ভরি সতী নাম রাখিলো পচারে
ঘাড়ে নিয়া গুড়ি জগতে।

খণ্ড খণ্ড করি কাটি ফেলাইল নারায়ন
ওই খানে হইল তীর্থ ওই না ধরা ধাম
দ্যাখেদো মুই সারাটা জীবন।
এলা ক্যানে খুঁজি বেড়াইস
তুই ক্যামন নারী।'' [১৩]

লাহাঙ্কারী গানে শিব প্রসঙ্গ

লাহাঙ্কারী গান সুপ্রাচীনকাল থেকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের পরিচয় বহন করে চলছে। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন গানগুলির মধ্যে এটি একটি প্রাচীন শাখা। দুই দিনাজপুর, বিহারের কিশানগঞ্জ, পূর্ণিয়া, প্রভৃতি স্থানে এই গানের প্রচলন থাকলেও দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলই এর পীঠস্থান। একারণেই এখানকার ভূ-প্রকৃতির মতোই লাহাঙ্কারী গানের সুরে উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যায়। দোতরা, সারিঙ্গা, ঢোল, করতাল, খোল, ডাসি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র এই গানে ব্যবহার করা হয়। অধুনা হারমোনিয়ামেরও ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। লাহাঙ্কারী গান মূলত বিচ্ছেদ বেদনার গান হিসেবেই পরিচিত। একারণেই এই গানের সঙ্গে কান্নার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। নারী হৃদয়ের গুমোট যন্ত্রনা, অসহনীয় ব্যথা-বেদনা এই গানের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। ভাসানী, ঢিপানী, উদাসী, পাথারী এই চার ধরনের লাহাঙ্কারী গানে একদিকে যেমন পরিস্ফুট হয় বিচ্ছেদের বেদনাদীর্ণ হাহাকার তেমনি অন্যদিকে পরিস্ফুট হয় রাজবংশী লোকায়ত জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

যে সমস্ত লোকশিল্পীরা এই গানের রচয়িতা তারা সাধকও বটে। তাই তাঁরা অনেক সময়ই দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় গান রচনা করেন। এই বাচ্যার্থ বা গূঢ়ার্থযুক্ত গানে অনেক সময় তাদের সাধনতত্ত্বের কথা ব্যক্ত হয়। ফলে পুরুষ ও প্রকৃতি যেমন তাদের গানে স্থান দখল করে থাকে তেমনি এতদঞ্চলের দেবদেবীরাও সেখান থেকে বাদ যায়নি। স্বাভাবিকভাবে শিবকেও তাঁরা তাদের গানের মধ্য দিয়ে প্রধান পুরুষ দেবতা হিসেবে অঙ্কন করেছেন। নিচে এরকমই কতগুলি গানের উল্লেখ করা হলো।

১. ‘‘হায়রে, শিবের মতো পাগল পাইলাম না
মনের মতো মনের মতো পাগল পাইলাম না
নকল পাগল সকল দ্যাশে
হায়রে শিবের মতো পাগল পাইলাম না
হায়রে আসল পাগল মেলে না
আমি মনের মতো মনের মতো পাগল পাইলাম না।

কেউবা পাগল পিরিতির আশে
কেউবা পাগল ধনের জনে, বিষয় লালসে

হায়রে নকল পাগল সকল দ্যাশে
ভাইরে আসল পাগল মেলে না
মনের মতো মনের মতো পাগল মিলে না।
শিবের মতো পাগল পাওয়া ভার
শ্মশানে তার বাসা বাড়ি সর্পে অলঙ্কার
সেতো ভাং ধুতুরা খায়রে ভোলা
সে তো ভালো মন্দ বোঝে না
আমি মনের মতো মনের মতো পাগল পাইলাম না।'' [১৪]

২. ''জয় জয় শিব শঙ্কর প্রেম সুন্দর কাম
জয় জয় ভোলেনাথ জয় শিব শঙ্কর
আজিকার নামে তোমারি চরণে
আমি করিলাম বন্দন
জয় জয় শিব শঙ্কর।

আজিকার আসরে তোমারি স্মরণে
করিলাম আমি বন্দন
জয় জয় ভোলেনাথ।

তুমি হে ব্রহ্মা তুমি হে বিষ্ণু
তুমি হে ভোলানাথ
জয় জয় শিব শঙ্কর।

আজিকার আসরে তোমারি স্মরণে
করিলাম আমি বন্দন
জয় জয় ভোলেনাথ।'' [১৫]

৩. ''সব দেবতা মিলিয়ারে ভাই

শিবের করে আরাধন
মহিষাশুরের সঙ্গে না পারে কোনো জন
ওরে শিবে কাটিয়া নিলে সব দেবতার অং
শিবের তপস্যায় হইলোরে ভগবতি শ্রীজ
ওরে মরি হায়রে মরি হায়রে হায়
ওরে মোহিনী অবলা নারী
মোহিনী যাছে রে ভাই শম্ভু রাজার মধুর বন।''[১৬]

মদনকাম পূজার গানে শিব প্রসঙ্গ

উত্তরবঙ্গের তরাই ও ডুয়ার্স অঞ্চলে (বিশেষ করে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা) মদনকাম দেবতাকে শিব জ্ঞানে পূজা করা হয়। আবার একে বাঁশ পূজাও বলা হয়। এই পূজায় কোনো মূর্তি থাকে না। মাটির বেদির উপর তিনটি বাঁশকে পুঁতে তাকেই পূজা করা হয়।

মদন চতুর্দশীতেই মদনকামের পূজা হয়ে থাকে। পূজা শেষে নৃত্য ও গীতপরিবেশন করা হয়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস এই পূজায় দাম্পত্য জীবন সুখের হয়। সন্তান সন্ততি সুস্থ ও সবল হয় এবং তারা কর্মদক্ষতায় নিপুন হয়। শুধু তাই নয় সারাটা জীবন যেন আনন্দে কেটে যায় এজন্য তারা সর্বদাই মদনকামের নাচ ও গানের মতো নানান বিনোদন মূলক অনুষ্ঠান করে থাকেন। এছাড়াও জানা যায় যে এই গানের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সন্তান সৃষ্টি করা, আর এক্ষেত্রে কাম ভাবনাই মূল কথা। যার মাধ্যমে প্রজনন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব। এই কাম উদ্দীপন করার জন্যই স্থানীয়রা মদনকামের পূজা করে থাকেন। নৃত্য ও গীতের সময় পুরুষেরাই মহিলা সেজে থাকেন। কেননা এতে নারীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকে।

১. ''শিব হে ভগবান
ঠাকুর কৃষ্ণ মদনকাম
তোমার চরণে আমি জানাই হে প্রণাম।
ত্রয়োদশীতে বাঁশত কাপড়
চতুর্দশীতে হোম
পূর্ণিমার দিন বাড়ি বাড়ি
বিড়ায় মদনকাম।

শিব হে ভগবান।
নিপুত্রিয়ার পুত্র হবে
নিধনিয়ার ধন।
খোড়ায় চরণ পায়
অন্ধ পায় নয়ন।
কামদেব সামান্য লয়
শ্রী নন্দের নন্দন
ভক্তি ভরে যে জন পূজে
পুড়ায় মনোস্কাম
শিব হে ভগবান।'' [১৭]

২. ''সুন্দর মদনকাম
বাঁশের সুন্দর মদনকাম-ভাবের মদনকাম।
মনো বাঞ্ছা পূরণ করে সোনার মদনকাম
শিবের বীর্য কৃষ্ণের প্রেম ধৈর্যের বলরাম
তিন বাঁশেতে তিন নামেতে জাগে ঠাকুর মদনকাম।
হাতত যাদু মুখত মধু, বুকত শীতল পাটি
মদনকাম ঠাকুরে কয় সেই পুরুষে খাঁটি।
চন্দ্রমুখী নারীর কূলে কামের প্রদীপ জ্বলে
মুখ দেখিয়া মুগ্ধ হয় সদা শিব ভোলে।।
কামদেব মারে বান কামে মত্ত হয়া
উজান পাকে মারে বান ভাটিত পরে রয়া।''[১৮]

৩. ''ওরে ঠাকুর মদনকাম
রসিক গুণের মদনকাম
বাড়ি বাড়ি টারি টারি
ঘুরে রে মদনকাম।
তার নাবিতে বসতি শিব

বুকে বলরাম
নয়ন কমল মাঝে -
কৃষ্ণ ঘনশ্যাম।
হেলিয়া দুলিয়া হাটে
ঠাকুর মদনকাম
দেখিয়া শীতল হয় পুরে মনস্কাম।
চিত্তিনী নারীর দেহার শোভা
হস্তিনির শোভা কাম।
দেখিয়া আকুল হয়
ঠাকুর মদনকাম।
পদ্মিনীর মুখ দেখিয়া
ভোলে মদনকাম।
সাংকিনী নারীর পরশে পাগল
হইল মদনকাম।''[১৯]

এগুলি ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের লোকনাটক, পালাগান, বিভিন্ন ব্রতকথার আসরে বন্দনা অংশেও 'শিব' প্রসঙ্গ আসে। শিব বন্দনা বাদ দিয়ে যেন কোনো পালাই আশা করা যায় না। যদিও বন্দনা অংশে সর্বাপ্রেক্ষা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে ধর্মনিরঞ্জন। বিশেষ করে সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে এই ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গ বারবার চলে আসে। বলা হয় তিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা। অথচ শিবের মতো ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন উত্তরবঙ্গে বেশি নেই। অনেকেই আবার শিব ও ধর্মঠাকুরকে এক বলে মনে করেন। তবে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য ও প্রচলিত নানান মিথ থেকে দু'জনকে এক ভাবা যায় না। যাই হোক বন্দনা অংশে এই ধর্মঠাকুরের পর যিনি প্রাধান্য পেয়ে থাকেন, তিনি হলেন শিব। উত্তরবঙ্গের প্রচলিত ওঝালি গানেও শিব ও ধর্মঠাকুরকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। নিচে দু'একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে —

১. ''পূব্বে না বন্দিয়া গামোঁ ধম্মনিরঞ্জন
তাহারো চরণো বন্দোঁ ধম্মনিরঞ্জন
উত্তরে বন্দিয়া গামোঁ গইন্যাৎ মহাকাল
তাঁহারো চরণো বন্দো দুইয়ো পাও।।

পশ্চিমে বন্দিয়া গামোঁ পীরো পয়গম্বর
তাহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও।।
দক্ষিণে বন্দিয়া গামোঁ সম্পতি সাগর
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও
চাইরো পাখে চাইর কোণা বন্দোঁ
মইধ্যে জল্পেশ্বর
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও।'' [২০]

ঘ. মন্ত্রে শিব প্রসঙ্গ

''মন্ত্র হলো জাদুবিদ্যার একটি অঙ্গ যা লোকভাষায় প্রকাশ করা হয়। জাদুবিদ্যা অতি-প্রাচীন বিশ্বজনীন বিদ্যা (Art)। মন্ত্র, আচার ও নানাবিধ দ্রব্য জাদুবিদ্যার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়।''[২১] মন্ত্র লোকসাহিত্যের স্বতন্ত্র একটি ধারা। যা সাধারণত পদ্যের আশ্রয়ে প্রকাশ পায় এবং এটি সম্পূর্ণরূপে উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে ব্যক্ত করা হয়। একারণেই প্রতিটি মন্ত্রের ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য থাকে। একটি মন্ত্রকে বিশ্লেষণ করলে আমরা মূলত চারটি উপাদান পেয়ে থাকি। যথা সূচনা অংশ, বিচরণ অংশ, প্রার্থনা অংশ এবং দোহাই অংশ। সাধারণত যে বিষয়ের উপর অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যের জন্য মন্ত্রপাঠ করা হয় সূচনা অংশেই তার ইঙ্গিত থাকে। প্রয়োজনে সেই ইঙ্গিত বাচক শব্দটি মন্ত্রে বার বার উচ্চারিত হয়। বিচরণ অংশে কারণ সমূহের উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ সাপে কাটলে সাপের কথা, ভূতে ধরলে ভূতের কথা এই অংশে থাকে। এরপর এইসব কারণের উপর ভিত্তি করে উদ্দীষ্ট দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়। প্রয়োজনে কাতর মিনতি জানানো হয়। এতেও যদি ফল না হয় তবে সেই দেবতার নামে, বা দেবাদিদেবের নামে দোহাই দেওয়া হয়। দোহাই অর্থে হুমকি বা Challange. আমরা প্রায় প্রতিটি মন্ত্রের ক্ষেত্রেই এই ধরণের কাঠামো দেখি। অনেক ক্ষেত্রে দোহাই দেবার সময় অকথ্য ভাষায় গালিও দেওয়া হয়।

মন্ত্রের যতগুলি ভাগ রয়েছে তার মধ্যে একটি হল লৌকিক মন্ত্র। অন্যদিকে সংস্কৃত মন্ত্রের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় দেব-দেবীর পূজা করা হয়। কিন্তু লৌকিক মন্ত্রের সাহায্যে একমাত্র লৌকিক দেবদেবীর পূজা করা হয়। তাই এই ধরণের মন্ত্রের ভাষা, শব্দ, বাক্য বিন্যাসে আঞ্চলিক ছাপ দেখা যায়। অন্যদিকে বাংলা মন্ত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে জড়িত। নীচে একটি

ছকের সাহায্যে মন্ত্রের বিভিন্ন ভাগগুলি দেখানো হল

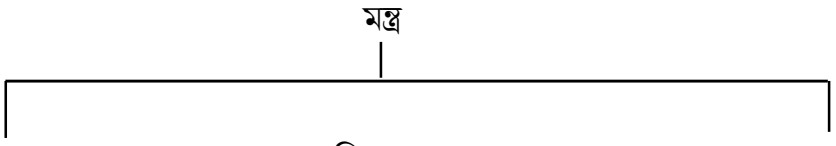

(রোগ প্রতিরোধমূলক)

লোকচিকিৎসায় ব্যবহৃত মন্ত্রে শিব

লোকচিকিৎসা সাধারণত দুই ভাগে করা যেতে পারে, নিচে একটি ছকের সাহায্যে তা দেখানো হল —

(ঝাড়, ফুক ইত্যাদি)

লোকঔষধের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি এক্ষেত্রে ঝাড় ফুকের গুরুত্বকেও অস্বীকার করা যায় না। যদিও এতদঞ্চলের পূর্বে লোকচিকিৎসাই ছিল মূল চিকিৎসা পদ্ধতি। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞান নির্ভর যুগে এই ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন অনেকটা কমে গেছে। তা সত্ত্বেও গ্রামে গঞ্জে এখনও প্রাথমিক চিকিৎসা রূপে প্রায় সব বাড়ি লোকচিকিৎসার আশ্রয় নেয়, জ্বর থেকে শুরু করে পেটব্যাথা, হাঁপানি, মাথা ব্যাথা শিশুদের চমকে ওঠা ধাইমা দিয়ে সন্তান প্রসব করানো, প্রভৃতি ক্ষেত্রেও গ্রামে গঞ্জে এখনও লোকচিকিৎসার ব্যবহার দেখা যায়। তবে লোকঔষধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিবের কোনো ভূমিকা না থাকলেও মন্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই দেবতার যথেষ্ট প্রাধান্য রয়েছে। নিচে এরকম কতগুলি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হল।

১. শরীরে কোথাও পোড়া ঘাঁ হলে সেই ঘা শুকাবার জন্য 'জল পড়ে' দেবার রীতি এখনও রয়েছে। লোকবিশ্বাস এই 'জলপড়া'পোড়া ঘা'এ কয়েকদিন ধরে দিলে তা সেরে যায়। এই 'জলপড়া' মন্ত্রে শিবের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় —

''ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেবতা একত্তর
ব্রহ্মা বলে বিষ্ণু আমি নেই জানি

অমুকের অঙ্গের পোড়া ঘা
জল পড়াতে ফুয়ে হল পানি।'' [২২]

২. বাড়ির ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা কোনো কারণে ভয়ভীতি পেলে কবিরাজ দ্বারা মন্ত্র পড়ে 'ঝেড়ে দিলে' তাদের তার সেই ভীতি থাকে না। অনেক সময় সেই ভয়বশত তাদের জ্বরও চলে আসে। তখন 'ঝেড়ে দেবার' পাশাপাশি কবিরাজের মন্ত্রপূত 'জল কষা'ও নিতে হয়। সেই জল পান করলে শিশুটি সুস্থ হয়ে ওঠে। এই রকম জলকষায় মন্ত্রটি হল নিম্নরূপ —

''জলমধ্যে পড়ে জল কুম্ভির
পাতাল মধ্যে পড়ে পাতাল কুম্ভির
উনুকুটি নাকলরা পড়ে বিষহরি
গ্রাম দেবতা পড়ে স্বস্তি
আপাল ভিন পড়ে।
ছড়েকের নাগ কার্ত্তিক গণেশ পড়ে।
নন্দি মহাকাল হাদা তারা পড়ি গেল।''[২৩]

৩. আবার বসন্ত রোগ, একশিরা, হাপানি, কালাজ্বরের মতো কঠিন ব্যাধির ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত মন্ত্রের লেখ্য রূপ সঙ্গে থাকলে এরকম ক্ষয় ক্ষতি বা রোগ ব্যাধির হবার সম্ভাবনা থাকে না। লক্ষ্যনীয় এই মন্ত্রেও শিবের দোহাই রয়েছে। যেমন —

''অথ গু করতি লিখিতং ঔ ওঁ ওঁ
ধন্বন্তরি নামে সহায় ও করতি লিখিতং
শূন্য হইল মূল ডাল হইল আকাশ
সৃজিল পৃথিবী রূপ পুত্র প্রকাশ
বীর্য হইয়া পাতালে বসিল জনরূপ অনাদি
যে আহিলা স্বরূপ আকাশে বাউ হইল
কৃষ্ণরূপ ধরি শিবের যা জল এই ত্রিশ্বর।'' [২৪]

ভূত তাড়াবার মন্ত্র ঃ

''ছুচ মুচ ছুচিয়া বিস্তর জাতি
কুনঠে ছুচিয়া তোর উধোপতি
বাপ তোর ধরম মাও তোর কালি

তোর গর্ভে হইলেক মাশান
শুন তোর জমের শিলুক
শুনেক কান পাতিয়া
ফন্নায় আষ্টাং দেহা ছাড়িয়া
তুই যা কৈলাস নাগিয়া।'' [২৫]

লক্ষণীয় উত্তরবঙ্গে লোকদেবতা রূপে শিব যে একাধিক নামে পরিচিত তার পরিচয় এখান থেকে স্পষ্ট। বিশেষ করে রাজবংশী জনগোষ্ঠীদের মধ্যে শিব মাশান ধরমঠাকুর নামে পরিচিত। অনেকেই আবার মাশানকে অপদেবতাও বলে থাকেন। লোকবিশ্বাস এই মাশান ও উত্তরবঙ্গে শিবের রুদ্ররূপের প্রতীক। তাই ভুত তাড়াবার মন্ত্রে এইসব দেবতাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

গ্রহ দূরীকরণের মন্ত্র

১. ''শিব লঙ শিব লঙ শিব লঙ
তিন নামে কাশী তিন নামে বসি
তিন নামে জপে যায়
অক্ষয় অমর অয়।'' [২৬]

২. নবগ্রহ শান্তির মন্ত্র এবং এক্ষেত্রে শিবকে আহ্বান করতে হয় মন্ত্রের দ্বারা —
''মহাদেব মহাত্রাশ মহামুণি মহেশ্বর
মহাপাপ হরং দেবঃ মকরায়
সর্বেসর্বা প্রজ্ঞ তোমাকে আমি নমস্কার করি—'' [২৭]

৩. ''স্বর্গের শিব মহেশ মঞ্চে দিয়া পাও
ধূপ ধুনা নবপ্রসাদ ভইক্ষণ করিয়া নেও
ভইক্ষন করিয়া ফেন্নার চাতরের ফেন্নার
দেহার আপদ-বিপদ -রোগ বিয়াদি, ভুত-প্রেত
নবগ্রহ, জরি পটি বাহান ছেদ ধরিয়া হর হর
বলিয়া যা তুই কৈলাশত নাগিয়া।''[২৮]

৪. ''কালকূট কৃষ্ণের বাণ অস্তিত ফে লানু ফান
ভাল ভাল হাকিম উকিল মুক্তিয়ারে বুদ্ধি

আমার কণ্ঠে টানিয়া —। আমার কণ্ঠ
ছাড়িয়া অনোর কণ্ঠে যাবো দোহাই নাগে।'' [২৯]

ঠাকুর বসা মন্ত্র (বৈশাখী সেবা)

১. ''বাসুদেবের বাসনা মহাদেবের কামনা
চন্দ্র-সূর্য দিলো ঢাকেনা। শীতলে
মহাপ্রভু শ্রী কৃষ্ণ শীতলে রভো
পর বুদ্ধি নাহি ধরিবো, হাগাকটি
নারিলে সহকিনা দোষীসহ ছুয়াগত হব
নারিলেও সহকিনা দোষীসহ
শঙ্খের জল কুশের পানি ধর্ত্তি সমান রভো।'' [৩০]

২. ''আইস আইস স্বর্গের ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বর
বইসো পাটে। ভক্তের পূজা-পানিতে
হয়া যাও শান্তি। শান্তি শান্তি শান্তি
মান শান্তি, প্যাট পান্তি, শান্তি বসুমতী
শান্তিতে রহা ভক্তের উপর হয়া রভো সদাই।'' [৩১]

৩. ''দুধ, কলা, চিনি, মধু, নানা উপাচারে
গোতান দেছ মনে প্রাণে। পূজা দেছ তোরে -
জ্বলেয়া তেলের প্রদীপ, ধূপ-ধুনা দিয়া
এই পূজাত আসিয়া যাউক হয়া সদা
ভক্তের উপর হয়া রভো সদাই।'' [৩২]

তুলসীপাত তোলার মন্ত্রে শিব

''কালা কালা তুলসীর চারি চারি পাত
মুই তুলেছু তুলসী করিয়া জোড় হাত
হেলিস না দুলিস না খাইস ভয়

ঈশ্বর মহাদেবের পূজায় হয় কোটি কোটি নমস্কার।'' [৩৩]

জল পোড়া মন্ত্রে শিব

''ধুল ধুল ধুলিয়া। ফেন্নার পরঘাত পচ্ছুত।
আপদ-বিঘ্নি-রোগ -বিয়াদি শিবের হুঙ্কারে
পালাল ওড়িয়া। (একদমে তিনবার)
মনমেরা তেলপুষ পবন সেবা টুঙ্গি
তির পিরালে গাহের জল দিয়া চান করেছি
আমি। সিনানে খণ্ডিল পাপ, আপন-তাপন
পরতাপ। পরছুদ কৃষ্টের হরিনাম এই জলকষায়
করি দিবো ভ্রষ্টং।'' [৩৪]

শান্তির জল কষা মন্ত্রে শিব

''উমামায়া কালি সুমমায়া কাম
নাম্মী মেছেনি কালি শিবের
চোদনে বেটি হয়া যাবো শান্তি।'' [৩৫]

গরুর কাঙঝারার মন্ত্রে শিব

''দেব-দেবী বহে হাল সোনার লাঙ্গল রূপার ফাল
লাল গরুর (রং অনুযায়ী) কাঙের বিষ। কাঙ হতে গালত
নামিস। গাল হাতে ভূমিত পরিস। হর বিষ হর বিষ
নিরঝর ঝরঝর গরহালের হাঙ্কারে কাঙের বিষ
ভূমিত পড়কি ভূমিত পড়। হেট ছাড়িয়া উপরও
উঠিবো তো দোহাই শিবের মাথা খাবো ।'' (একদমে তিনবার)[৩৬]

তিস্তাবুড়ি পূজার মন্ত্রে শিব

১. নামানির মন্ত্র ঃ

''স্বর্গ হাতে নামিল শিব শঙ্কর

শিলা ঢাক ঢোল বেরো কাশি
নাচতে বাইজন বাজে
আঙ সাঙ মাং
ধর্তি শিবের লিঙ্গ হইল আসন।''

২. শান্তি মন্ত্র ঃ

''দই দুধ ঘিত মধু নানা উপহার
নেও প্রভু নিরঞ্জন।''

জ্বর কাটানীর মন্ত্রে শিব ঃ

''চিল্ চিল্ চিল্ কা
স্বর্গের ডাকে মঞ্চে নামে
কালির বেটা মাশান
এই পূজা পানি হাতত নিয়া
ঘিতের ভোগা ভইক্ষণ করিয়া
চলি যা তুই দক্ষিণক নাগিয়া।'' [৩৭]

বন্ধ করার মন্ত্রে শিব ঃ

অনেক সময় ওঝারা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে ঘরবাড়ি, দেহ, চারদিক মন্ত্রের দ্বারা বন্ধ করে দেন। এরকম একটি 'দেহাবন্ধ' করার মন্ত্র হল —

''এক বন্দে বন্ধ কর ফ্যান্যা নামক পুরুষ
দুই বন্দে বন্ধ কর চান সূরজ
তিন বন্দে বন্ধ কর ত্রিকোণ পৃথিবী
চার বন্দে বন্ধ কর চারি চক্র দিক
পাঁচ বন্দে বন্ধ কর চারি চক্র দিক
ছয় বন্দে বন্ধ কর ছুরত
সাত বন্দে বন্ধ কর সান্তালি পর্বত
আট বন্দে বন্ধ কর নরক বীর
দশ বন্দে বন্ধ কর দশমীর দশ দুয়ার

এগারো বন্দে বন্ধ কর ঘরের চারি কোণ
বারো বন্দে বন্ধ কর দয়াদশ পরম গ্যান
নয় বন্দে বন্ধ মোর দশ দিন ভরিয়া
সেয় বন হেলিব পেলিব চায়ায় খায়
ঈশ্বর মহাদেবের মাথায় দুই পায়।'' [৩৮]

এই মন্ত্রে একদিকে যেমন দশদিককে বন্ধ করা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে স্বর্গ, মর্ত্য, আসর ,গৃহ বন্ধের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এই সমস্ত মন্ত্রে ওঝা নিজেকে, রোগীকে ভাবী বিপদ থেকে রক্ষা করার কৌতুহল প্রকাশ করেন। যার মধ্য দিয়ে রোগী ও রোগীর আত্মীয় পরিজনদের মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস জেগে ওঠে। অনেক সময় রোগীর এই আত্মবিশ্বাসে সমস্ত রোগ নিরাময় হয়।

এই মন্ত্রের মধ্য দিয়ে অনেক শ্রোতা বা পাঠক তার প্রমাণ খোঁজেন। বলে রাখা প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের মতো মন্ত্রের প্রমাণ পাওয়া যাবে না। তবে অনেক সময় রোগীর দুর্বল মনকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলে এই মন্ত্র, সেক্ষেত্রে তার নিজের শরীরেই ভয়, ভীতি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে। আবার প্রসঙ্গক্রমে আর একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে মন্ত্র কেবলমাত্র কয়েকটি বাক্য। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে শব্দ, তাল, ছন্দ যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে, মন্ত্রের ক্ষেত্রে সেগুলির থেকেও অধিক কিছু বিষয় কাজ করে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'মিউজিক থেরাপি' অনেকক্ষেত্রে ব্যবহার হতে দেখা যায়। যা রোগীর মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। লোকায়ত চিকিৎসা পদ্ধতিতে মন্ত্রের সুফল লাভের ক্ষেত্রে জড়িয়ে আছে ওঝা বা গুণিনের কথা, সুর, উচ্চারণ, উপকরণ, আচরণ ইত্যাদি। উপরন্তু মন্ত্র নির্ভর করে পরিবেশ, পরিস্থিতি তথা স্থান, কাল ও পাত্রের সমন্বয়ে। এছাড়াও প্রয়োজন হয় গুরুর মাহাত্ম, তাই গুরুর প্রতি গভীর বিশ্বাস ও তার প্রয়োগ বিধি ঠিকঠাক আয়ত্ব করতে না পারলেও মন্ত্র কোনো দিনই ফলপ্রসূ হবে না। অন্যদিকে মন্ত্রের গুরুত্বের কথা জানাতে গিয়ে ওয়াকিল আহমদ লিখেছেন—''মন্ত্রের প্রভাব-বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে যত দেরী হয়েছে, একটি জাতি তার কর্মশক্তি ও সৃজনশক্তি থেকে তত দূরে সরে থেকেছে। বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি বিকাশের প্রেক্ষাপট আলোচনায় তাই জাদু-মন্ত্রের জগৎটিকে অস্বীকার করলে চলে না। বলা যায়, জাতির সামাজিক-সংস্কৃতিক-বৌদ্ধিক ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি গুরুত্বপূর্ণ এ-উপাদানটি বিবেচনায় না নেওয়া হয় অথবা আলোচনার অন্তর্ভুক্ত না করা হয়।'' [৩৯]

ঙ. ব্রত কথায় শিব

ব্যক্তিগতভাবে কিংবা পরিবারগতভাবে কিংবা সমাজের কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বংশপরম্পরাভাবে যে সকল আচার অনুষ্ঠান পালন করা হয় তাকেই মূলত ব্রত বলা হয়। অর্থাৎ অভিষ্ট বস্তু সিদ্ধিলাভের জন্য যে কর্মপদ্ধতি তাকেই ব্রত বলা হয়। কামনা থেকেও যেমন ব্রতের উৎপত্তি হতে পারে, তেমনি ভয়ভীতি থেকেও ব্রতের উৎপত্তি হতে পারে। তবে যেভাবেই এর উৎপত্তি হোক না কেন, সমষ্টি প্রবণতা ব্রতের অন্যতম লক্ষণ। কেননা সমবেতভাবে যখন কুমারী মেয়েরা ব্রতপালন করে তখন তাদের মধ্যে আর হিংসা, রুষ্টভাব থাকে না। ব্রত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই সংঘবদ্ধতা আরো দৃঢ় হয়। শুধু তাই নয়, শাস্ত্রীয় ব্রতকথায় পুরুষ কিংবা পুরোহিতদের প্রাধান্য দেওয়া হলেও লৌকিক ব্রত মূলত নারী নির্ভর । এতেও পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রক্ষণশীলতারই পরিচয় পাওয়া যায়। আমরা জানি মাঝে মাঝে উপবাস থাকলে শরীর-স্বাস্থ্য-মন ভালো থাকে। উপরন্তু নারীরা যখন সারাদিন উপোস থেকে ব্রতপালন করে কিছু খায়, তখন তারা মানসিক দিক থেকেই একটু স্বস্তি পায়। কেননা প্রতিদিন সংসারের একইরকম কাজ করতে করতে একটু ভিন্নতা সকলেই পছন্দ করে। এছাড়াও ব্রতের দিন তাদের সংসারের কোনো কাজ করতে হয় না। উপরন্তু এই ব্রতের মধ্য দিয়ে নারীদের মনে ভক্তি, শ্রদ্ধা, ত্যাগ, তিতিক্ষা গড়ে ওঠে। যা সংসারকে সুখী করতে অনেকটাই সাহায্য করে। 'সংসার সুখী হয় রমনীর গুণে' এই প্রবাদের মধ্য দিয়েই যা স্পষ্ট। ব্রতকথার উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে নানান মতের পরিচয় পাওয়া যায়। নিচে এরকম কয়েকটি মন্তব্য তুলে ধরা হল—

১. 'বাংলার ব্রত' গ্রন্থে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন — ''নানা ঋতুর মধ্যে দিয়ে নানা সব ঘটনা মানুষের চিন্তাকে আকর্ষণ করেছে এবং এই-সকল ঘটনার মূলে দেবতা অপদেবতা নানারকম কল্পনা করে নিয়ে তারা শস্যকামনায়, সৌভাগ্যকামনায়—এমনি নানা কামনা চরিতার্থ করবার জন্য ব্রত করছে কী আর্য কী অন্যব্রত' সব দলেই, এইটেই হল ব্রতের উৎপত্তির ইতিহাস।''[৪০]

২. 'কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা' গ্রন্থের ভূমিকাংশে হিমাদ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য ও সুধীশঙ্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন —''সমাজে যখন স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না, তখন বিভিন্ন ব্রতের মাধ্যমে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল। ব্রত করে যে তাকে ব্রতী বলে। ব্রতী মানে কোন গুরুতর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণকারী। সংসারে বা পরিবারে মেয়েদের দায়িত্ব অসীম। তাদের ত্যাগ, আদর্শপরায়ণতা ও সেবাই সংসারকে সুখের করতে পারে। .... সুতরাং যাদের উপর সংসারের সুখ-দুঃখ ও ভালো-মন্দ নির্ভর করছে, তাদের শিক্ষা ও সাধনা ছাড়া এ দায়িত্ব বহন করা অসম্ভব তা সমাজ কর্তারা

জানতেন। তাই ব্রতগুলির সঙ্গীত, কথা, উপকথা ও কাহিনীর মধ্যে দেখা যায়, সংসারে কার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতে হয় এবং কিভাবেই বা ত্যাগ, কর্তব্যপরায়ণতা ও স্নেহশীলতার দ্বারা আদর্শ রমণী হওয়া যায় তারই প্রচ্ছন্ন আদেশ বা নির্দেশ। সুতরাং আদর্শ স্ত্রী শিক্ষার মাধ্যম এই ব্রতগুলির গুরুত্ব সমাজে যে কত গভীর ছিল তা সহজেই অনুমেয়। আগেকার দিনে মেয়ের পিতামাতা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন কার মেয়ে কতগুলি ব্রতানুষ্ঠান করেছে তার হিসেব রেখে।''[৪১]

৩. এছাড়াও ব্রতপালনের উদ্দেশ্য মহাভারতের শান্তিপর্বেও উল্লেখ আছে —

''শুদ্ধ চিত্তে ব্রত যেই করে আচরণ।
সব্ব দুঃখে তারে সেই পাপ বিমোচন।।''

ব্রত করতে গিয়ে নারীদের নিজস্ব কতগুলি রীতি নীতি আছে। যার আবার আরও কতগুলো ভাগ রয়েছে, নিম্নে উল্লিখিত ছকের মাধ্যমে তা দেখানোর চেষ্টা করা হল —

ব্রতকথার রীতি

শাস্ত্রীয় রীতি	লৌকিক রীতি
(দেব- দেবীর অলৌকিক শক্তিকে কোনো তুষ্ট করার জন্য শাস্ত্রীয় রীতি পালন করা হয়। সেখানে নারীদের প্রাধান্য কম থাকে।)	(অপদেবতা, প্রাকৃতিক শক্তি প্রভৃতিজাত যে ভীতি থেকে উদ্ধার হবার জন্য এই ধরণের ব্রত করা হয়ে থাকে। এই ধরণের রীতিতে প্রাধান্য বেশি থাকে।)

এই লৌকিক ব্রত সম্পর্কে বলতে গিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন — ''এদের গঠন এইরূপ- আহরণ, যেমন ব্রত করতে যা যা লাগবে তা সংগ্রহ করা; আচরণ, যেমন কামনার প্রতিচ্ছবি, আলপনা দেওয়া, পুকুরকাটা ইত্যাদি এবং কামনা জানিয়ে কামনার প্রতিচ্ছবি বা প্রতিকৃতিতে ফুল ধরা, শেষে যদি কোনো ব্রত কথা থাকে তো সেটা শোনা, নয়তো ফুল ধরেই শেষ কামনা জানিয়ে ব্রত সাঙ্গ। পূজারি এবং তন্ত্রমন্ত্রের জায়গাই এখানে নেই।''[৪২] অর্থাৎ ব্রতকথার গঠন ও অনুষ্ঠানগত দিক থেকে দেখলে এর চারটি অঙ্গের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় — কামনা, এই পর্যায়ে মূলত ব্রতীর উদ্দেশ্যের কথাই বলা হয়ে থাকে। দ্বিতীয়ত আহরণ বা ক্রিয়া অর্থাৎ কিভাবে ব্রতটি সম্পন্ন হবে, এবং কি কি উপায়ে হবে। শুধু তাই নয়, এতে ব্রতীকে নানান নিয়ম নিষ্ঠা পালন করতে হয়। যেমন উপবাস থাকা, পরিস্কার বস্ত্র পরিধান করা, আলপনা অঙ্কন করা প্রভৃতি। এক্ষেত্রে আলপনাগুলি প্রতীকী হয়ে ওঠে। কেননা প্রত্যেকটি নারীর কামনার সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই আলপনা অঙ্কন করা

হয়, যা বংশপরম্পরায় বহমান। আমরা জানি সভ্যতার সূচনা লগ্নে মানুষ শিকারজীবী ছিল, পরে তা কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় পরিণত হয়। তাই ক্রমশ আলপনার চিত্রও পরিবর্তিত হয়ে যায়। তীর, বল্লম, ধনুক এর পরিবর্তে লাঙ্গল, মই, দা, কুড়োল প্রভৃতি প্রাধান্য পায়। অর্থাৎ এই ধারাও আদিম সমাজ তথা আদিবাসী সমাজ হয়ে বর্তমান লোকমানসের মধ্যে পরিবর্তিত হচ্ছে। তৃতীয়তঃ ছড়া পাঠ করা, যার মধ্য দিয়ে কামনা ব্যক্ত করা হয় ও চতুর্থতঃ ব্রতকথা শোনানো।

সমগ্র বাংলায় অনেকগুলি ব্রতকথা প্রচলিত রয়েছে। তবে প্রত্যেকটি ব্রতকথার মধ্যে আবার বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করা যায়। উত্তরবঙ্গে এরকম ব্রতগুলির মধ্যে কাত্যায়নি ব্রত, সুবচনী ব্রত, তিস্তাবুড়ি ব্রত, ষাট ব্রত, বিপত্তারিনী ব্রত,মঙ্গলচণ্ডী ব্রত, কাতি ব্রত, শিবরাত্রি ব্রত, অথাই পাথাই ব্রত, নিস্তারিনী ব্রত প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তবে বেশিরভাগ ব্রতকথাতেই শিব ভিন্ন ভিন্নভাবে এসেছে। এগুলির মধ্যে শৈব ভাবনা উল্লেখ করে পাশাপাশি তৎকালীন সমাজ ভাবনারও পরিচয় দেওয়া হবে। ''প্রকৃতির রূপ পরিবর্তন, ঋতু পরিবর্তন, দিনরাত্রির পরিবর্তন, চন্দ্র-সূর্যের উদয় অস্ত, জীব-জন্তু বৃক্ষ-লতাদির জন্ম-মৃত্যু আদিম মানুষকে তার জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তুলবার জন্য আচারানুষ্ঠানের পত্তন করতে সাহায্য করেছে। মানুষ দেখল যে জলবায়ু ও ঋতুর দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তন নানা সমস্যা বা জটিলতার সৃষ্টি করছে। এই সমস্যা বা জটিলতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ধরিত্রীকে সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা করতে বা ধরিত্রীর উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য মানুষ যে সমস্ত উপায় আবিষ্কার করেছে বা পথ বেছে নিয়েছে তার মধ্যে ব্রত পালন একটি অন্যতম উপায়।''[৪৩] তবে এইসব ব্রত কথা যত বিচিত্রই হোক না কেন, আগাগোড়া তা ভারতীয় সনাতন নারীধর্মের আদলেই গঠিত। কেননা স্বামীর কল্যাণ, পুত্র কামনা বা পুত্রের কল্যাণ, উর্বরতা, অশুভ শক্তি বিতরণ এসব ব্রতকথাগুলির মূল বিষয়। নিচে উত্তরবঙ্গের প্রচলিত ব্রতকথাগুলি উল্লেখ করে সেখান থেকে শৈব ভাবনাকে দেখানোর চেষ্টা করা হল —

কাত্যায়নি ব্রত

পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলা নিয়ে উত্তরবঙ্গ নামক ভূ-খণ্ডটি গঠিত। প্রত্যেকটি জেলাতে একই রকম বা ভিন্ন ধর্মী ব্রতকথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। তবে কোচবিহার জেলায় প্রচলিত ব্রতকথাগুলিতে শিব প্রসঙ্গ বেশি লক্ষ্য করা যায়। কেননা এখানেই শিবের মাহাত্ম্য সর্বাধিক প্রচলিত। এর কারণ প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য লিখেছেন —'' যে সকল জাতির মধ্যে কৃষিকার্য প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে কৃষিকার্যের জন্য এক দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়া থাকে। কোনো কোনো জাতির মধ্যে ইনি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির দেবতা বলিয়া পূজিত হন। কোচ কৃষক

সমাজেই বাংলার লৌকিক শৈব ধর্মের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল বলে মনে হয়।''[৪৪] কোচ রাজাদের আমল থেকেই এই শৈবধারা কোচবিহারে প্রাধান্য পায়। এসব কারণে কোচবিহারকে শৈব সাধনার তীর্থও বলা হয়। শুধু তাই নয়, কোচবিহার জেলায় যেসব জাতি-জনজাতির বাস রয়েছে তাদের উপাস্য দেবতা শেষ পর্যন্ত হরগৌরীতে পরিণত হয়েছে। এবং এই হরগৌরী বিভিন্ন ব্রতকথার মধ্য দিয়ে যেন খেটে খাওয়া তথা একেবারে সাধারণ মানুষের আত্মার আত্মীয় হয়ে উঠেছেন।

'কাত্যায়নী ব্রত' কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতগুলির মধ্যে অন্যতম। বর্তমান এই ব্রতের প্রচলন আর তেমনভাবে চোখে পড়ে না। কিশোরী মেয়েরা যৌবনে উত্তীর্ণ হবার আগেই শিবের ন্যায় যেন স্বামী লাভ করে এই মনস্কামনা করে তারা। লোকবিশ্বাস ব্রতীরা দীর্ঘ ৪-৫ বছর ধরে যদি এই ব্রত পালন করেন তবে তাদের অভীষ্ট বস্তু সিদ্ধি লাভ হয়। এই ব্রত শাস্ত্রীয় হলেও কোচবিহারের নিজস্ব রীতি-নীতি ও ভাষায় তা যেন ঐ স্থানের নিজস্ব সম্পদ। শ্রীমদভাগবতের দশম স্কন্ধে আমরা এই ব্রতের পরিচয় পাই । সেখানে বৃন্দাবনের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাবার জন্য এই ব্রত পালন করেছেন। এই ব্রতের শিব চরিত্রের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের নানান দিক, পূজা পদ্ধতি, রীতি- নীতি প্রভৃতি বিষয় উঠে আসে।

কাত্যায়নী ব্রতকথার সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল বা মনসামঙ্গল কাব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মনে করা হয় এই ব্রতকথাগুলি থেকেই পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব হয়েছে। এই ব্রতে মঙ্গ লকাব্যের ন্যায় বন্দনা অংশ, গৌরীর বর প্রার্থনা এজন্য ঘটকের আগমন, হর গৌরীর বিবাহ, শিবের বিবাহ সজ্জা, শিবের বিবাহ যাত্রা, শিবের সজ্জায় মেনকার ক্রোধ এবং পরে মেনকা দ্বারা শিব বরণ, বিবাহ বাসর রাতে পাশা খেলা, বাসি বিয়ে, বিয়ে উপলক্ষ্যে ভোজনপর্ব, হিমালয় যাত্রা প্রভৃতি বিষয় এই ব্রতের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে। তবে প্রত্যেকটি বিষয়ই গানের মধ্য দিয়ে উঠে আসে। ব্রতের শুরুতে ব্রতীরা কাত্যায়নী মাতার উদ্দেশ্যে বন্দনা করে —

''রাম বল হরি বল ভাই মুকুন্দ মুরারী
পাপ তাপ দূরে যাবে বল হরি হরি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনী, কাত্যায়নী দুর্গে।।
রাম বল হরি বল ভাই এই বারে বারে
ওরে মনুষ্য দুর্লভ জন্ম না হইবে আর
জয় জয় দুর্গে দুর্গতি নাশিনী কাত্যায়নী দুর্গে।।''

এই ব্রত শুরু হবার পূর্বে অর্থাৎ আরোহণ পর্বে ব্রতীকে শেষ রাতে পুকুর থেকে জল আনতে হয়।

এরপর বালিকা ব্রতীদেরকে হাটে যেতে হয় মাটির বাস্কুম বা পূজার ঘট কেনার জন্য। মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আলাদা নিয়ম রয়েছে। এবং তার জন্য আলাদা আলাদা গানও রয়েছে। এই সময় ব্রতীরা যে গান করে তা অনেকটা এইরকম —

''ঊষা বালি হাটোৎ যায়রে
কাঁখে নয়া ডেলি
এচিয়া বেচিয়া কেনে ঊষা
বাস্কুম গোটা চারি।''

হাট থেকে বাস্কুম কেনা হলে তারা যখন ঘরে ফেরে তখন রাস্তার চৌকিদার তাদের আটক করে ঘুষ পাবার আশায়।

''বাস্কুম কিনুনু এ ভারও বান্দিনু
চৌকিয়ায় খোঁজে দান
স্ত্রী নারী হয়া রে
রাজাকো জানাইম রে
চৌকিয়ার কাটিম কান।''

আসলে কোচবিহারের রাজা ছিল প্রজাবৎসল। প্রজাদের দুঃখে কোচ-রাজারা সমব্যথী ছিল। এ কারণেই সমাজের প্রত্যেকটি পর্যায়ের মানুষের চোর, ডাকাত সম্পর্কে ভাবনা ছিল না। ফলে সমাজের নারীরাও বেশ মাথা উঁচু করে চলাফেরা করতো। যার পরিচয় পাওয়া যায় আলোচ্য ব্রতকথার মধ্যে। উষা বালির হাতে চৌকিদার মার খেয়ে ভয়ে পালিয়ে যায়। পরে উষাবালি ও সঙ্গীরা নির্ভয়ে বাড়ি ফিরে আসে। পথে চোর ডাকাত কিংবা চৌকিদারের ভয় নয়, ভয় হল রাস্তার পোকামাকড়ের। এজন্য উষাবালি ও তার সঙ্গীরা হাতে আলো নেয়। টিম টিম আলো নিয়ে রাতের অন্ধকারে ব্রতীরা জল আনতে যায়। কোনো ব্রতীর ঘুম থেকে উঠতে দেরী হলে বাকি ব্রতীরাই যেন সেই দায়িত্ব নেয়—

''উঠ উঠ বাস্কুম পানি তুলিবার যাই
বেলা নাই আরো পানি তুলিবার যাই।''

এভাবেই তারা সমবেতভাবে ঘাটে এসে পৌঁছায়। ঘাটে এসে জল তোলার স্থানকে নানানভাবে পরীক্ষা করে নির্বাচন করে—

''ইটা চন্দন খান পিশনু পাটে
বত্তি পানি তুলিবে কোন কোন ঘাটে

বত্তি পানি তুলিবে দক্ষিণ ঘাটে।''

জল তোলার সময় ব্রতীরা শঙ্খ, উলুধ্বনি দিয়ে ঘরে ফিরে আসে।

কাত্যায়নী ব্রতে পূজার স্থানকে বলা হয় সুকর । কলা গাছের খোল, ময়না গাছের ডাল, শোলা ইত্যাদি দিয়ে এই সুকর বা মঞ্জুসা সাজাতে হয়। তবে এই মঞ্জুসার ব্যবহার এখন আর হয় না। ৫০/৬০ বছর আগেই এই মঞ্জুসার ব্যবহার উঠে গেছে। তাই বর্তমান ব্রতীরা ভিন্ন বিষয়ের আশ্রয় নেয়।

''সুকরের কোলাতে দেও নেউচ পাতাখান
সুকরের কোলাতে দেও কলা জোড়া
সুকরের কোলাতে দেও গুয়াপান জোড়া
সুকরের কোলাতে দেও ঘিয়ের বাতিটা
সুকরের কোলাতে দেও ময়ুর পকিটা।''

কিন্তু কাত্যায়নী হল ভূমি দুর্গা। ভূমিতেই এই পূজার বিস্তার। বসুমতী মায়ের কাছে ভূমি প্রার্থনা না করলে তিনিই বা ভূমি দেবেন কেন? তাই ব্রতীরা বসুমতী মায়ের কাছে ভূমি প্রার্থনা করে।

''আটআঙ্গুল মাটি বসুমতী আই
বাসকুম থুবার মাগোং ঠাই
ধনজন সম্পদে বাড়িয়া যাই
শাঁখায় সেন্দুরে কাল কাটাই
জন্ম আয়তার কাল কাটাই।।''

ব্রতীদের সুকর গড়া শেষ হলে এবং পুকুর কাটা হলে পুরোহিত আসে। পুরোহিত প্রসঙ্গ থেকেও আমরা বুঝতে পারি এটি শাস্ত্রীয় ব্রত। পুরোহিত বা গোঁসাই আসার সময় ব্রতীরা কিভাবে তাকে বরণ করবে তার চিত্রও এই গানের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে —

''আসেন তো গোঁসাই আমতলে
বসেন তো গোঁসাই জামতলে
গোঁসাই আসিলে মুই কি করিম
অষ্ট দুর্গা দিয়া আগবারিম।
গলায় নগুন পাটা কপালে ফোটা
ঐ আসিলেন গোঁসাই বামনের বেটা।
গোঁসাই আসিলে মুই কি করিম

সুগন্ধি জল দিয়া চরণ ধোয়াইম।।''

—এর মধ্য দিয়ে অতিথি যে দেব সমান তার পরিচয় পাই। যা তৎকালীন সমাজের নারী আচারের কথাই প্রমাণ করে। এরপর আমরা লক্ষ্য করি কাত্যায়নী মাতার হিমালয় থেকে পূজা স্থানে আসার প্রসঙ্গ।

''আজি না সুকরের ঝিকি না মিকিরে
এতদিন আছিলেন কোটে
এতদিন আছিনু হিমালয় পর্বতে
ও আদরী নামাইচে মোকে।''

এভাবেই কাত্যায়নী দেবীকে মর্ত্যে আগমন করিয়ে ব্রতীরা তার পূজা করে। এরপর শুরু হয় কাত্যায়নী পুজা। দই, ক্ষই, চিড়া, কলা, সন্তরা, বাতাসা ইত্যাদি এই পূজার উপকরণ।

''বন্দ্যে কাত্যায়নী মাতা ব্রহ্মার জননী মাগো
ব্রহ্মার জননী
কি দিয়া পূজিব মাগো চরণ দু'খানি
মাগো চরণ দুখানি।
পুষ্প দিয়া পূজিব মাগো ভ্রমরায় মধু খায়
মাগো ভ্রমরায় মধু খায়
কি দিয়া পূজিব মাগে দেহ তার উপায়
মাগো দেহ তার উপায়।''

পূজা শেষ হলে ব্রতীরা সারারাত ধরে দেবীর নিকট বর প্রার্থনা করে। এতে ব্রতীরা সারারাতে চারপ্রহর ধরে চারটি বর কামনা করে।

''আই সাঁজোর ঘর খানি খইরকা দুয়ারী
বত্তি লোকে বর মাগে হাটু জোর করি।
এনা বত্ত করিলে কেনা বর পাই
বাপ মাও বান্ধব তাকে পাই।

নদী কুলিও নদী কুলিও তপচি আকুল কূল
মহামায়া যে বত্ত করে লোকে বলে ভাল
শাঁখা সেন্দুর ধনে জনে জনম আয় তায় যাউক সর্বকাল।''

পূজা শেষ হলে সারারাত্রি ধরে ব্রতীরা দেবীর নিকট বর প্রর্থনা করে।

''আই সাঁজোর ঘরখানি খইরকা দুয়ারী
বত্তিলেক বর মাগে হাটু জোড় করি।
এনা বত্ত করিলে কেনা বর পাই
বাপ মাও বান্ধব তাকে পাই।
এনা বত্ত করিলে কেনা বর পাই
শ্বশুর শাশুড়ী তাকে পাই
জনম আয়ত্যে কাল কাটাই
সুখে সম্পদে কাল কাটাই।

সাত বৎসর হাতে দুর্গাদেবী আরাধন তোমাকে
বাপ-মাও ভাই-ভাউজে দুর্গাদেবী বাড়ান আমাকে।
সাতবৎসর হাতে দুর্গাদেবী আরাধন তোমাকে
শ্বশুর-শাশুড়ী দেওর ভাসুর সৈত্যে বাড়ান আমাকে।''

এই বর প্রার্থনার মধ্যে দেখি ব্রতীরা যেন শ্বশুরকুলে গিয়ে নতুন কাপড়, পুরাণ ধানের ভাত খেয়ে দিন কাটাতে পারে; বাবা-মা ও ভাই বৌ, ননদ সকলকে নিয়ে যেন একসঙ্গে থাকতে পারে; শাঁখা সিঁন্দুর স্বামী, পুত্র নিয়ে যেন সুখে সংসার করে — এই চিত্রই ফুটে ওঠে। এভাবেই পূজা শেষ হলে, বর প্রার্থনা শেষ হলে বাকি রাতটুকু কাটানোর জন্য ব্রতীরা হর-গৌরীর বিবাহ সংক্রান্ত গান গায়। সেইসব গানের মধ্য দিয়ে শিব কিংবা গৌরীকে স্বর্গের দেবতা বলে মনে হয় না, সেখানে যেন তারা মর্ত্য পৃথিবীর মানব মানবীতে পরিণত হয়েছেন। সেখানে দেখি গৌরী শিবকে পাবার জন্য কঠিন তপস্যা করেছে। শিবকে পতি হিসেবে পাবার জন্য সে সব কিছু করতে রাজি।

''পর্বতে বসিয়া গৌরী জোর করি কয়
গৌরী জোর করি কয়
মহাদেবের চিন্তা করি, মহাদেবের ধ্যান ধরি
মাগে গৌরী বর যে মাগে গৌরী বর
পশুপতি পতিদেহ ওহে বিশ্বেশ্বর হে
ওহে বিশ্বেশ্বর।

কাত্যায়নী ব্রতের সঙ্গে আমরা মিল পাই মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুর্গা চরিত্রের মধ্যে।

কেননা সেখানেও দুর্গা শিবকে পাবার জন্য কঠিন তপস্যায় ব্রতী হন। যা অন্যান্য মঙ্গলকাব্য বিশেষ করে মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় নেই। মানিক দত্ত সেখানে দুর্গা চরিত্রের এই দিকটির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—

''শিবকে স্বামী করিতে দুর্গার বাসনা।
অন্নজল ছাড়ি তপ করত্র কামনা
শিব বলি করত্র স্তবন।
শীতের সময় কৈল জলতে সঅন।।
গ্রীষ্মকালে দুর্গা মাতা কুন কম্ম কৈল।
চতুর্দিকে অগ্নিজ্বালি মধ্যে বসি রৈল।।
কঠিন তপস্যা দুর্গা অনেক করিল
তুষ্ট হয়্যা শিব ঠাকুর বর দিতে আল্য।।''

গৌরীর এমন প্রার্থনায় ভগবান ব্রহ্মা বাধ্য হয়ে ঘটক রূপে নারদকে পাঠায় হিমালয় গৃহে। এই ঘটক প্রার্থনা এখনও উক্ত অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রচলিত আছে। নারদ হিমালয় গৃহে এসে গৌরীর সঙ্গে শিবের বিবাহের প্রস্তাব দিলে হিমালয় না করতে পারেন নি।

''হর গৌরীর বিয়া হবে ব্রহ্মা পাঠাইল মোরে
ব্রহ্মা পাঠাইল
শুনি রাজারাণী বড় হরষিত হইল রে
হরষিত হইল
আনন্দেতে মুনির চরণ মাথায় তুলি লইল রে
মাথায় তুলি লইল।''

এরপর আকাশবাণীর ঘোষণা শুনে হিমালয় ও মেনকা স্থির হয় যে কৈলাস পর্বতে যে শিব বসবাস করে তার সঙ্গেই উমার বিবাহ হবে। লক্ষণীয় এই আকাশবাণী প্রসঙ্গও পরবর্তীকালে বিভিন্নভাবে মঙ্গলকাব্যগুলিতে স্থান লাভ করেছে। অন্যদিকে কৈলাস পর্বতে শিবের চামুণ্ডা তথা ভক্তগণ শিবের বিবাহ দিতে না পেরে চিন্তিত। কেননা শিবকে বিবাহ দিতে না পারলে এ সংসারে সুখ-শান্তির অভাব ঘটবে।

''শিবের চেলা চামুণ্ডাগণ
রহে বিরস বদন
শিবের বিয়াও যদি নাহি হয়

না হবে সুখ শান্তি এ জগতে
কেমনে হবে মহাদেবের বিয়া রে।''

এমন সময় নারদ শিবের কাছে সেই প্রস্তাব দিয়ে বিয়ে ঠিক করে।

''কালি হবে তোমার বিয়াও
জানহ নিশ্চয়।''

বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে গন্ধ অধিবাস পর্বের প্রস্তুতি চলতে থাকে। আমরা জানি কোচবিহার জেলার রাজবংশী বা অন্যান্য জাতি-জনজাতির বিবাহের পূর্বে গন্ধ অধিবাস পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে বরপক্ষ থেকে নানান সরঞ্জাম কন্যা গৃহে পৌঁছে দেওয়া হয়। আলোচ্য কাত্যায়নী ব্রতেও আমরা শিবের এই গন্ধ অধিবাস পর্ব দেখি, সেখানে শিবের পক্ষ থেকে নানান সরঞ্জাম উমা গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। যা ব্রতীনীদের গানের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট। এই পর্বটির মধ্যে নাটকীয় ভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন বরপক্ষের যারা এই অধিবাসের সরঞ্জাম নিয়ে যায় তারা গিয়ে কনে পক্ষের বাড়িতে বলে —

''কায় আচেন ঋষির ঘরে ভাগি দায়া দি
তায় আসি বুজি নেও ভার ভাড়াটি।''

উল্লেখ্য 'ভাগিদায়া দি' বলতে আত্মীয়-স্বজনদের কথা বলা হচ্ছে। এর উত্তরে কনে পক্ষ থেকে এয়ো নারীরা এসে সেই ভার গ্রহণ করে।

''আঁচলে চাপিয়া আরো মঙ্গল ভাড় লইল রে
মঙ্গল ভাড় লইল
দৈর ভাড়ে হাত দিয়া ননীতে ভরিল হাত
ওহোরে আজি গৌরীর গন্ধ অধিবাস রে।''

শুধু দৈ নয়, শাঁখা, সিঁন্দুর, গন্ধতেল, কাপড়ের ভাড়, পান - সুপারি, মাছ, বিভিন্ন ফল প্রভৃতি দিয়ে গৌরীর গন্ধ অধিবাস পর্ব সমাপ্ত হয়।

এরপর একদিকে যেমন শিব বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হয়, অন্যদিকে তেমনি উমাও বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হয়। শিবের এই সাজের বর্ণনাও ব্রতীদের গান থেকে বাদ যায় নি —

''নদীর রে পারে পারে রে
চম্পা ফুলের সারি
গন্ধে মহো মহো করে
ওরে তার তলে বসিয়া রে সদা শিব

পুরোহিতসাজন করে
নদীর রে পারে পারে রে
ক্যাঁওয়া ফুলের সারি
গন্ধে মহো মহো করে
ওরে তার তলে বসিয়ারে সদা শিব
সদেশ্য সাজন করে।''

এই ভাবে শুধু শিব নয়, পুরোহিত, বৈরাতী, হাতি, শিবের বাহন বৃষ, পাল্কী প্রভৃতিও সাজতে ব্যস্ত থাকে। শিবের সজ্জা শেষ হলে বিবাহ সভায় আগমন ঘটে এবং সেখানে নতুন বরকে দেখার জন্য এয়ো নারীদের ভিড় জমে যায়। সেইসব এয়ো নারীরা বর শিবকে দেখে নানান মন্তব্য করতে থাকে। কেননা বিবাহ সভায় বরের শিঙ্গা বাজানো এর আগে এয়ো নারীরা দেখেনি।

শুধু তাই নয়, এইসব এয়ো নারীরা যখন শিবকে বরণ করতে যায় তখন শিবের জটা থেকে সাপে ছোবল দেয়। তাইতো তারা একে অপরকে কানা-কানি করে বলতে থাকে —

ও মাইগো চলো দেখি গিয়া
কোন্ কালে দেকিছেন মাইগো বরে বাজায় শিঙ্গা
বরও নোয়ায় টরও নোয়ায় বাদিয়ার পো
মাথায় ডাঙ্গর জটা সাপে মারে ছোঁ।
* * * * *
ও দিদিগো চলো দেখি গিয়া
কোন কালে দেখিছেন দিদি বরে বাজায় শিঙ্গা
বরও নোয়ায় টরও নোয়ায় বাজিকরের পো
কপালে তিলক দিতে সাপে মারে ছোঁ।''

শিবের এইরূপ দেখে এয়ো নারীরাও ছাড়ার পাত্র নয়। তারাও শিবকে উচিৎ শিক্ষা দিতে চায়। এজন্য তারা সাপ তাড়ানো এক প্রকার গাছের মূল নিয়ে এসে শিবের কাছে যায়। ফলে সাপ সেই মূলের গন্ধ পেয়ে পালিয়ে যায় এবং শিব উলঙ্গ হয়।

''কইনার ঘরের বৈরাতী কিবা গুণ জানে
চাঁদো ভাদো ঈশোর মূল খোপাৎ গুজি আনে।
পাইয়া ঔষধের গন্ধ পালায় ভূজঙ্গ
সভার মাঝেতে শিব হইল উলঙ্গ।''

লক্ষণীয় ওঝালী প্রথা সেই সময়ও যেমন কোচবিহারে প্রচলিত ছিল তেমনি বর্তমানেও আছে। জানা যায় একপ্রকার গাছের শিকর নিজের শরীরে তাবিজ করে পড়লে সাপ কাছে আসে না। এখানে এয়ো নারীদের মধ্য দিয়ে এই সংস্কার বা লৌকিক ঔষধের ব্যবহার দেখানো হয়েছে।

শিবের এই উলঙ্গ অবস্থা দেখে গৌরীর মা মেনকা লজ্জিত হয়ে পড়ে। গিরিরাজ হিমালয় এমন পাত্রের সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ ঠিক করার জন্য মেনকা তাকেও গালি দেয়। সেখানে মেনকা ঠিক করে যে মেয়েকে সে স্বেচ্ছায় গঙ্গা জলে ভাসিয়ে দেবে কিন্তু তবু এমন পাত্রের হাতে কন্যাদান করবে না।

''কুত্তি গেলু গৌরীর বাপ তোর উপুরাঙ পাকা দাড়ি
গৌরীর বাদে আনলু তুই বর উলঙ্গ পাগলী
হাত পাও বান্দিয়া গৌরীক ফেলাইম গঙ্গা জলে
তবুও না দিম গৌরীক নেংটিয়া শিবের ঘরে।''

প্রত্যেকটি মা চায় কন্যাকে রাজকুমারের সঙ্গে বিয়ে দিতে, যেখানে তার কোনো দিন অন্ন কষ্ট, বস্ত্রের জন্য চিন্তা করতে হবে না। শিব যেখানে নিজেই সাপ দিয়ে ব্যঘ্রচামরা পরিধান করে বিবাহ করতে আসে, সেখানে সে স্ত্রীর দায়িত্ব কিভাবে পালন করবে। তাইতো মেনকা চিন্তিত। স্বামীকে সে কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে—

''মেনকা কাঁদিয়া কয় শুন প্রভু মহাশয়
এহেন বরে না দিমু গৌরীক বিয়া
না দিমু গৌরীক এবছরে
পর বছর দিমু গৌরীক রাজার কুমারে।''

মেনকা শুধু হিমালয়কে তিরস্কার করেনি, নতুন জামাতা শিবকেও সে গালা-গালি করেছে। তাকে বিবাহ সভা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ব্রতীদের গান থেকে তা স্পষ্ট —

''ও পাগলা শিব তুই ফিরিয়া যা তোর ঘরে
ও নেংটা শিব তুই ফিরিয়া যা তোর ঘরে
হাতে গলায় বান্ধিয়া গৌরীক ফেলাইম গঙ্গা জলে
তবুও না দিম গৌরাইক ঐ নেংটিয়া শিবের ঘরে।''

লক্ষ্যণীয় ব্রতকথার এই চিত্র মধ্যযুগের প্রায় প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়। জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্যেও এই চিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেও আমরা দেখি মেনকা শিবকে বরণ করতে গেলে সাপ ছোঁ মেরে ওঠে, শিব উলঙ্গ হয়। শিবের এই চিত্র দেখে মেনকাকে

লজ্জায়, রাগে ঘৃণায় ক্ষত বিক্ষত হয়ে বলতে শুনি —

''মর মর ঋষি তোর চক্ষে পড়ুক ফুল।
দেখিয়া আনিলে বর উন্মত্ত বাউল।।
বোল গিয়া জামাই ফিরিয়া যাউক ঘরে।
সোনার পুতলী গৌরী না দিব বুঢ়া বরে।।
তবে যদি ঋষি গৌরীকে দিবে বলে।
হাতে পায়ে বান্ধিয়া ফেলিব গঙ্গা জলে।।''

কাত্যায়নী ব্রতে মেনকা শিবকে এমনটাই তীব্রভাবে তিরস্কার করেছেন যে শিব তাতে অসন্তুষ্ট। এটা যে শিবের আসল মূর্তি নয়, তাই সে নিজ রূপ ধারণ করে। গৌরী তো জানে শিব ত্রিগুণাতীত, সে মহাদেব। তাই নিজেই শিবকে সন্তুষ্ট করতে চায়। কিন্তু শিব মেনকার অসম্মানের কথায় সন্তুষ্ট হতে চায় না। পরে গৌরী ভিন্ন উপায় পালন করে এক সন্ধি স্থাপন করে। যাকে বলা হয় গাজন সন্ধি। এই সন্ধির পরেই শিব নিজ রূপ ধারণ করে।

''হাঙ্গোরত মুখ দিয়া গৌরী বুঝায়
কি রূপ ধরিছেন প্রভূ জননী ডরায়
এই রূপ ছাড় প্রভূ নিজ রূপ ধর
তবে সেনে হবেন প্রভূ ঋষির ঘরের বর
কর্ণপাতি গৌরীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন
দেখিতে দেখিতে হইলেন ভূবন মোহন।

ভবময়ীর রূপ দেখায়া পার হয়েছে মহাকাল
কর্ণপাত গৌরীর বাক্য শুনি ত্রিলোচন
দেখিতে দেখিতে গৌরী ভূবন মোহন।''

এভাবে শিব যখন তার নিজ বেশ ধারণ করেন, তখন মেনকা তাকে জামাই হিসেবে বরণ করেন। শুধু তাই নয়, কোচবিহার জেলার রাজবংশীদের লোকায়ত রীতি অনুসারে শিব পার্বতীর বিবাহ সমাপ্ত হয়।

''স্বর্গ হইতে সকল গন্ধর্ব আসিল।
হাম্বই ডাম্বই বিয়ায় বসিল।
সকল অপ্সরাগন নাচিতে লাগিল।।

হর গৌরী বিয়াত বসিল।

মন্ত্রপাঠ করি গিরিরাজ কন্যা সম্প্রদান করিল।।''

এরপর আমরা দেখি বাসর ঘরে হর-গৌরীর পাশা খেলা, তাদের বাসি বিয়ে, সাধারণ লোকের ভোজনপর্ব, যৌতুক দান প্রসঙ্গ প্রভৃতি। সাধারণ লোকের ভোজনপর্বে রসগোল্লা, দই, সন্দেশ, মণ্ডা, নাড়ু, ক্ষির, সন্দেশ, মালপোয়া, মাখন, দুধ প্রভৃতি খাদ্যের কথা উল্লেখ রয়েছে। যৌতুক তথা কন্যার পণ দেবার রীতি সেই সময় থেকেই যে প্রচলিত ছিল তা এই ব্রতের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। কেননা সেখানে উল্লেখ রয়েছে —

''দান দেয় দান দেয় কইনার বাপ

মণিমুক্তা দিলেক দান নাই তার নেকা জোকা

দান দেয় দান দেয় কইনার মাও

ধন রত্ন অলঙ্কার কতেক দিলেন দান।''

এইভাবে দেখি মেয়ের জ্যাঠা, জেঠিমা, কাকিমা, পিসিমা, মাসিমা প্রমুখেরা সকলেই বরকে যৌতুক দান দেয়।

বিয়ের শেষে বিদায় নেবার পালা। মা মেনকার কোল খালি করে গৌরী চলে যাবে। এমন সময় প্রত্যেক বাবা মায়ের মন ব্যথাতুর থাকে। হিমালয় মেনকাও সেদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য বাবা মায়ের মতো তাদের চিন্তা কি করে সাত বছরের কন্যা স্বামীর ঘর সংসার করবে কিংবা শিশু মেয়ে যে কিনা কাম রতি সম্পর্কে কিছুই জানে না, সন্ধ্যে হলে ঘুমে কাতর হয় সে কি করে স্বামী সঙ্গ করবে। তবুও তো কন্যাকে স্বামী গৃহে যেতে হবে। তাই মা মেনকা মেয়ের বিদায় পর্বে ভালো করে বুঝিয়ে দেয় সংসার ধর্ম পালনের কথা—

''শ্বশুর শ্বাশুড়ীর সেবা করিস ভালো মনে

তোর লাগি দুঃখ তারা না পায় মনে

দেওর ননদে তুষিবি ভাই-বোন সম যতনে

আরো যত আছে তুষিবি হাসি মুখে

স্বামীরে তুষিবি হাসি মুখে দুঃখ না পায় মনে।''

এ চিত্র যেন মেনকার নয়। এ যেন বাঙালী মায়ের করুণ আর্তি। প্রত্যেক বাবা মায়ের আশা আকাঙ্খা এই ব্রতের মধ্য দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এছাড়াও তৎকালীন সমাজের নানান রীতি-নীতি, প্রথা, কুসংস্কার, সামাজিক দিক, রাজনৈতিক দিক এই ব্রতের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়েছে। সামন্ত্রতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের স্থান ঠিক কোথায়, বাস্কুম কেনার মধ্য দিয়ে তার চিত্র পরিস্কার

হয়েছে। এছাড়া একটি অবিবাহিত মেয়ের যে নিজস্ব চাওয়া পাওয়া, স্বামী মনকে বুঝিয়ে চলা তাও এখানে বাদ পড়েনি। এছাড়াও শিব চরিত্রকে এখানে যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তাতে তাকে আর স্বর্গের দেবতা বলে মনে হয়নি। মর্ত্য পৃথিবীর মানুষ ছাড়া তাকে দেবতা হিসেবে এখানে ভাবাই যায় না।

ব্রতকথা শেষ হলে রাত্রি প্রভাত হয়। ব্রতীরা তখন বাস্কুম, সুকর সব কিছু নদী জলে ভাসিয়ে দেয়। এটিও একটি করুণ হৃদয় বিদারক ঘটনা।[৪৫]

সুবচনী ব্রত কথায় শিব প্রসঙ্গ

কাতিপূজা, সুবচনী পূজা, যাইটোল বিষহরি প্রভৃতি প্রত্যেকটিই হল উত্তরবঙ্গের জনপ্রিয় ব্রতকথা। এগুলিতে শিব প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেই, কিন্তু এদের সঙ্গে শিবের একটি সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে। আর এই সম্পর্কের নিরিখেই এইসব পূজার গানে শিব মাহাত্ম্য এসে গেছে। এইসব গানের সুর ভাওয়াইয়ার চটকা এবং দরিয়ার মতো।

সুবচন অর্থাৎ সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর যে দেবীর, তারই নাম সুবচনী। এই দেবী মূলত চণ্ডীরই এক রূপ বলে মনে করা হয়। পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে ভক্তের কল্পনায় মঙ্গলময়ী দেবী দূর্গাকে বারবার নতুন রূপে মর্ত্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। সুবচনী সেই নানান রূপের মধ্যে একটি। তাই এই সুবচনীর সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেবের একটা সম্পর্ক রয়েছে। সদা সত্য কথনরূপী এই দেবী অখণ্ড বাংলায় প্রায় সর্বত্র পূজিত হতেন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায় পূর্ববঙ্গীয় বা স্থানীয় সধবা হিন্দু নারীরা এই দেবীর ব্রত করে থাকেন। এই পূজা সাধারণত দুই ভাবে করা হয়। মূর্তিপূজা এবং ঘট পূজা। যে ভক্ত যেভাবে মানত করে সেই ভক্ত সেইভাবে পূজা করে। সাধারণত বাড়ির উঠানে যেখানে পূজা করা হয় সেখানে চারটি কলাগাছ পুঁতে তাঁর গোড়ায় ঘট রেখে এই পূজা করা হয়। অন্যদিকে মূর্তিপূজায় আমরা দেখি দেবীর বাহন হাঁস। দেবী চণ্ডীর ন্যায় এই দেবীর দুই হস্ত বিশিষ্ট। দেবীর কোলে একটি কন্যা সন্তান দেখা যায়। একে 'পুতলা' বলা হয়। এবং দেবীর দুদিকে আরো দুটি মূর্তি দেখা যায়, এদেরকে লোকায়ত সমাজ 'নেবরা', 'নেবেরি' বলে। বিশেষ করে শুভ বিবাহ, অন্নপ্রাশন, অন্তঃস্বত্ত্বা নারীর শুভ কামনায় এই দেবীর পূজা করা হয়। এই পূজার নির্দিষ্ট কোনো দিনক্ষণ নেই। তবে কোচবিহার জেলাতে বৈশাখ মাসেই এই পূজার বেশি প্রচলন দেখা যায়। কারণ এই পূজার একটি অবশ্যম্ভাবী উপাদান হল 'কাঁচা সুপারি' যাকে বলা হয় 'গুয়া'। এই উপাদান এই সময়েই বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় বলে বৈশাখ মাসে এই পূজা বেশি হয়।

এই পূজার আয়োজন উপলক্ষে স্থানীয় গীদালীদের নিয়ে আসা হয়, এবং এরা সারারাত ব্যাপী এই পূজার নৃত্যগীত পরিবেশন করে থাকেন। এতে মূল গীদালীর সঙ্গে দোহার থাকে, যারা মূল গীদালীকে গানে সহযোগিতা করে। বাদ্যযন্ত্র হিসেবে থাকে ঢাক এবং কাঁসি। এর মধ্য দিয়ে সুবচনী পূজা প্রচার ও মাহাত্ম্যের কথাই সাধারণত ব্যক্ত করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে যে স্থানে 'শিব' এর কথা আছে এখানে শুধু ততটুকু অংশই উল্লেখ করা হল —

"নম নম নম ফুল শিবেরও ইস্তিরি
শিবে যে সিজাইচে ফুল তোলে পার্বতী
ফুল তোলে হাতে ফুল তোলে মাথে
এক মালী বাড়ায় ফুল কালী মায়ের নামে,
কি হায়রে হায়।
নম নম নম ফুল শিবেরও ইস্তিরি
শিবে যে সিজাইচে ফুল তোলে পার্বতী
ফুল তোলে হাতে ফুল তোলে মাথে
এক মালি বাড়ায় ফুল বিষহরির নামে
কি হায়রে হায়।"[৪৬]

এভাবেই গীদালেরা শিবের বন্দনা করে সুবচনীকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন এবং পূজা পাঠ করেন।

ষাইটোল বিষহরি ব্রতকথায় শিব প্রসঙ্গ

সুবচনী পূজার মতোই বিষহরি পূজার গানে ও ব্রতকথাতেও শিব প্রসঙ্গ চলে আসে। আসলে লোকায়ত এইসব দেব-দেবীর সঙ্গে শিবের একটা সম্পর্ক স্থাপন করে এদেরকে উচ্চ আসনে বসানো হয়েছে। কেননা শিব দেবাদিদেব, তাকে সকলেই মান্য করে, এ নিয়ে অবশ্য সমাজের নানান মিথও প্রচলিত আছে।

বিষহরি এমনই এক দেবী, যার উল্লেখ হয়তো প্রাচীন কোনো শাস্ত্রে নেই। যে দেবী উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সমাজের মনের মণিকোঠায় অবস্থান করে আছেন। সাধারণত শোলার নির্মিত মূর্তিতে এই দেবীর পূজা হতে দেখা যায়। এই পূজা এখন উত্তরবঙ্গের মানুষের লোকাচারে পরিণত হয়েছে। কারণ বিয়ের আগে এই পূজার আবশ্যিক রীতি রয়েছে। স্থানীয় রাজবংশীদের মধ্যে, আবার বিয়ের পরে বরবধূ প্রথম এই দেবীকে প্রণাম করে গৃহে প্রবেশ করে। এর মূল উদ্দেশ্য নবদম্পতির দাম্পত্য জীবন সুখী হওয়া। শুধু বিবাহ নয়, সারা বছর ধরে অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধ,

এবং নানান আপদে-বিপদে এই দেবীর পূজা করা হয়। এছাড়া শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন ঘরে ঘরে ঘটা করে এই পূজা করা হয়। উত্তরবঙ্গে এই পূজা দুইভাবে হতে দেখা যায়। যথা — ১) পারিবারিক পূজা এবং ২) মারাই পূজা বা গীদালী বিষহরি পূজা। প্রথম শ্রেণীর পূজা গৃহস্থের সার্বিক উন্নতির উদ্দেশ্যে করা হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পূজায় নব দম্পতির পারিবারিক সুখ কামনা করা হয়।

কোচবিহার জেলায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে দেবী ষষ্ঠীকে যাইটোর বিষহরি বা যাইটোল বিষহরি বলা হয়। এতে ষোলটি কলা, ষোলটি বেলপাতা ও তুলসীপাতা প্রভৃতি প্রয়োজন। তবে 'বিচেকলা' এই পূজার আবশ্যিক উপাদান। এ প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার বিখ্যাত যাইটোর বিষহরির গায়েন 'ফুলতি গীদালী' বলেন —

''যাইট মাও যাটিয়া
কলা খায় আটিয়া।''

এই পূজার সঙ্গে নাচ ও গান যুক্ত। অন্যান্য পূজার গানের মতো এই পূজায় গানেও এই দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়। এই দেবী মূলত মনসা। বিভিন্ন ধরণের নাচ ও গানের মধ্য দিয়ে এই দেবীর মাহাত্ম্যকে বর্ণনা করা হয়। মনসা যেহেতু শিবের কন্যা তাই শিবের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে আর সেই সম্পর্কটুকুকে ব্যক্ত করতেই বিষহরি গানে শিব প্রসঙ্গ এসে যায়। এখানে সেই গানের শিব প্রসঙ্গ অংশটুকুই উল্লেখ করা হল—

''বন্দোং বিষহরি দেবী শিবের কুমারী হে
বন্দোং বিষহরি দেবী শিবের কুমারী।
তোমার চরণে সেবি মা জোড় করি পানি
বন্দোং মনসা দেবী হায়।।
শিবের ঔরসে জন্ম তুমি হায় নাগ মাতা হে
তুমি মাগো ত্রিনয়নী বড়ই ভাগ্য দাতা
বন্দোং বিষহরি দেবী হায়।।

শিবের ঔরসে জন্ম মা পাতাল ভুবনে হে
পূজা খাইতে নামেক মা তুই মাড়েয়ার মণ্ডপে
ব্রহ্মার দুর্লভ রথ লাগিয়াছে ঘাটে হে
বন্দোং বিষহরি দেবী হায়।''[৪৭]

এখানেই শিবের সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। মনসা যে শিবের ঔরসজাত সন্তান তা

উক্ত গান থেকেই স্পষ্ট। আবার ঐ গানেরই আর এক স্থানে বলা আছে শিব কন্যা মনসাকে দেখে কিভাবে কামানলে আসক্ত হন। এই বিষহরির গান প্রসঙ্গে সমাজে একটি মিথ প্রচলিত আছে। যে মিথের বশবর্তী হয়েই বিষহরি গানের এত আয়োজন। মিথটি থেকে জানা যায় যে দেবাসুর কর্তৃক সাগর মন্থনের কাহিনী। সমুদ্র মন্থনের ফলে যে বিষ উঠেছিল তা পৃথিবীর সমস্ত বিষাক্ত সাপের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপরে কিছু বিষ বাকি থাকে যার অর্ধেক সিঙ্গি ও ট্যাংরা মাছের মধ্যে এবং বাকি অর্ধেক শিব নিজে পান করেন। শিব নিজে পান করে নীলকণ্ঠ হননি। তিনি শুধু সাময়িকের জন্য অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এতে স্বর্গের বাকি দেবতারা বড় দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। পরে অবশ্য দেবতাদের চেষ্টায় শিব সুস্থ হন। অর্থাৎ শিবকে বাঁচাতে সমগ্র দেবতার এই সময় প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বিষহরি গানের উদ্দেশ্যও অনেকটা এরকমই। সমাজ সংসারে কেউ যদি এভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে এই গানের মধ্য দিয়ে সমস্ত দেবতাদের আহ্বান করা হয়। পরে সেই আহ্বানে সমস্ত দেবতারা এলে অসুস্থ রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। এককথায় সমস্ত দেবতাকে সামনে রেখে, সন্তুষ্ট করে সংসারের অকল্যানকে দূর করে কল্যান ডেকে আনার উদ্দেশ্যেই গৃহে গৃহে ষাইটোর বিষহরি গান গাওয়া হয়।

কাতিপূজার ব্রতে শিব প্রসঙ্গ

কাতিপূজার গান মূলত কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বেশি প্রচলিত। নারী আচার সর্বস্ব এই গানে মাঝে মাঝে নৃত্যও পরিবেশন করা হয় । এতে দেব সেনাপতি কার্তিকের জন্ম থেকে শুরু করে অনেক কথাই বলা হয়। কার্তিক মাসেই এই পূজা করা হয়। মহিলারা সারাদিন উপোস থেকে এই কার্তিক পূজা করেন। কোথাও ময়ূর বাহনা কার্তিক আবার কোথায় ঘট পূজা করা হয়। মূলত এটি ব্রতকথা। পূজা উপলক্ষে যে গান পরিবেশন করা হয় সেখান থেকেই কাতি ঠাকুরের বৃত্তান্ত জানা যায়। প্রাচীনকালে শস্যদেবতা হিসেবে কাতি ঠাকুরের আরাধনা করা হলেও পরবর্তীকালে পৌরাণিক কাতি ঠাকুরের সঙ্গে এর সংযোগ ঘটানো হয়েছে। তাই বলা যায় কাতি পূজার গানেও উর্বরতার ভাবনা কাজ করে, আবার অনেক অবিবাহিত নারীরা কাতি ঠাকুরের মতো বর, বিবাহিত নারীরা তাঁর মতো পুত্র সন্তান কামনা করে। এই পূজার গানের সঙ্গে ঢাকের বাজনা থাকে। আর এই ঢাকের বাজনার সঙ্গে গীদালীরা সারারাত ধরে নৃত্য পরিবেশনও করে। অনেকসময় পুত্রকামী নারীদের শরীরের উপর কাতি ঠাকুর ভর করেন। এই ধরণের গান পরিবেশনের ক্ষেত্রে একজন প্রধান গায়িকা থাকে, সঙ্গে থাকে ৪-৫ জন দোহার। মূল গায়িকা গানের একটি পদ গায় এবং পরে অন্যান্যরা সেই গানের দোহার ধরে। কাতি ঠাকুর যেহেতু শিবের পুত্র তাই তার

জন্ম কথায় শিব প্রসঙ্গ আসে, এছাড়া বাকি অংশ মূলত কাতি ঠাকুরেরই মাহাত্ম্য। এধরণের একটি গান নিচে উল্লেখ করা হল —

১. শিবের বিবাহ প্রসঙ্গ ঃ

''কেন ডাকেন নারদ ভাগিনা কহ মোরো আগে
পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া নারদ কহিতে লাগিল
শুন শুন পণ্ডিত মশাই আমার মামার বিয়ের কাথা
কোন পাকে মামার বিয়া হবে লগ্ন দেখ গনিয়া
এই কাথা শুনিয়া পণ্ডিত চার কোণা গনে
পূব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিন নাই শিবের জোড়া
দক্ষ রাজার বেটি আছে যুব্বে নারী হয়্যা
তার সাথে বুড়া শিবের আছে জোড়া
এই কাথা শুনিয়া নারদ বাড়িতে আসিল
বুড়া শিব কহে নারদ কিবা বচন শুনিল
নারদ বলে ওহে মামা
তোমার তানে মুনি করে চাইরো পাকে গননা
রূপার পাঞ্জি খুলিয়া দেখে মামা নাই তোমার জোড়া
এই কাথা শুনিয়া শিব মহা ক্রোধও হইলো
মামা বলে ওহে তুমি একবার শান্ত হও
শোনো মোরো কাথা
দক্ষ রাজার বেটি আছে যুব্বে নারী হয়্যা
দক্ষ রাজার বেটির সাথে আছে তোমার জোড়া
হাটিয়া গেইতে বুড়া শিবের হাটুর চাকা নড়ে
বিয়ার কাথা শুনিয়া বুড়া শিব খল খলেয়া হাসে
শুন শুন নারদ ভাগিনা না থাক নিশ্চিন্তে বসিয়া
শিগগির করি চলি যাও ব্রাহ্মণেরও বাড়ি
এই কাথা শুনিয়া নারদ সেখানে উপনীত হইলো।'' [৪৮]

আবার অন্য আর একটি গানে কাতি ঠাকুরের দেহ সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে,

সেখানেও প্রসঙ্গক্রমে শিবের কথা আসে। গানটি হল —

‘‘কাতি তোর মাথা বানাইল কোন জনে
আনু জনমেরে টালা বিলাছি রে।
মাথা বানাইল বাসুদেবে
জন্ম দিল শঙ্কাই বাপে।
কাতিরে তোর চখু বানাইল কোন জনে
আনু জনমেরে তারা বিলাছি রে।
চখু বানাইল বাসুদেবে
জন্ম দিল শঙ্কাই বাপে।
কাতিরে তোর ভুরু বানাইল কোন জনে
আনু জনমেরে শইলতা বিলাছি রে।
ভুরু বানাইল বাসুদেবে
জন্ম দিল শঙ্কাই বাপে।’’[৪৯]

সংগৃহীত অন্য আর একটি গানে কার্তিকের জন্ম প্রসঙ্গে শিবের বিবাহের কথা বলা হয়েছে।

‘‘হাট যাইতে বুড়া শিবের হাটুর চাকা নড়ে
সেই বুড়া শিব বিয়ার আটুশ করে।
কেন আছ নারদ ভাগিনা নিশ্চিন্তে বসিয়া
শিগগির করি চলিয়া যাও পণ্ডিতের বাড়ি
ওই কথা শুনিয়া নারদ না রইল রয়া
পণ্ডিতের বাড়ি যায়া উপনীত হইল
এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক দিল
ডাক শুনিয়া পণ্ডিত মশাই বাইর হয়্যা আসিল।’’ [৫০]

পূর্বোল্লিখিত গানের মতো এখানেও শিবের বিবাহ ও কাতিঠাকুরের জন্ম প্রসঙ্গের পরিচয় পাওয়া যায়। একই কাহিনী, শুধু স্থানভেদে তার প্রকাশ ভঙ্গি ভিন্ন।

চ. ছড়ায় শিব প্রসঙ্গ

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরে। তিনি যদি আন্তরিকভাবে এই উদ্যোগ গ্রহণ না করতেন তবে এই শাখা আজকের মতো এভাবে ফুলে ফলে বিকশিত হতে পারতো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। তার 'মেয়েলি ছড়া' নামক প্রবন্ধটিই এই ধারার প্রথম মাইল স্টোন। এই ধরনের ছড়াকে রবীন্দ্রনাথ আবার ছেলে ভুলানো ছড়াও বলতে চেয়েছেন। কেননা একজন শিশুর সঙ্গে মা, পিসি, মাসি স্থানীয় কেউ না কেউই বেশি জড়িত। অর্থাৎ একটি শিশু বড় হয় কোনো নারীকে কেন্দ্র করে। এজন্য মেয়েলি ছড়া ও শিশু ছড়াকে তিনি খুব পাশাপাশি রেখেছেন। এই ছড়া সংগ্রহের মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনা করেন। একারণেই লোকসাহিত্যে ছড়ার স্থান সর্বাগ্রে। পরে এই উপাদানের সঙ্গে অন্যান্য উপাদান সম্পৃক্ত হয়ে এই ধারা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যেমন, ধাঁধা, প্রবাদ, লোকসঙ্গীত, লোককথা, লোকনাটক প্রভৃতি উপাদান নিয়ে লোকসাহিত্য গঠিত । লোকসাহিত্যের এইসব প্রত্যেকটি উপাদান গুরুত্বপূর্ণ হলেও ছড়া এমন এক উপাদান যার মাধ্যমে শিশু মনের উদার জগতের স্বপ্ন ও কৌতুহলের মাধ্যমে হাসি ও আনন্দের জোয়ার এনে দেয়। অর্থাৎ শিশু মনের আনন্দ সৃষ্টির এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যমই হলো ছড়া। তবে সব ছড়াই যে শিশুদের জন্য রচিত নয়, বয়স্ক-বয়স্কাদের জন্যও ছড়া প্রচলিত রয়েছে। এপ্রসঙ্গে শিবপ্রসন্ন লাহিড়ির মন্তব্য স্মরণীয়, ''ছড়াগুলো বিচিত্র বিষয় এবং ভাব নিয়ে রচিত। এমন ছড়ার সংখ্যা একেবারেই কম নয়, যেগুলো অল্পবয়স্ক ছেলেদের একেবারে অবোধ্য বা দুর্বোধ্য। সব ছড়াই শিশুদের জন্য রচিত নয়, এবং ছেলেদের জন্যই যেসব কিছু লেখা তাও বলা যায় না ; অনেক ছড়া নিঃসন্দেহে মেয়েলি ও মেয়েদের জন্য সৃষ্ট এবং কতগুলো বয়স্ক-বয়স্কাদের উদ্দেশ্যে রচিত।''[৫১] অর্থাৎ ছড়া সকলের জন্য। ছড়াকে যদি আমরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি তবে দেখবো যে এর মধ্যে সমাজ সংস্কৃতির অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক— এমন কোনো বিষয় নেই যা ছড়ার মধ্যে ধরা হয়নি। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত নানান বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমাহারেই ছড়া সমৃদ্ধ। এর জন্যই হয়তো আমরা ছড়ার মধ্যে একটি জাতির ইতিহাস, মর্মকাহিনী, রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার পরিচয় খুঁজে পাই।

লোকায়ত কবিরা পদ্যের আশ্রয়ে ছড়া সৃষ্টি করেন। তবে ছড়া আর কবিতা এক জিনিস নয়। এ দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে এ প্রসঙ্গে অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর ছড়া সমগ্র গ্রন্থের 'ছড়ার ভূমিকাংশে' উল্লেখ করেছেন যে ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যপ্ত করে

নিতে হয়। কবিতা তো যে কোনোভাবে হতে পারে, পদ্য ছন্দ অথবা গদ্য ছন্দেও হতে পারে। কিন্তু ছড়া এভাবে হবে না। ছড়ার একটাই ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ যাকে ছড়ার ছন্দ বলেছেন। একটু দুলকি চালে চলে। এবং এই ছড়া সৃষ্টি হয় আকস্মিকভাবে, ইরেগুলারভাবে সেখানে আর্ট থাকবে, কিন্তু আর্টিফিসিয়ালের কোনো স্থান নেই সেখানে।[৫২] আবার অন্যদিকে সুকুমার সেন ছড়াকে শিশুবেদ বলেছেন। কেননা ''যে রচনা কোনো ব্যক্তি বিশেষের তৈরি বলে মনে করা যায় না, যে কোন এক মানব গোষ্ঠীকে প্রায় অনাদিকাল ধরে জন্মে, কর্মে চিন্তায় নিয়ন্ত্রিত করে এসেছে — তাকে যদি বেদ নাম দিয়ে থাকি তবে অপৌরুষের ছেলেমি ছড়া, গান, গল্পকে শিশু বেদ বললে বোধ করি খুব অসঙ্গত হয় না।'[৫৩] অর্থাৎ সুকুমার সেন শিশু ছড়াকে শিশু বেদ বলে মনে করেছেন। এই ধরণের শিশু বেদ বা শিশু ছড়াগুলি শুধু আমাদের বঙ্গেই নয়, সারাদেশে এবং বিদেশে সব স্তরের মানব গোষ্ঠীতে প্রচলিত আছে। লোকসংস্কৃতির এই মাধ্যম গোষ্ঠীগত সমাজ থেকে উদ্ভূত। একক কোনো ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা এতে নেই। তাই এর ভাষা কখনো কখনো লেখাতে গাঁথা হয়ে পড়েনি। একারণেই লোককবিরা চিরদিন অজ্ঞাতেই থেকে গেছেন।

ছড়াকে অনেকগুলি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। আনুষ্ঠানিক ছড়া, শিক্ষামূলক ছড়া, শিশুদের ছড়া প্রভৃতি। নিচে একটি ছকের মাধ্যমে তা দেখানো যেতে পারে —

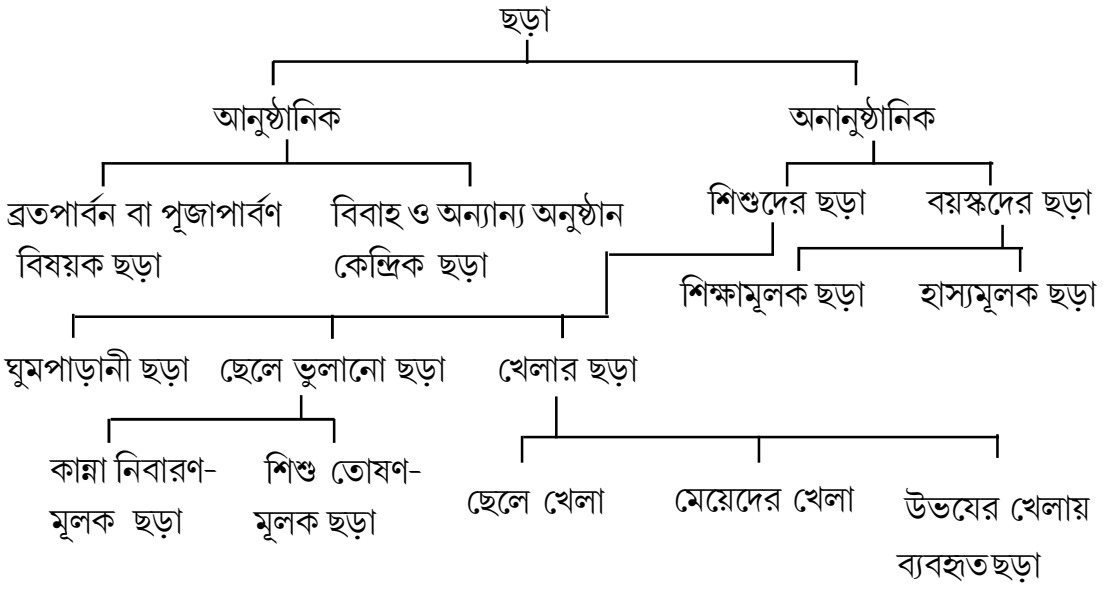

এগুলির মধ্যে শিব সম্পর্কিত ছড়াগুলি মূলত শিশুদের খেলাধূলায় এবং আনুষ্ঠানিক ছড়ার পর্যায়েই পড়ে। নিচে এরকম কিছু ছড়ার উল্লেখ করা হল —

১. ‘‘মাই গে মাই
ঘর কিনা কায় মুছিসে
চাম্পা মুছিসে।
চাম্পার হাতের খাড়ুলা
ফুল ফুটিসে।
একেনা নিগাইল সন্ন্যাসী ঠাকুর
একেনা নিগাইল টিয়া
টিয়ার মাওর বিয়াও হচে
নাল শাড়িখান দিয়া
দুইটা বিলাই জোগার দিসে
কাপেড়া ঘোঙর দিয়া।[৫৪]

এটি মূলত খেলার ছড়া, আবার এটিকে মেয়েলি ছড়াও বলা হয়। এখানে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রসঙ্গই হল শিব প্রসঙ্গ। কেননা এতদঞ্চলে শিব সন্ন্যাসী নামেও পরিচিত। শিব’কে যে এতদঞ্চলের মানুষ কতটা কাছের, কতটা আপন ভাবে তারই পরিচয় ছড়াটির মধ্যে ব্যক্ত হয়।

২. ‘‘চুয়া যায় দ্যাখোতে নটা পড়িসে
নদী যায়া দ্যাখোতে পাইক বসিসে
পাইকের ঘর গুয়া খায়া ঘুমুনি উঠিসে
তিন কোণা পিতলের খুড়ি ভাসি উঠিসে
একেনা নিগাইল শিব ঠাকুর একেনা নিগাইল টিয়া
টিয়ার মাওর বিয়াও হচে নাল কাপেড়া দিয়া
বাপ দেছে হাল গরু পাল বান্ধিয়া
মাও দেছে শাখা সেন্দুর কান্দি কাটিয়া
পরার ব্যাটা নিগাছে কীর্তন করিয়া।’’[৫৫]

এটিও মূলত শিশুদের খেলার ছড়া। একজন ধনুকের মতো মাটিতে হেলে থাকে, বাকি চারপাঁচ জন ঐ ছড়া বলে তার পিঠের উপর দিয়ে লাফায়। এতে তাদের এমনভাবে লাফাতে হয় যেন কারো শরীর কারও শরীরে স্পর্শ না হয়। শিব প্রসঙ্গ দিয়েই ছড়াটি শুরু হয় এবং শিবের দোহাই দিয়েই ছড়াটি শেষ হয়।

৩. ''উত্তর হাতে নামিয়া আসিল
নন্দি ভৃঙ্গি দুই ভাই
বুড়ি বেটি এক বোহিনী
চলরে যাই অমুকের বাড়ি
অমুকের বাড়ি যায়া
পাঠের ঠাকুর হটায়া দিয়া
উমাক দেমো পাটত বসেয়া।'' [৫৬]

লক্ষ্যণীয় নেপথ্য থেকেও এখানে শিবের কথাই বলা হয়েছে। কেননা নন্দী ভৃঙ্গি শিবেরই বাহন। কি করে এরা শিবের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে এই ছড়াটির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে। আসলে অন্যান্য দেবতার থেকে শিবের জনপ্রিয়তাই এখানে স্পষ্ট হয়েছে। এটিও মূলত খেলার ছড়া।

ছ. লোকনাটক ঃ গম্ভীরা গানে শিব প্রসঙ্গ

সীমান্তবর্তী উত্তরবঙ্গের একটি জেলা হল মালদা। এই জেলাও সীমান্তবর্তী হবার ফলে প্রচুর অনুপ্রবেশকারী তথা অভিভাষি মানুষের আগমন ঘটেছে। ফলে এতদঞ্চলের মানুষের সংস্কৃতির মধ্যে একটা মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এতদঞ্চলের লোকায়ত উপাদানগুলি খুঁজলেই তার পরিচয় পাওয়া যাবে। সেইসব লোক উপাদান গুলির মধ্যে লোকনাটক অন্যতম। মালদা জেলার প্রচলিত লোকনাটকের মধ্যে আলকাপ, গম্ভীরা, বোলবাহী গান, খন গান, নটুয়া পালা গান, ডোমনি গান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। এর মধ্যে গম্ভীরাকে খণ্ড পালাগান হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়, যা অবিভক্ত মালদা জেলাতেই প্রচলিত। পার্শ্ববর্তী মুর্শিদাবাদ ও দুই দিনাজপুর জেলাতেও কখনো কখনো এই গম্ভীরা গানের পরিচয় পাওয়া যায়। আসলে এটি পার্শ্ববর্তী জেলার প্রভাব বলেই মনে হয়।

হরিদাস পালিত একে 'আদ্যের গম্ভীরা' বলেছেন। ''রাঢ়াদি দেশের শিবের গাজনোৎসব মালদহের 'আদ্যের গম্ভীরা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছে কেন, তাহা অবগত হইবার ইচ্ছা হইতে পারে। পূর্বকালে চণ্ডী-মণ্ডপের ন্যায় গৃহবিশেষকে এতদঞ্চলে গম্ভীরি বা গম্ভীরা বলিত। গৌড়, রঙ্গপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে দ্বিতীয় ধর্ম্মপালদেবের ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজত্বকালে 'গম্ভীরা' শব্দে ঐ প্রকাবের গৃহবিশেষই বুঝাইত।.....গৃহিলোক আপন বাসভবনস্থ গম্ভীরা-গৃহে বুদ্ধপদ বা ধর্ম্মপাদুকা রক্ষা করিত। ক্রমে আদ্যাদেবী তথায় পূজা পাইলেন। চণ্ডীকা-রূপে পূজা পাইবার সময় আদ্যাদেবীর ঘট গম্ভীরার থাকিত। ক্রমে চণ্ডিকা শিবপত্নী হইলে 'হরগৌরী রূপে' গম্ভীরা মণ্ডপে স্থান পাইলেন।

এই গম্ভীরাতেই ধর্ম্মোৎসব হইত। সেই গম্ভীরাতেই শৈবপ্রভাবকালে 'হরগৌরীর' পূজা ও উৎসব হইতে আরম্ভ হয়।''[৫৭] কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক গবেষকই এই মন্তব্যটিকে মানতে চাননি। তাঁদের মতে ''লোকমতকে তিনি স্বীকার করে নিয়েও এটিকে শিবের পূজা বলে স্থির করেছেন। আজ গম্ভীরা এক ধরনের লৌকিক শিব পূজা বটে, কিন্তু আদিতে তিনি শিব নন। শিবকে যুক্ত করার তাগিতে পালিত মশায় 'আদ্যের গম্ভীরা' কথাটি ব্যবহার করেছেন. অবিভক্ত মালদহ জেলায় কোথাও 'আদ্যের গম্ভীরা' বলে কথা শুনিনি।''[৫৮] তবে বর্তমান যে গম্ভীরা শিবরূপেই পূজিত এবং এটি যে শিবকেন্দ্রিক লোক উৎসব সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কেননা সমগ্র মালদহ এবং দুই দিনাজপুরের কিছু অংশে গম্ভীরা পূজা শিব মূর্তিতেই করা হয়। কখনো তিনি দণ্ডায়মান, কখনো তিনি পদ্মাসনে আসীন, দ্বিভূজ বেষ্টিত, ব্যঘ্রচর্ম পরিহিত, এবং ত্রিশূলধারী হার ও সর্পমালা বেষ্টন করে তিনি পূজিত হন।

অনেকেই বলেন 'গম্ভীর' থেকে 'গম্ভীরা' শব্দের উৎপত্তি। যার অর্থ বিশেষ ভঙ্গিতে গঠিত প্রশস্ত ক্ষেত্র বিশেষ। এই শব্দের ব্যবহার দীর্ঘকাল আগে থেকেই প্রচলিত। ধর্ম্মসংহিতা, হরিবংশ, শিবপুরাণ, ধর্মমঙ্গল কাব্য, মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য প্রভৃতি কাব্যে এর ব্যবহার দেখা যায়। ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানা যায়, এই উৎসব আগে চৈত্র সংক্রান্তির ৮ দিন আগে শুরু হতো এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিন শেষ হতো। এখনো কোথাও কোথাও চৈত্র সংক্রান্তির দিন শেষ হয়। তবে কোথাও কোথাও আবার বৈশাখ মাসেও হয়। তবে যখনই হোক না কেন এই পূজার নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম রয়েছে। এর প্রথম দিন হবে ঘট ভরা অনুষ্ঠান, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন মূলত ছোট ও বড় তামাশা এবং শেষ দিন বোলবাই গান পরিবেশিত হয়। এগুলি ছাড়াও লোকশিল্পীরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই 'গম্ভীরা গান' পরিবেশন করে বেড়ান। পুরাণ, ইতিহাস, সমসাময়িক ঘটনা প্রভৃতি বিষয়কে নিয়ে তারা এই গান রচনা ও পরিবেশন করেন। গানের মধ্য দিয়েই তারা এক ধরণের সমস্যা তৈরি করেন এবং গানের মধ্য দিয়েই তার সমাধান করেন। এক্ষেত্রে শিব রূপি 'নানা'র প্রয়োজন হয়। এই শিব রূপি 'নানা'ই সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দেন। আর এই গানের বন্দনা অংশে সরাসরি শিব প্রসঙ্গ চলে আসে, সেখানে 'নানা'র প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। এখানে বন্দনা গানেও শিব বন্দনার পাশাপাশি নানান সমস্যা তুলে ধরা হয়। আমরা এখানে এরকমই কিছু গানের উল্লেখ করবো।

১. ''জয় জয় জয় শিব শম্ভু
মহাযোগী ভোলানাথ

এসো গঙ্গাধর চন্দ্রশেখর
করুণাময় বিশ্বনাথ।
হর হর মহাদেব দেবের দেব মহাদেব
তোমার মহিমা বাবা কেউ তো জানে না।
ওগো নীলকণ্ঠ অনাদিঅনন্ত
তোমায় নমি কৈলাশনাথ,
কৃপা কর গৌরীনাথ।
ধুতুরা আকন্দ বিল্বপত্র
গঙ্গাজল আর শুদ্ধ চিত্ত
এইটুকুতেই তুমি তৃপ্ত
ওহে আশুতোষ, ওহে মহেশ্বর
ওগো যজ্ঞেশ্বর।
প্রণাম নাও অনাথের নাথ।'' [৫৯]

২. । ''শিবহে, তুমি গাঁজা খাওয়া দাও ছাইরা
দ্যাখো তোমার গাঁজার টানে
উড়াইছে মোদের প্রাণ
ভাব্যা হইচি দিশাহারা।
এই টান ক্ষতিকর ভালাই জানো ভোলা
তোমায় দ্যাখা শিখছে টানা পোলাপান গুলান
শিবহে, হচ্ছে ক্যান্সার, হাপানি
বাড়ছে বুকের ধুকপুকানি
অকালেতে যাচ্ছে ঝরে।

কোলকাতার ধূয়াতে বিষিয়া আছে বাতাস
বন জঙ্গল ধ্বংস করে ডাকছে নিজের সর্বনাশ।
শিবহে পাহার মেরুতে বরফ গলছে
মহাপ্রলয় এসে করবে তাড়া।

শিবহে এখন অনেক সময় আছে
দয়া কর মৃত্যুঞ্জয়
সৃষ্টি ধ্বংস তোমার কৃপায়
পর পরকে ভালোবেসে
বাঁচুক সবাই তোমার বিশ্বে
আমাদের প্রার্থনায় দেও সাড়া।'' [৬০]

৩. ''ওহে শিব, শিব বাঘ-ছাল ছাড় সুট-বুট পরো
যত আধুনিক কালচারে
নইলে অচল হবে যুগের ফ্যারে।
হইয়ো না অভিনেতা, খেলোয়ার বিলাত ফেরতা
তবেই থাকবে ঘরে ঘরে, নইলে অচল হবে যুগের ফ্যারে।

বাড়ছে শিক্ষার হার বাড়ছে বেকার দ্যাশে দিনে দিনে
একটা চাকরি পিছু কল কয়েক হাজার বদল হয় চুলের রঙে
সুযোগ নিছে পাবলিক প্রতিষ্ঠান হাজার বেকারের সমাহার
বাড়তি খাটনি প্রতিষ্ঠানে খাটতে হয় একইবেতনে
বৃথা শহীদের আত্মদান লোক দেখানো অনুষ্ঠান
পয়লা মে হয় সাড়ম্বরে আজও শ্রমিকের চোখে ঝরে জল।

দফায় দফায় বাড়ছে বেতন সরকারী বাবুদের
তাদের সাথে পাল্লা দিয়া মুখ রাখো আমাদের
আলু পটল চলে জলের দামে, সওদা করতে হচ্ছে নাকাল
বাজারের নাই কোন হেরফের, চলছে যুগ সাম্যবাদের
অরুন বসাকের এই মিনতি, ত্রিশূলধারী ত্রিলোকপতি
দুর্গতি দাও দূর করে, শান্তি আন ঘরে ঘরে।[৬১]

৪. বলি হে ও পঞ্চানন, অতীষ্ট জীবন, আর বুঝি বাঁচবো না
চাহি শুধু তোমারই করুণা।
জ্বলা মরছি রাতে দিন, অবস্থা সঙ্গীন, করবো কি বুঝতে পারি না।
শিব তুমি থাকলে মোদের তালে
সোনার ভারত যাচ্ছে রসাতলে
সবাই আত্মসর্বস্ব, দেখা যাচ্ছে নিঃস্ব
আঁধার ঘিরছে পলে পলে।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর মানাচ্ছি সাড়ম্বরে
শ'য়ে আশি বেইমান তবু দেশ মহান
কেলেঙ্কারীর প্রতিযোগিতায় নেতারা সব লাইন লাগায়।
সেথায় চলছে হু হু করে অপসংস্কৃতির পথ ধরে
পাঁচালি যাত্রা কথকথা, আঁধার মনে দিত আলো জ্বেলে।

বৃটিশের দেওয়া বিষের জ্বালায় জ্বলছি অবিরত
মৌলবাদীরা খোঁচা মারে উস্কাছে সেই ক্ষত।
নানা ধর্ম নানা ভাষায় আপন স্বার্থে লাগায় লড়াই
হায়রে বলির পাঠার মতো মরে কত শত শত
ছাড় স্বাদেশিকতা, জাগ ভারতমাতা
বাঁচ শুধু জয়হিন্দ বলে।

বাড়ছে বেকার দূষণ, ধর্ষণ আর জিনিসের দাম
ডোনেশন ছাড়া মিলে না, সাড়া হয় না কুনও কাম
চরম সীমায় পনপ্রথা কু-সংস্কার জনসংখ্যা
তাইতো অরুণ বসাক বলে ভোলানাথ
এ বার সাজাও তুমি ঢেলে।'' [৬২]

এইভাবেই 'গম্ভীরা' গানে বন্দনা অংশের মধ্যে সমসাময়িক সমস্যা উঠে আসে। কিন্তু এর পরবর্তী অংশে অর্থাৎ তামাশা কিংবা বোলবাই অংশে সরাসরি সমস্যা উপস্থাপন করা হয়। শিব সেখানে

এভাবে উপস্থিত হন না, 'নানা'ই সেখানে শেষ কথা। সম্পূর্ণ পালাটি কখনো গানের তালে কখনোবা সংলাপের ভঙ্গিতে অভিনয়ের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়।

জ. উত্তরবঙ্গের স্থাননামে শিব প্রসঙ্গ

যে কোনো স্থানের ইতিহাস চর্চা করতে গেলে যদি ইতিহাসকেন্দ্রিক উপাদান খুঁজে পাওয়া না যায় তখন সেখানকার স্থাননামের তাৎপর্য সেই ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অনেকটাই সহায়ক হবে। আবার ইতিহাস চর্চা বাদ দিলেও স্থাননাম বিভিন্ন জাতি-জনজাতির ঐতিহ্য সন্ধানের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। শুধু তাই নয়, সাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক - রূপতাত্ত্বিক ও বাচন শৈলির রূপান্তরের চিহ্ন বহনকারী রূপে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ইতিহাস প্রভৃতির ইতিহাস বহনের ক্ষেত্রেও স্থাননামের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। আবার অনেকক্ষেত্রে ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশের চিহ্নও বহন করে এই স্থাননামগুলি। তাই বলা যায় স্থাননাম কেবল শুধুই স্থাননাম নয় কিংবা এগুলির প্রচলন খেয়াল খুশি মতো হয়নি। মধুপর্ণী পত্রিকায় এর গুরুত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে ''অনেকক্ষেত্রে স্থাননামের আদি তাৎপর্য অতীতের গর্ভে লুপ্ত হয়ে আছে। তা সত্ত্বেও নামের ঐতিহাসিক গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া সম্ভব। স্থাননাম অভিবাসনের ইঙ্গিতবাহী। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে জাতিতে জাতিতে যে সংমিশ্রণ ঘটে, তার চিহ্ন থেকে যায় স্থাননামে। যুগে যুগে বাকরীতি বা বাচনশৈলি পরিবর্তিত হয়। এই ভাষা পরিবর্তনের ছাপ মেলে স্থাননামে। গ্রামনামের বিবর্তনেও লোকভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য। পূর্বভারতের স্থাননামে বৃক্ষলতা, নানা প্রতীক চিহ্ন, পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান ও স্থান বিশেষের উৎপাদিকা শক্তির পরিচয় মেলে।''[৬৩]

উত্তরবঙ্গের বৈচিত্র্যপূর্ণ স্থাননামগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে তা এতদঞ্চলের বিভিন্ন উদ্ভিদ, প্রাণী, নদ-নদী, মাছ, পাখি, পাহাড়-পর্বত, রাজা-মহারাজা, দেব-দেবী প্রভৃতি নামের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। এই স্থাননামগুলিকে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাগত দিক থেকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগে দেখিয়েছেন যে যদি নামের শেষের অংশ 'গুড়ি', 'ড়া', 'পুর' থাকে তবে সেই নামগুলি দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠির অন্তর্গত। যেমন শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, বলরামপুর প্রভৃতি। আবার যদি কোনো স্থাননামের শেষে 'দহ' শব্দ থাকে তবে তা অষ্ট্রিক ভাষার শব্দ বলে মনে করা হয়। যেমন মালদহ, বানিয়াদহ প্রভৃতি। অন্যদিকে বৃক্ষ নামেও স্থাননাম পাওয়া

যায়। যেমন ময়নাগুড়ি, বিন্নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি। কখনো বা দেব-দেবীদের নামেও স্থাননাম হয়ে থাকে। যেমন কালিবাড়ি, শিববাড়ি, মাশান পাট প্রভৃতি। প্রসঙ্গত এখানে উত্তরবঙ্গের শুধু শিবকেন্দ্রিক স্থাননামগুলির একটি তালিকা দেওয়া হলো।

গ্রাম নাম	**ব্লকের নাম**	**জেলার নাম**
চড়কের কুঠি	কোচবিহার ১নং ব্লক	কোচবিহার
চড়ক পাড়া	কোচবিহার ১নং ব্লক	কোচবিহার
শিবপুর	কোচবিহার ১নং ব্লক	কোচবিহার
বানেশ্বর	কোচবিহার ২নং ব্লক	কোচবিহার
সিদ্ধেশ্বর	কোচবিহার ২নং ব্লক	কোচবিহার
উত্তর শিবপুর	কোচবিহার ২নং ব্লক	কোচবিহার
ঢাংঢিংগুড়ি	কোচবিহার ২নং ব্লক	কোচবিহার
শিবেশ্বর	দিনহাটা ১নং ব্লক	কোচবিহার
ঝার শিঙ্গেশ্বর	হলদিবাড়ি ব্লক	কোচবিহার
শিবপুর	মাথাভাঙ্গা ১নং ব্লক	কোচবিহার
ঝার শিঙ্গেশ্বর	মেখলিগঞ্জ ব্লক	কোচবিহার
দক্ষিণ মহাকালগুড়ি	আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লক	জলপাইগুড়ি
দক্ষিণ শিবকাটা	আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লক	জলপাইগুড়ি
মধ্য শিবকাটা	আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লক	জলপাইগুড়ি
মহাকালগুড়ি	আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লক	জলপাইগুড়ি
উত্তর শিবকাটা	আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লক	জলপাইগুড়ি
জটেশ্বর	ফালাকাটা ব্লক	জলপাইগুড়ি
শিবনাথপুর	ফালাকাটা ব্লক	জলপাইগুড়ি
নীলপাড়া ফরেষ্ট	কালচিনি ব্লক	জলপাইগুড়ি
সন্ন্যাসীকাটা	রাজগঞ্জ ব্লক	জলপাইগুড়ি
হরিহরপুর	চোপরা	উত্তর দিনাজপুর
মহাদেবপুর	চোপরা	উত্তর দিনাজপুর
নন্দীগছ	চোপরা	উত্তর দিনাজপুর

গ্রাম নাম	ব্লকের নাম	জেলার নাম
মহাকালডাঙ্গা	হেমতাবাদ	উত্তর দিনাজপুর
মহেশপুর	ইটাহার	উত্তর দিনাজপুর
বিশ্বনাথপুর	কালিয়াগঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
মহেশডাঙ্গি	কালিয়াগঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
হরিহরপুর	কালিয়াগঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
মহাদেবপুর	কালিয়াগঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
মহেশপুর	কালিয়াগঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
পূর্ব শঙ্করপুর	কালিয়াগঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
শিবপুর	কালিয়াগঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
দক্ষিণ মহেশপুর	করণদিঘি	উত্তর দিনাজপুর
পূর্ব মহেশপুর	করণদিঘি	উত্তর দিনাজপুর
মহারাজাপুর	রায়গঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
মহেশপুর	রায়গঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
পশ্চিম শঙ্করপুর	রায়গঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
শঙ্করপুর	রায়গঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
শিবপুর	রায়গঞ্জ	উত্তর দিনাজপুর
ঠ্যাংঝারা	খড়িবাড়ি	দার্জিলিং
থানেশ্বর	খড়িবাড়ি	দার্জিলিং
পঞ্চানন্দপুর	মোথাবাড়ি	মালদা
মহেশপুর	হাবিবপুর	মালদা
গোরক্ষ	চাঁচল	মালদা
মহাকালবোনা	হরিশ্চন্দ্রপুর	মালদা
মহেন্দ্রপুর	হরিশ্চন্দ্রপুর	মালদা
মহাদেবপুর	মোবারকপুর	মালদা

এগুলি ছাড়াও সমগ্র উত্তরবঙ্গে আরও অনেক স্থাননাম ছড়িয়ে রয়েছে, যা উত্তরবঙ্গের শিবকেন্দ্রিক ঐতিহ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

তথ্যসূত্র ঃ

১. লোকসংস্কৃতি গবেষণা (পত্রিকা), বাংলার শিব ও লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক - পৌষ, ১৪১৩, সনৎকুমার মিত্র (সম্পাদিত), পৃ. ৩৯১।

২. প্রবাদ প্রসঙ্গ, বরুণকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদিত) , পৃ. ৫২।

৩. বাংলা লোকসাহিত্য ঃ ধাঁধা, ওয়াকিল আহমদ , পৃ. ১২।

৪. বাংলা লোকসাহিত্য ঃ ধাঁধা, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১৪-১৫।

৫. লোকসংস্কৃতির দিগদিগন্ত, চূড়ামণি হাটি (সম্পাদনা), পৃ. ২১৬।

৬. ভাওয়াইয়া চটকা, সুখবিলাস বর্মা, পৃ. ১৬।

৭. উত্তরবঙ্গে নমঃশূদ্র সমাজ ও সংস্কৃতি , ড. সুধাংশুকুমার সরকার, পৃ. ৬৭।

৮. সংগ্রহ ঃ সুকুরু দাস (৭০), ফুটকীপাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, তারিখ- ০৮.০১.১৪।

৯. সংগ্রহ ঃ ফটিক সরকার (৮৫), আঙ্গারকাটা, পাড়াডুবি (পয়াস্থি), মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, তারিখ- ১৪.০৪.১২।

১০. সংগ্রহ ঃ বিশ্বজিৎ রায় (৫২), পশ্চিম হেমকুমারী (রিফিউজি পাড়া), হলদিবাড়ি, কোচবিহার, তারিখ- ২৭.০৩.১০।

১১. প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ. ৩৬৯।

১২. ড. দীপককুমার রায় (ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে নেওয়া), বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

১৩. তদেব।

১৪. সংগ্রহ ঃ শ্রী তারন সিংহ (৫৮), ডোহাগুড়ি, খড়িবাড়ি, দার্জিলিং, তারিখ- ২৩.০১.১৪।

১৫. সংগ্রহ ঃ গৌতম সিংহ (৪০), পেতাজোত, খড়িবাড়ি, দার্জিলিং, তারিখ- ২০.০১.১৪।

১৬. সংগ্রহ ঃ শ্রী তারন সিংহ (৫৮), ডোহাগুড়ি, খড়িবাড়ি, দার্জিলিং, তারিখ- ২৩.০১.১৪।

১৭. সংগ্রহ- সুকেশ্বর শীল (৫২), বীরপাড়া, আলিপুরদুয়ার ১নং ব্লক, জলপাইগুড়ি, তারিখ- ০৩.১২.১২

১৮. সংগ্রহ ঃ রবিকান্ত বর্মন (৩৮), বোড়োডাঙ্গা, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ০২.০৬.১২।

১৯. সংগ্রহ ঃ জীতেন্দ্রনাথ বর্মন (৫৪), বোড়োডাঙ্গা, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ০৩.০৬.১২।

২০. সংগ্রহ ঃ মনীন্দ্রনাথ রায় (৫৭), দক্ষিণ বেরুবাড়ি, জলপাইগুড়ি,তারিখ- ০৪.০৩.১৩।

২১. বাংলা লোকসাহিত্য ঃ মন্ত্র, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ১১

২২. সংগ্রহ ঃ অনাথ রায় (৫২), ১১৭ জিকা বাড়ি, কুচলিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, তারিখ-১২.০৫.১২

২৩. ডেগর ৬, নিখিলেশ রায় (সম্পাদিত), শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, পৃ.৩৪

২৪. তদেব, পৃ.৩৩

২৫. সংগ্রহ ঃ নগেন্দ্রনাথ রায় (৬৫), চৈতন্যপুর , শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, তারিখ- ০৩.০১.১৪।

২৬. সংগ্রহ ঃ করুনাকান্ত অধিকারী (৬৫), মাল্লেরবাড়ি, শিকারপুর, জলপাইগুড়ি, তারিখ- ০২.০৪.১৩

২৭. তদেব।

২৮. তদেব।

২৯. তদেব।

৩০. সংগ্রহ ঃ উদ্ধব রায় (৫৪), ফুটকি পাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, তারিখ- ০৮.০৮.১৩।

৩১. তদেব।

৩২. তদেব।

৩৩. সংগ্রহ ঃ মহেন্দ্রনাথ রায় (৬২), ফুটকি পাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, তারিখ- ১২.০৮.১৩।

৩৪. সংগ্রহ ঃ অনাথ রায় (৫২), ১১৭ জিকাবাড়ি, কুচলিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, তারিখ- ১৩.০৫.১২

৩৫. সংগ্রহ ঃ ক্ষুদিরাম রায় (৫৮), ১০৬ বড় কুচলিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার, তারিখ- ১৩.০৫.১২।

৩৬. সংগ্রহ ঃ মহেন্দ্রনাথ রায় (৬২), ফুটকি পাড়া, রাজগঞ্জ, জলপাইগুড়ি, তারিখ- ১২.০৮.১৩।

৩৭. সংগ্রহ ঃ সত্যেন্দ্রনাথ রায় (৫৮) বামনপাড়া, হেমকুমারী, হলদিবাড়ি, কোচবিহার, তারিখ- ২০.১২.১৩।

৩৮. অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), মধুপর্ণী, পশ্চিম দিনাজপুর, জেলা সংখ্যা ১৩৯৯, পৃ.

৩৯. বাংলা লোকসাহিত্য ঃ মন্ত্র, ওয়াকিল আহমদ, পৃ. ৩৩।

৪০. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃ. ১৭।

৪১. কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা, হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও ড. সুধীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য, পৃ. সাত।

৪২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাংলার ব্রত, পৃ. ৬।

৪৩. বাংলার ব্রতপার্বণ, ড. শীলা বসাক, পৃ. ২১।

৪৪. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৪।

৪৫. সম্পূর্ণ ব্রতকথাটি সংগ্রহ করা হয়েছে হিদ্দেশ্বরী বর্মণ (৭৬), বাসন্তীর হাট, দিনহাটা, কোচবিহার থেকে এবং বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছেন কোচবিহারের ‘সুরের সেপাই শিল্পিগোষ্ঠী’।

৪৬. সংগ্রহ ঃ বেলারাণী বর্মা (৪৮), ঝুরিপাড়া, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ১২.১১.১৩।

৪৭. সংগ্রহ ঃ ফুলতি গীদালী (৮০), পুটিমারী, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ০৮.১১.১৩।

৪৮. সংগ্রহ ঃ নান্দরি বর্মন (৬০),পুটিমারী, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ০৯.১১.১৩।

৪৯. সংগ্রহ ঃ ননীবালা বর্মন (৪২), আটিয়াবাড়ি, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ-১৪.১১.১৩।

৫০. সংগ্রহ ঃ আলো বর্মণ (৪৭), আটিয়াবাড়ি, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ১৪.১১.১৩।

৫১. যশোর খুলনার ছড়া, শিবপ্রসন্ন লাহিড়ি, পৃ.১।

৫২. ছড়া সমগ্র (ছড়ার ভূমিকাংশ), অন্নদাশঙ্কর রায়, পৃ. ৯।

৫৩. ভবতারণ দত্ত, বাংলার ছড়া (সংকলিত ও সম্পাদিত), পৃ. ৮।

৫৪. সংগ্রহ ঃ পবিত্র শর্মা (৭২) জহুরী, তালমা, জলপাইগুড়ি, তারিখ-০৭.০১.১৩।

৫৫. সংগ্রহ ঃ নগেন্দ্রনাথ রায় (৬০), চৈতন্যপুর, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, তারিখ- ০৮.০৩.১৪।

৫৬. সংগ্রহ ঃ রমণীমোহন বর্মা (৫৮), ঝুড়িপাড়া, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ০৩.০১.১২।

৫৭. আদ্যের গম্ভীরা, হরিদাস পালিত, ড. ফণী পাল (সম্পাদিত), পৃ. ২৯।

৫৮. প্রদ্যোৎ ঘোষ, লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা,পৃ.৪-৫।

৫৯. সংগ্রহ ঃ মলিন হালদার (৩৬), কাজিগ্রাম (অঞ্চল), সাদুল্লাপুর, ইংরেজ বাজার, মালদা, তারিখ-০৬.১২.১৩।

৬০. তদেব।

৬১. সংগ্রহ ঃ অরুণ বসাক (৬১), ধোপা পাড়া, শরৎচন্দ্র রোড, পুরাতন মালদা, তারিখ- ০৬.১২.১৩।

৬২. সংগ্রহ ঃ পাপ্পু ঘোষ (৪২), আইহো, বাবুপাড়া, হাবিবপুর, মালদা, তারিখ- ০৭.১২.১৩।

৬৩. অজিতেশ ঘোষ সম্পাদিত, মধুপর্ণী, বিশেষ দার্জিলিং জেলা সংখ্যা, ১৯৯৬ , জহর সেন, দার্জিলিং জেলার স্থাননাম, পৃ-৩৯৭।

পঞ্চম অধ্যায়
উত্তরবঙ্গের সাহিত্যে (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য) শিব

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাসে উত্তরবঙ্গের অবদান কম নয়। কোচবিহার রাজদরবারে রচিত রাজন্যশাসিত কোচবিহারের সাহিত্য যেমন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ ঠিক তেমনি মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল এবং উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রিক মনসামঙ্গল কাব্যধারাও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উক্ত প্রেক্ষাপটে উত্তরবঙ্গের সাহিত্যে (মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য) শিব প্রসঙ্গ বিশেষ ভাবে উঠে এসেছে তা নিম্নে আলোচনা করা যেতে পারে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই অধ্যায়কে আমরা দু'টি উপ-অধ্যায়ে ভাগ করে নিয়েছি।

ক. কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যে শিব

খ. মধ্যযুগে উত্তরবঙ্গের মঙ্গলকাব্যে শিব

ক. কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যে শিব ঃ

বাংলা সাহিত্যের সূচনাকাল থেকে শুরু করে কিংবা তাঁর পূর্ববর্তী সাহিত্য ধারা থেকে শুরু করে সমগ্র মধ্যযুগ পর্যন্ত প্রায় বেশিরভাগ সাহিত্য রচনা হয়েছে বিভিন্ন রাজা মহারাজাদের অনুগ্রহে। বিশেষ করে পাল ও সেন যুগের সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। এরকম হবার পিছনেও একটি সূক্ষ্ম কারণ রয়েছে বলে মনে হয়। সেই সময় পর্যন্ত সাহিত্য জনসাধারণের রুচিবোধ উৎসাহ ও প্রসংশার উত্তাপে পাঠক মহলের কিংবা আপামর জনগণের কোনো ক্ষেত্র পায়নি। তাই কবিরা রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ওপরেই প্রত্যাশী হয়ে থাকতেন। বাংলা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত রাজ পৃষ্ঠপোষকতাগুলি সেই সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো সেগুলি হল গৌড়রাজসভা, মিথিলার রাজসভা, ত্রিপুরার রাজসভা, কোচবিহার রাজসভা, বিষ্ণুপুর রাজসভা, কৃষ্ণনগর রাজসভা, বর্ধমান রাজসভা প্রভৃতি। এগুলির মধ্যে কোনোটি যেমন বৃহৎবঙ্গের রাজসভা ঠিক তেমনি কোনোগুলো প্রান্তীয় বঙ্গের বা প্রতিবেশি বঙ্গের রাজসভা। এছাড়া প্রত্যেকটি রাজসভাতেই পৃথক পৃথকভাবে রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় স্বতন্ত্র বাংলা সহিত্য রচিত হয়েছে। বলা যায় মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে যে পটপরিবর্তনগুলি সম্ভব হয়েছে সেটাও এই রাজসভার সাহিত্যগুলোকে কেন্দ্র করে। বিশেষ করে আরাকান রাজসভার সাহিত্য এক্ষেত্রে উল্লেখের দাবি রাখে। সেখানকার রচিত সাহিত্য যেন গতানুগতিক দেববাদনির্ভর ধারাকে ভঙ্গ করে মানবিক

প্রেমের নতুন ধারা উন্মোচন করে। এছাড়াও মধ্যযুগের সাহিত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতাকে স্বীকার করতেই হয়।

প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাজসভায় সভাকবিদের রচনার মূল বিষয়ই ছিল রাজপ্রশস্তি এবং রাজোপদেশ সম্বলিত শাসন প্রণালী। তবে অবশ্যই সেই সময় এগুলির ভাষা হত সংস্কৃত, এক্ষেত্রে সভাকবিরা সেইসব প্রশস্তি রচনায় নিজেদের নাম উহ্য রাখতেন। তবে সেখানে সভাকবিদের নাম জানা না গেলেও রাজসভার সংস্কৃতি ও সাহিত্যিক লক্ষণগুলির ছাপ বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেত। আসলে সেইসময় সাহিত্যের ইতিহাস বলতে কিছু ছিল না। তবে যা ছিল তাকে রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাস বলা যেতে পারে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিক প্রভৃতি নির্ভর করতো একজনের অঙ্গুলি নির্দেশেই। সাহিত্যের ধারাও তার ব্যতিক্রম ছিল না। এক্ষেত্রে সেই অঙ্গুলি নির্দেশেই সভাকবিদের ভাগ্যের চড়াই-উতরাই ঘটতো। কখনো তারা সৌভাগ্যের চরম শিখরে উঠতেন আবার কখনো ভাগ্যের বিপর্যয়ের পান থেকে চুন খসলে মৃত্যুর সম্মুখীন পর্যন্ত হতে হত। উদাহরণস্বরূপ লক্ষণ সেনের সভাকবির কথা বলা যেতে পারে, যাঁর নাম ধোয়ী। যিনি 'পবনদূত' কাব্য রচনার পর রাজার এতটাই প্রিয় হয়ে যান যে পরে রাজার দেওয়া উপহারে তার যশ ও খ্যাতি দুইই বৃদ্ধি পায়। তাকে 'কবিরাজ' উপাধি, সোনা দিয়ে বাঁধানো চামরদণ্ড ও হস্তি উপহার হিসেবে দেওয়া হয়। আবার ঐ একই রাজসভায় উমাপতিধর রাজা লক্ষ্মণ সেনকে নারীসঙ্গ ব্যাপারে অবাঞ্ছিত উপদেশ দিলে তাঁকে মন্ত্রীত্ব পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পরে অবশ্য তার সৌভাগ্যবশত তিনি মুক্তি পান।[১] এরকম উদাহরণ অবশ্য প্রাক বাংলা সাহিত্যে অনেক আছে। আবার যুগযুগান্তর ধরে সর্বদা একই রাজার শাসনকাল থাকে না। এক রাজা যান, আর এক রাজা আসেন। এরকম এক পরিবর্তনের সময়েও অনেক ক্ষেত্রে সভাকবিদের ভাগ্যের বিবর্তন ঘটে। পুরানো রাজার মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে পুরানো রাজা যদি মারা যান সেক্ষেত্রে তাকে সেই রচনা বন্ধ করে নতুন রাজার জয়গান করতে হয়। অর্থাৎ রাজ পৃষ্ঠপোষক কবিদের সর্বদাই সচেতনভাবে রাজার পাশে থেকে তার গুণগান রচনা করতে হয়। এই প্রসঙ্গে 'রাজসভার কবি ও কাব্য' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে -''রাজ পারিতোষিক লাভ করতে গেলে রাজপরিতোষণ করতেই হয়, এজন্য রাজস্তুতি রাজসভার কবিদের সাধারণ ধর্ম। রাজপ্রশস্তি যত নির্লজ্জ ও নির্জলা হয় কবির ভাগ্যোদয়ের ততই সম্ভাবনা।''[২]

বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত কোচবিহার রাজবংশের রাজত্ব শুরু হবার পূর্বে করতোয়া থেকে বড় নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল নিয়ে যে কামতা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার রাজা ছিলেন দুর্লভ নারায়ণ। লক্ষ্যণীয় এই দুর্লভ নারায়ণের সময়কাল থেকে কামতা রাজ্যে সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। এই

রাজ্যে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন স্থান থেকে নানান পণ্ডিত, আচার্যদের নিজ দরবারে নিয়ে আসা হয়। জানা যায় তাঁর রাজত্বকালে এরকমই কয়েকজন সভাকবি তার রাজসভাকে অলঙ্কৃত করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমসরস্বতী। তিনি 'প্রহ্লাদ চরিত্র' ও'হরগৌরীর সংবাদ' নামক দুটি গ্রন্থ অনুবাদ করেন। জানা যায় এই হেমসরস্বতীর সঙ্গে দুর্লভনারায়ণের সখ্যমূলক সম্পর্ক ছিল। এই সময় তিনি বিভিন্ন পুরাণের অনুবাদ করে ধর্মজ্ঞানের প্রবক্তার ভুমিকা পালন করেছেন। তাঁর 'প্রহ্লাদ চরিত্র' গ্রন্থে মূলত ভক্তিবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে 'হরগৌরীর সংবাদ' গ্রন্থের মাধ্যমে রাজসভায় শাক্ত ও শৈব অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। লক্ষণীয় যে মহারাজা বিশ্বসিংহের আমল থেকেই কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যের যথার্থ সূচনা সেখানেও কিন্তু শৈব ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। এতদঞ্চলের জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শৈবভাবনার ভূমিকা ছিল যথেষ্ট। এই প্রসঙ্গে এতদঞ্চলের একটি লোককথা প্রচলিত আছে। কাহিনিটি হল - ''বর্তমান গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত চিকনায় মেচবংশীয় হরিয়া বা হরিদাস 'মণ্ডল' নির্বাচিত হন। হরিদাসের দুই স্ত্রী, হীরা ও জীরা, কোচবংশীয় ছিলেন। হীরার গর্ভে শিবের ঔরসে বা বরে বিশুর জন্ম হয়।''[৩] আবার একই প্রসঙ্গ খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ ও উল্লেখ করেছেন --''নবম বৎসর বয়স্কা রাজকন্যা হীরার সহিত হরিদাসের পরিণয় সুসম্পন্ন হইয়াছিল। কন্যা অল্পবয়স্কা বলিয়া হীরার মাতা এই বিবাহে প্রথমতঃ সম্মতি প্রদান করে নাই, যৌবন প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কন্যা পিতৃগৃহে অবস্থান করিবেন, দমাস্থু এই রূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করায় তিনি সম্মত হইয়াছিলেন এবং শুভদিনে ও শুভলগ্নে বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বরবেশে সুসজ্জিত হরিদাস অশ্বারোহনে কন্যার পিত্রালয়ে গমন পূর্ব্বক শাস্ত্রবিধি এবং কুলাচারমত হীরাকে ব্যবহার করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিয়াছিলেন। বিবাহের অষ্টম দিবসে অষ্টমঙ্গলাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পরে কন্যা পিতৃগৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন এবং যুবতী না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বামীর ঘরে আগমন করেন নাই। জীরা নামে হরিদাসের আর একজন স্ত্রী ছিলেন। কালক্রমে হীরার গর্ভে শিশু এবং তাহার কয়েক বৎসর পরে বিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম 'বিহুর' দিনে (প্রথম বিহু মহাবিষুব) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া শেষোক্ত বালকের নাম 'বিশু' এই নামকরণ হইয়াছিল। কোচবিহার এবং দরঙ্গের বংশাবলীতে ইনি মহাদেবের ঔরসজাত বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন। (ষোড়শ শতাব্দীর) রামচরণ ঠাকুর বিরচিত 'শঙ্করচরিত্রেও তাহাই লিখিত আছে। সমসাময়িক আকবরনামা'য় বিশ্বসিংহকে মহাদেবের পুত্র বলা হইয়াছে।''[৪] অর্থাৎ এই ঘটনাকে অলৌকিক বলে মনে হলেও আকবরনামা প্রভৃতি গ্রন্থের নিরিখে শিবের ঔরসজাত সন্তান হিসেবেই বিশুকে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীকালে এই বিশু বিশ্বসিংহ নাম নিয়ে কোচরাজা হিসেবে সিংহাসন

লাভ করেন। যদিও এ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে তথাপি একথা বলতে হয় যে, এই শৈবধারা আজও কোচবিহারে সমানভাবে জনপ্রিয়।

ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল তাঁর 'উত্তরবঙ্গের (কোচবিহার) কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ (১৭ শ শতাব্দীর) কর্তৃক অনুদিত মহাভারতের প্রাচীন পুঁথির প্রামাণ্য সটীক সংস্করণ প্রস্তুতি' শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভে উল্লেখ করেছেন যে ''বাংলা সাহিত্যে রাজানুকূল্যের সূচনা হয়েছিল কোচবিহার রাজদরবারে। প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যানুরাগী কোচরাজারা বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্ডিতদের আহ্বান করে কোচবিহারে এনেছেন। এবং তাদের দিয়ে নানাবিধ সাহিত্য রচনার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য ধারাকে পুষ্ট করেছেন।''[৫] সেদিক থেকে সমগ্র বাংলা সাহিত্য (দরবারী সাহিত্য) আলোচনার ক্ষেত্রে কোচবিহার রাজসভা বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখে। তবে বিশ্বসিংহের সময়কাল থেকেই কোচবিহারে যথার্থ সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। মূলত কোচবিহার রাজসভার সাহিত্য সাধনার মূল বিষয় ছিল অনুবাদ, যা সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্য থেকে করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে করা হয়েছে ইতিহাস ধর্মী, আখ্যান -উপাখ্যান ও গীতিকাব্য এবং তৃতীয় পর্বে সাহিত্য গণমূখী হয়েছে। যা সমকালীন বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সমতা রক্ষা করেছে। প্রথম পর্বের সময়কাল হিসেবে ষোড়শ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ধরা হয়। দ্বিতীয় পর্বের সময়কাল হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ এবং তৃতীয়পর্ব বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে মহারাজা জগদ্বিপেন্দ্রনারায়ণের সময়কাল পর্যন্ত ধরা হয়। এখানে প্রথম পর্বের সাহিত্যকৃতির পরিচয় দেওয়া যেতে পারে, যা কোচবিহার রাজসভায় মধ্যযুগ নামে পরিচিত। এই মধ্যযুগের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত, অর্থাৎ মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও মহারাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিস্তৃত করা হবে। এককথায় বলা যায় কোচবিহার রাজসভার সুবর্ণ যুগ হিসেবে সেই সভার মধ্যযুগকেই চিহ্নিত করা হয়। আলোচনা সুবিধার জন্য কোচরাজসভার সূচনাকাল থেকে মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ পর্যন্ত যেসব সাহিত্য রচনা করা হয়েছে, এবং যাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলি রচনা করা হয়েছে নিচে তার একটি তালিকা দেওয়া হল —

লেখক	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	রচনা	প্রকরণ
হেম সরস্বতী	রাজা দুর্লভনারায়ণ।	বামন পুরাণ অবলম্বনে 'প্রহ্লাদ চরিত' ; নরসিংহ পুরাণ থেকে 'হরগৌরী সংবাদ' অনুবাদ করেন।	
হরিহর বিপ্র	ইন্দ্রনারায়ণ	'লব-কুশের যুদ্ধ', 'বভ্রুবাহনের যুদ্ধ', 'তাম্রধ্বজের যুদ্ধ' তিনটি কাব্য। মহাভারতের 'দ্রোণ পর্ব'	
মাধব কন্দলী	মাধব কন্দলী নির্দিষ্ট করে কোনো রাজার কথা উল্লেখ করেন নি। তবে নরনারায়ণের সভাকবি শঙ্করদেব তাঁর পূর্বসূরী হিসেবে মাধব কন্দলীর উল্লেখ করেছেন। আবার বিশ্বসিংহের সময়ের কবি দুর্গাবর তার 'গীতি রামায়ণ' এর মধ্যেও এই কবির কথা উল্লেখ করেছেন। তা থেকে মনে হয় কবি দুর্লভনারায়ণ বা ইন্দ্রনারায়ণের সময়েই চতুর্দশপঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি কাব্য রচনা করেন।	রামায়ণের সপ্তকাণ্ড	রামায়ণ
মনকর ও দুর্গাবর	বিশ্বসিংহ (রাজত্বকাল ১৪৯৬-১৫৩৩)	মনসাকাব্য ও বেউলা আখ্যান	মনসামঙ্গল কাব্য
দুর্গাবর	বিশ্বসিংহ	গীতিরামায়ণ	রামায়ণ
		ভাগবতের ১০ম স্কন্ধ অনুবাদ করেন।	ভাগবত

লেখক	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	রচনা	প্রকরণ
পিতাম্বর	বিশ্বসিংহ	মহাভারতের অংশবিশেষ অবলম্বনে নলদময়ন্তী উপাখ্যান রচনা করেন	মহাভারত ও আখ্যান
		উষা পরিণয় (তবে এগুলি একই কবির কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে)	
রামসরস্বতী	নরনারায়ণ	ষোড়শ শতাব্দীর এমন একজন কবি যিনি সংস্কৃত মহাভারতের সবগুলি পর্ব অনুবাদকরেন। এগুলি ছাড়াও ভীমচরিত, লক্ষ্মীচরিত, সাবিত্রী চরিত, বকাসুর বধ, কুলাচল বধ, জটাসুর বধ প্রভৃতি আখ্যান রচনা করেন।	মহাভারত ও আখ্যান
		জয়দেবের কাব্য অবলম্বনে গীতগোবিন্দ অনুবাদ করেন	গীতগোবিন্দ
অনন্তকন্দলী	নরনারায়ণ	সাবিত্রী উপাখ্যান	মহাভারত
		রাজসূয়	মহাভারত
		ভাগবত ১০ম স্কন্দ	ভাগবত
		গীতগোবিন্দ	গীতগোবিন্দ
		মহীরাবণ বধ, বৃত্তাসুর বধ, কুমার হরণ কাব্য	আখ্যান কাব্য

লেখক	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	রচনা	প্রকরণ
কলাপচন্দ্র দ্বিজ	নরনারায়ণ	রামকাহিনী রচনা করেন	রামায়ণ
কবিন্দ্রপাত্র (সেনাপতি) আসল নাম বাণীনাথ	নরনারায়ণ	মহাভারতের অনুবাদ	মহাভারত
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য	নরনারায়ণ	ভবিষ্যপুরাণ	পুরাণ
ভূষণ দ্বিজ	নরনারায়ণ	মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও মাধব দেবের জীবন চরিত নিয়ে তার রচিত পুথি থেকে জানা যায় সেই সময় মহারাজার রাজসভায় কথোপকথনে অনভ্যস্ত কোনো ব্যক্তিকে রাজকার্যে নিয়োগ করা হবে না।	জীবন চরিত
দামোদর মিশ্র	নরনারায়ণ	বৃহৎ গঙ্গাজল স্মৃতি সাগর দশকর্মপিটক	স্মৃতি নিবন্ধ
পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীষ	নরনারায়ণ ও তার প্রধানা রাজমহীষী ভানুমতীর আদেশে ১৪৯০ শকাব্দে সংস্কৃত ভাষায় বিখ্যাত ব্যকরণ গ্রন্থ রচনা করেন।	প্রয়োগ রত্নমালা (মহারাজা এই ব্যাকরণ গ্রন্থের সাহায্যে রঘুদেব নারায়ণকে শিক্ষা প্রদান করেছিলেন)	ব্যাকরণ গ্রন্থ
	কেউ কেউ মনে করেন লেখক এগুলির কোনো কোনোটি পরবর্তী মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণ ও কামরূপ রাজ রঘুদেব নারায়ণের সভায় বসে রচনা করেন।	গ্রহণ কৌমুদী, সংক্রান্তি কৌমুদী, পিতৃকৃত্য কৌমুদী, একাদশী কৌমুদী, দশকর্ম কৌমুদী, শ্রাদ্ধ কৌমুদী, তীর্থ কৌমুদী, দুর্গাস্তব কৌমুদী, গুঢ়ার্থকৌমুদী, শিবরাত্রি কৌমুদী	স্মৃতি নিবন্ধ

কবি	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	রচনা	প্রকরণ	অন্যান্য
শঙ্করদেব	মহারাজা নরনারায়ণের রাজত্বকালে রাজ ভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলারায়) অনুগ্রহে শঙ্করদেব কামতা রাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার শুরু করেন এবং সভাকবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হন।	ভাগবতের প্রথম, অষ্টম, একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ, ভাগবতের কীর্তন, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, গোপী উদ্ধব সংবাদ রচনা করেন	ভাগবত	শঙ্করদেব তাঁর দীর্ঘ ১২০ বছরের জীবনে কাব্য,অনুবাদ কাব্য, ভক্তিতত্ত্ব প্রধান রচনা সমগ্র, নাম প্রসঙ্গ প্রভৃতি প্রকরণ গ্রন্থের পাশাপাশি যে অঙ্কিয়া নাটকগুলি রচনা করেছেন তার বেশির ভাগ কৃষ্ণ বিষয়ক । অর্থাৎ দেবতাদের বাদ দিয়েও নাটকের বিষয় যে মানুষ হতে পারে তা তিনি জীবন সায়াহ্নে এসে অনুভব করেন। সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মীয় উপাখ্যানকে সহজবোধ্য করে তোলার মানসে শঙ্করদেব নাটপালা বা অঙ্কিয়া নাটের সূত্রপাত করেন।বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্ভবত সেগুলিই পূর্ণাঙ্গ নাট্যরস সম্পন্ন প্রথম নাটক।কোচবিহারে অবস্থানকালীন রাম-বিজয় নাটকটি তিনি রচনা করেন। এটি অভিনয় করার জন্য সেই সময় শুক্লধ্বজ (চিলারায়) একটি মঞ্চও নির্মাণ করেছিলেন।
		সংস্কৃত রামায়ণের উত্তরকাণ্ড বাংলায় অনুবাদ করেন।	রামায়ণ	
		নরনারায়ণের অনুরোধে তিনি 'ভাগবত পুরাণ' ও 'গুণমালা' নামে দুটি বিখ্যাত পুস্তক রচনা করেন	ভাগবত	
		ভক্তি প্রদীপ, ভক্তি রত্নাকর, অজামিল উপাখ্যান, লীলামালা, নামমালিকা,কীর্ত্তন ঘোষা ,চিহ্ন যাত্রা	কাব্য	
		রামবিজয় নাট, কালীয়দমন নাট, কেলি গোপাল নাট , পত্নী প্রসাদ নাট , পারিজাত হরণ নাট, রুক্মিণী হরণ নাট	অঙ্কিয়া নাট	

কবি	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	রচনা	প্রকরণ
মাধবদেব	নরনারায়ণ	রামায়ণের আদি কাণ্ড	রামায়ণ
	শুক্লধ্বজের (চিলারায়) উৎসাহে শঙ্করদেবের নির্দেশে	রাজসূয় কাব্য	মহাভারত
	লক্ষ্মীনারায়ণ (লক্ষ্মীনারায়ণের রাজমন্ত্রী বিরুপাক্ষ কার্যীর অনুরোধে মাধবদেব সংস্কৃত পুরাণ ও সংহিতা চয়ন করে সেগুলির অনুবাদ করেন। যার ফসল 'নামমালিকা' গ্রন্থ)	নাম মালিকা (এই গ্রন্থের ভূমিকায় কবি নরনারায়ণ পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণের উল্লেখ করেন। এখান থেকে মনে হয় তিনি লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকাল পর্যন্ত কামতা দরবারে সাহিত্য রচনা করেন)	পুরাণের অনুবাদ
		বরগীত (ব্রজবুলি ভাষায় রচিত কৃষ্ণ পদাবলী)	কৃষ্ণপদাবলী
		ভট্টিমা	প্রশস্তিগীত
		ভক্তিরত্নাবলী	
		শ্রীকৃষ্ণের জন্ম রহস্য	
		নাম-ঘোষা	এটি দার্শনিক চিন্তা-ধারার উৎকৃষ্ট ফসল
		চোর ধরা নাট, অর্জুন ভঞ্জন নাট, ভুমি লুটুয়া নাট, ভোজন ব্যবহার নাট, কোত্রাখেলা নাট, পিপিরা গুছুয়া নাট, রাস ঝুমুর নাট।	অঙ্কিয়া নাট
দামোদর দেব		বরগীত	

কবি	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	কাব্য/রচনা	প্রকরণ
গোবিন্দ মিশ্র	লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে (১৫৮৭-১৬২৭) দামোদরদেবের নির্দেশে	শ্রীমদ্ভাগবতের ১৮ টি পর্বের পদ্যানুবাদ করেন ।	ভাগবত
বিশারদ চক্রবর্তী	লক্ষ্মীনারায়ণের নির্দেশে	মহাভারতের বিরাট পর্ব, বন পর্ব ও কর্ণ পর্বের অনুবাদ করেন।	মহাভারত
পুরুষোত্তম ঠাকুর (শঙ্করদেবের পৌত্র)	লক্ষ্মীনারায়ণের নির্দেশে	নব-ঘোষা	দার্শনিক চিন্তাধারা মূলক
কবিরত্ন ভট্টদেব	শঙ্করদেবের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দুটো ভাগ করে দামোদরদেব মাধবদেব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 'দামোদরিয়া একশরণমত' প্রতিষ্ঠা করেন। এইসময় তিনি মহারাজা লক্ষ্মী-নারায়ণকে দীক্ষিত করেন। এই দামোদর দেবের নির্দেশে কবিরত্ন ভট্টদেব সাহিত্য রচনা করেন।	'কথা ভাগবত' রচনা করেন ও তার টীকা সহ ভাঙনী প্রস্তুত করেন।	ভাগবত
দৈত্যারী ঠাকুর	লক্ষ্মীনারায়ণ	গুরুচরিত গ্রন্থটিতে এই সময় (১৫৯৬) মাধবদেবের বেহার রাজধানীতে অবস্থানের এবং মহারাজা লক্ষ্মী-নারায়ণের বিদ্যমঞ্চে থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।	
কবিশেখর	লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র মহারাজা বীরনারায়ণ (১৬২৭-১৬৩২)	মহাভারতের কিরাত পর্ব অনুবাদ করেন।	মহাভারত

কবি	যে রাজার পৃষ্ঠপোষক ছিল	কাব্য/রচনা	প্রকরণ
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ	বীরনারায়ণের পুত্র প্রাণনারায়ণ (১৬২৫ -১৬৬৫)	মহাভারতের আদিপর্বের অনুবাদ সমাপ্ত করে দ্রোণ পর্বেরও একটি বিরাট অংশ অনুবাদ করেন।	মহাভারত
দ্বিজ কবিরাজ	মোদনারায়ণ (১৬৬৫ -১৬৮০)	পূর্বোক্ত কবির রচিত দ্রোণ-পর্বের অবশিষ্ট অংশ অনুবাদ করেন।	মহাভারত
দ্বিজ রামসরস্বতী	মহিন্দ্রনারায়ণ	মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অনুবাদ করেন।	মহাভারত

মহীন্দ্রনারায়ণের পর সিংহাসনে বসেন মহারাজা রূপনারায়ণ। তাঁর রাজত্বকালে মুঘল আক্রমণ মূলত তীব্র হয়। সম্ভবত রাজনৈতিক দুর্যোগের ফলে রাজ্যে সাহিত্য চর্চা বিঘ্নিত হয়েছিল। রূপনারায়ণের পর রাজত্ব করেন উপেন্দ্রনারায়ণ। তাঁর সময়ে পুনরায় সাহিত্যচর্চা শুরু হয়,

কবি	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	কাব্য/রচনা	প্রকরণ
দ্বিজ নারায়ণ	উপেন্দ্রনারায়ণ (১৭১৪-১৭৬৩)	'নারদীয় পুরাণ' অনুবাদ করেন।	পুরাণ
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ (ইনি প্রাণ-নারায়ণের সভা কবি নন)	উপেন্দ্রনারায়ণ (১৭১৪-১৭৬৩)	'বিরাট পর্ব' অনুবাদ করেন	মহাভারত

মহারাজা উপেন্দ্রনারায়ণের পর রাজ্যে পুনরায় বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে সাহিত্য রচনা আবারও স্তব্ধ হয়ে যায়। অবশেষে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এলে পুনরায় সাহিত্য সাধনা শুরু হয়। বলা যেতে পারে এই সময়ই ছিল (১৮০০-১৮৩৯) কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ।

কবি	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	রচনা	প্রকরণ
হরেন্দ্রনারায়ণ	হরেন্দ্রনারায়ণ	সুন্দরকাণ্ড	রামায়ণের অনুবাদ
দ্বিজ ব্রজকুমার	হরেন্দ্রনারায়ণ	লঙ্কাকাণ্ড	
সারদানন্দ, সতানন্দ, বসুরাম	হরেন্দ্রনারায়ণ	উত্তরকাণ্ড	
দেবীনন্দন, শ্রীনাথ দ্বিজ, রঘুরাম	হরেন্দ্রনারায়ণ	কিস্কিন্ধা কাণ্ড	
রুদ্রদেব শর্মা	হরেন্দ্রনারায়ণ	অরণ্যকাণ্ড	
রঘুরাম	হরেন্দ্রনারায়ণ	অযোধ্যা কাণ্ড	রামায়ণ
রামনারায়ণ	হরেন্দ্রনারায়ণ	বনপর্ব, নলদময়ন্তী উপাখ্যান	মহাভারতের অনুবাদ
মহীনাথ	হরেন্দ্রনারায়ণ	প্রস্থানিক পর্ব, অশ্বমেধ পর্ব	
দ্বিজ বৈদ্যনাথ	হরেন্দ্রনারায়ণ	যৌষল পর্ব, বন পর্ব, শান্তি পর্ব	
মাধবচন্দ্র	হরেন্দ্রনারায়ণ	স্বর্গারোহন পর্ব	
মনোহর দাস	হরেন্দ্রনারায়ণ	কর্ণপর্ব	
দ্বিজ রামনন্দন	হরেন্দ্রনারায়ণ	গদাপর্ব	
হরেন্দ্রনারায়ণ	হরেন্দ্রনারায়ণ	শান্তি পর্ব, ঐশিক পর্ব	
দ্বিজ রঘুরাম	হরেন্দ্রনারায়ণ	ভীষ্ম পর্ব, শান্তি পর্ব, শল্যপর্ব	
দ্বিজ লক্ষ্মীরাম	হরেন্দ্রনারায়ণ	কর্ণ পর্ব	
দ্বিজ জগন্নাথ	হরেন্দ্রনারায়ণ	ভাগবত (ষষ্ঠ খণ্ড)	ভাগবত
হরেন্দ্রনারায়ণ	হরেন্দ্রনারায়ণ	বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (মধ্য খণ্ড) বৃহদ্ধর্ম পুরাণ (উত্তর খণ্ড) স্কন্ধ পুরাণ (ব্রহ্মোত্তর খণ্ড)	

কবি	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	রচনা	প্রকরণ
রিপুঞ্জয়	হরেন্দ্রনারায়ণ	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (ব্রহ্ম খণ্ড)	পুরাণের অনুবাদ
বৈদ্যনাথ	হরেন্দ্রনারায়ণ	ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ (ব্রহ্ম খণ্ড)	
মাধবচন্দ্রশর্মা	হরেন্দ্রনারায়ণ	বিষ্ণু পুরাণ	
রামনন্দন	হরেন্দ্রনারায়ণ	ধর্ম্মপুরাণ	
মণিরাম দাস	হরেন্দ্রনারায়ণ	গরুড় পুরাণ	
দ্বিজ ভূতনাথ	হরেন্দ্রনারায়ণ	ষড় ঋতুবর্ণন (মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহারের সংক্ষিপ্ত ভাবানুবাদ)	ঋতুসংহারের ভাবানুবাদ
মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ	মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ	'উপকথা' (এটি শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিতকারে প্রকাশিত)	উপাখ্যান
মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ	মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ	রাজপুত্র উপাখ্যান শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত	
দ্বিজ ব্রজসুন্দর	মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ	হিতোপদেশের মূল গল্পগুলো পদ্য ছন্দে ভাবানুবাদ	
হরেন্দ্রনারায়ণ	মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ	ক্রিয়াযোগসার (শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত)	
হরেন্দ্রনারায়ণ	মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ	গীতাবলী, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল কর্তৃক সম্পাদিত এবং কোচবিহার সাহিত্য সভা থেকে প্রকাশিত	
সারদানন্দ দাস	হরেন্দ্রনারায়ণ	কাশী খণ্ড	
রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী	হরেন্দ্রনারায়ণ	গোসানী মঙ্গল (ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক পুনঃ সম্পাদিত ও প্রকাশিত। ১৩০৫ সালে গোসানীমারী হাইস্কুলের হেড পণ্ডিত ব্রজচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য সম্পাদিত ও প্রকাশিত হয়।)	মঙ্গল কাব্য

কবি	যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা করেন	রচনা	প্রকরণ
দ্বিজ মহীনাথ শর্মা	শিবেন্দ্রনারায়ণ	মার্কণ্ডেয় চণ্ডী	মঙ্গল কাব্য
মাধবচন্দ্র	শিবেন্দ্রনারায়ণ	চণ্ডীকার ব্রত কথা	
রিপুঞ্জয় দাস	শিবেন্দ্রনারায়ণ	রাজবংশাবলী	শাক্তপদাবলী
মুন্সি জয়নাথ ঘোষ	শিবেন্দ্রনারায়ণ	রাজোপাখ্যান	
মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ	শিবেন্দ্রনারায়ণ	সংঙ্গীত সংগ্রহ, শ্রীশরচ্চন্দ্র ঘোষাল সম্পাদিত এবং কোচবিহার সাহিত্যসভা থেকে প্রকাশিত।	

এবারে আমরা উপরে উল্লিখিত কাব্যগুলির মধ্য থেকে শিব প্রসঙ্গ উদ্ধারের চেষ্টা করবো। এতে হয়তো সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে পরিপূর্ণ রূপে আমরা শিব চরিত্রকে পাব না। বিভিন্ন প্রসঙ্গে হয়তো অনেক গ্রন্থে শৈবভাবনার প্রকাশ ঘটেছে, যেমন বিভিন্ন কাব্যের বন্দনা অংশ, দেবদেবী প্রসঙ্গ ইত্যাদি অংশ। তবে স্বতন্ত্রভাবে যেসব কাব্যে শিব আলাদা গুরুত্ব পেয়েছে এখানে সেইসব কাব্য নিয়েই আলোচনা করা হবে। এক্ষেত্রে বিশ্বসিংহের রাজসভায় মনকর ও দুর্গাবরের 'মনসা কাব্য' ও 'বেউলা আখ্যান', মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের 'ভক্তিগীতি সংগ্রহ', মাধবচন্দ্রের 'চণ্ডীকার ব্রতকথা' ও রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগীর 'গোসাসনীমঙ্গল' কাব্য নিয়ে আলোচনা করা হবে।

মনকর ও দুর্গাবর-এর 'মনসা- কাব্য' ও 'বেউলা আখ্যান'

মনকর ও দুর্গাবরের মনসামঙ্গল ষোড়শ শতকের দুটি বিশিষ্ট গ্রন্থ, সেখানে অভিনবত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। শিব যেন এতদঞ্চলের লোকায়ত দেবতা হিসেবেই পরিচিত। এখানে প্রথমে দু'জন কবির ব্যক্তি পরিচয় দিয়ে তাঁদের কাব্য অবলম্বনে শিব প্রসঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করা যেতে পারে।[৬]

মনকরের ব্যক্তি পরিচয় ও সময় সীমা ঃ

মনসামঙ্গল কাব্যধারায় উত্তরবঙ্গের দু'জন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মনকর ও দুর্গাবর ।

মনকরের মনসামঙ্গল কাব্যের নাম 'মনসা-কাব্য' এবং দুর্গাবরের মনসামঙ্গল কাব্যের নাম 'বেউলা আখ্যান'। মনকরের কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব, শিবের মালঞ্চ নির্মাণ, হর-গৌরীর বিবাহ, পদ্মার জন্ম প্রভৃতি প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে। আর দুর্গাবরের কাব্যে চাঁদ-মনসার দ্বন্দ্ব এবং শেষ পর্যন্ত বেহুলার লাস্য নৃত্যের মধ্য দিয়ে লখীন্দর সহ চাঁদসদাগরের ছয় পুত্রের জীবন লাভ, সপ্তডিঙ্গা উদ্ধার প্রসঙ্গ রয়েছে। অর্থাৎ দেখা যায় দুই কবির কাব্যে কাহিনীগত দিক থেকে ধারাবাহিকতা রয়েছে। মনকর যেখানে শেষ করেছেন, দুর্গাবর সেখান থেকেই শুরু করেছেন।

কবি মনকরের কাব্য পাঠে তাঁর মায়ের নাম ব্যতীত কিছুই জানা যায় না। কাব্যের বন্দনা অংশেই কবি আত্মপরিচয়ের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন সেখানেই তাঁর মায়ের নাম উল্লেখ আছে। যদিও কাব্যটি সরস্বতী বন্দনা দিয়ে শুরু। কিন্তু কবি কাব্যের গুরুবন্দনা অংশে এই আত্মপরিচয়ের আভাস দিয়েছেন —

''গুরু গুরু বন্দিয়া গাইবো ...।
... নাম লইতে ডরাঞ।।
শ্যাম সুন্দর গুরু (হাস্যান)।
গুরুর গীত তভো নাম...।।
(অনদ) বয়নে গুরু আই (কুল) বখানি।
গুরুর গীতে ভোল গৈলা এ ভাটি উজানি।।
গুরু গুরু বন্দিয়া গাইবো গুরুর দুই পাও।
তাত পাচে বন্দিয়া গাইবো গোসাঁনীর পাও।।
দশ মাস দশ দিন গনিতে ভৈলা ভার।
জার পদে দেখিলো মই সকলে সংসার।।
* * *
উঠিতে বোলই (মাই) বসিতে ...।
কালিন্দ্রী মাওর গুণ সুজন নাযায়।'' পৃ-২

এই আত্মপরিচয় সূচক অংশথেকে একমাত্র কবির মায়ের নাম যে কালিন্দী তার উল্লেখ পাই। মনে হয় পদ মধ্যের খণ্ডিত অংশে (... অংশ) কবির পিতার নাম বা কবির গুরুর নাম বর্ণিত ছিল। কিন্তু খণ্ডিত অংশ বলে সেগুলি আজও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

এছাড়াও কাব্যের হর-পার্ব্বতীর বিবাহ খণ্ড অংশে কবির কালজ্ঞাপক কিছু তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ আছে —

''প্রথমে বন্দিয়া গাইবো নারায়ণ সুরপতি।
ব্রহ্মা আদি দেব বন্দো জার সৃষ্টি স্থিতি।।
ধর্ম কর্ম বন্দিয়া গাইবো গঙ্গা পার্ব্বতী।
তাত পাচে বন্দিয়া গাইবো লক্ষ্মী সরস্বতী।।
কামরূপর কামাখ্যা বন্দো ঢেকেরিআর নাতি।
পাতালর নাগ বন্দো এ নাগ দেওতি।।

* * *

কামতাইর রাজা বন্দো রাজা জল্পেশ্বর।
একশত মহিষী বন্দো অঠার কুয়র।।'' পৃ-১৬

এখান থেকে স্পষ্ট কবি রাজা জল্পেশ্বরের সমসাময়িক বা উক্ত রাজার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে জানা যায়। এছাড়াও এখান থেকে স্পষ্ট কবি ছিলেন ঢেকেরিয়া রাজার নাতি। তিনি এই ঢেকেরিয়া রাজাকে তাম্র শাসনের সময়ের মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের বংশ বলে মনে করেছেন। আর এই তাম্র শাসনের কোনো সময়কালের উল্লেখ নেই। তবে পণ্ডিতেরা মনে করেন এই শাসনকাল আনুমানিক খ্রিস্ট্রিয় দ্বাদশ শতক। কিন্তু এই ' ঢেক্কর' অংশ যে পুরানো কামরূপ রাজ্যের অংশ এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈশ্বর ঘোষকে কামরূপ রাজ্যের একজন সামন্ত প্রজা বলে মনে করলেও কাব্যে উল্লিখিত ' ঢেকেরিআর নাতি' যে সেই বংশের বংশধর তার কোনো প্রমাণ কাব্য মধ্যে নেই। একদিকে যেমন কবিকে ঢেকেরিয়ার নাতি বলে মনে করা হয়, তেমনি অন্যদিকে মনে করা হয় যে কবির পূর্ব পুরুষ ঢেকেরি পরগণা ত্যাগ করে পরবর্তীকালে কামতা রাজ্যের কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করে। পরবর্তীকালে তার নামানুসারে ঢেকুরিয়া হয়। মনকর যদি তার নাতি না হতেন তবে এভাবে তাঁর নিজের বর্ণনা হয়তো করতেন না। অর্থাৎ এখান থেকেও স্পষ্ট মনকর ঢেকেরিয়ার নাতি। ঢেকেরিয়ার নাতি হলে কিছু সমস্যাও আছে, তাই কবিকে ঢেকেরিয়ার নাতির পৃষ্ঠপোষক বা গুরু রূপে মেনে নিতে আপত্তি থাকার কথা নয়। এ বিষয়ে শশী শর্মা উল্লেখ করেছেন — ''কালিরাম মেধিয়ে 'কামরুপর কামাখ্যা বন্দো ঢেকেরিআর নাতি' বোলা চরণটোর গইনা লৈ 'দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত মালদোয়ারর ব্রাহ্মণ জমিদারর চেরেষ্টাত রক্ষিত এখন তামর ফলিত' যিজন মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ বোলা সামন্তরজার নাম উদ্ধারহৈছে, সেইজন ঈশ্বরঘোষক বুলিছে 'ঢেক্করীয়া' বংশধর খ্রীষ্ট্রীয় দ্বাদশ শতাব্দীর এজন সামন্তরজা। সেই বংশরে সিংহ উপাধিধারী আন এগরাকী এয়োদশ শতিকার রজার নাম উদ্ধার হোয়া বুলিও কালিরাম মেধিয়ে তেঁওর আলোচনাত উল্লেখ করিছে। তেঁও তারপরা সিদ্ধান্তলৈ আহিছে যে ' ঢেকেরিয়া'

এটা রাজবংশ আছিল, সেই বংশই ৩/৪ শ বছর জুরি রাজত্ব করিছিল আরু কবি মনকর সেই রাজবংশর কোনো এজন রজার নাতি।''[৭]

ঢেকেরিয়ার নাতি, কামতাইর রাজা, রাজা জল্পেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখ থেকে মনকরকে এতদ্‌ঞ্চলের কবি বলেই মনে হয়। পদটিতে উল্লেখ আছে 'কামতাইর রাজা বন্দো, রাজা জল্পেশ্বর' এখানে জল্পেশ্বর প্রসঙ্গ থেকে কবির সময়সীমাকে আমরা নির্ধারণ করতে পারি। কেননা, কামতার রাজার সময় এবং জল্পেশ্বরের সময় নির্ধারণ হলেই মনকরের সময় নির্ধারণ করা সহজসাধ্য হবে। আমরা জানি জলপাইগুড়ির আর এক রাজার নাম পৃথু রাজা। অনেকেই এই পৃথু রাজাকে ও জল্পেশ্বরকে এক রাজা বলে মনে করেছেন। কিন্তু বুকানন হেমিল্টন এই দু'জন রাজাকে এক বলে মনে করেন নি। খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদ উল্লেখ করেছেন জল্পেশ্বরের মন্দিরের কয়েক ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'পৃথু রাজার গড়ে' জল্পেশ্বরের রাজধানী ছিল। এখান থেকে স্পষ্ট পৃথুরাজার পর জল্পেশ্বরের আবির্ভাব। সেক্ষেত্রে দু'জন রাজা আলাদা। তবে পৃথু রাজা ও জল্পেশ্বরের ব্যবধানও খুব বেশি নয়। আবার আমরা পৃথু রাজার সময় সীমাও সঠিক ভাবে নিরূপণ করতে পারি না। তবে এটুকু জানি যে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দে পৃথু রাজা বখতিয়ার খলজিকে পরাজিত করেছে। সেক্ষেত্রে পৃথু রাজার সময়সীমা ১২০৬ এর পর হবে এটা নিশ্চিত। অন্যদিকে পৃথু রাজাকে জল্পেশ্বর মনে না করার আর একটি বড় কারণ হল পৃথু রাজা যে সময়ের সেই দ্বাদশ বা এয়োদশ শতাব্দীতে কামতার রাজার আবির্ভাব হয়নি। কামতা রাজ্যের আবির্ভাব চতুর্দশ শতকে। আমরা জানি কামতা রাজ্যের প্রথম রাজা নীলধ্বজ হুসেন শাহের আক্রমণে পরাজিত হয় এবং তার রাজ্য ধ্বংস হয়। এই সময় হল ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দ। পরে কামতার এই ধ্বংসস্তুপের উপর বিশ্বসিংহ কোচ রাজ্যের পত্তন ঘটান। এ বিষয়ে মূলকাব্যের ভূমিকা অংশে উল্লেখ আছে ''জল্পেশ্বর আরু কমতার রজা' আমার বিশ্বাস সম্ভবতঃ কোঁচ রজা বিশ্বসিংহ। বিশ্বসিংহক কমতার রজা বুলি কবি দুর্গাবরেও উল্লেখ করিছে। জল্পীশ শিব আরু কমতেশ্বরীর মন্দির বিশ্বসিংহর রাজ্যর ভিতরতে আছিল। বিশ্বসিংহই প্রথমতে শ্রীকোণাত (চিকনা) রাজধানী পাতিছিল, আরু পাছত কোচবেহারত নতুনকৈ রাজধানী পাতে। সূর্য্যখড়ি দৈবজ্ঞর দরং রাজবংশাবলীর পরা জনা যায় যে কমতেশ্বৰী মন্দির বিশ্বসিংহই নতুনকৈ নির্ম্মাণ করায়। এই বিশ্বসিংহরে ভায়েক শিশুয়ে (শিবসিংহ) জলপাইগুরিত এখন নতুন রাজ্য পাতি সামন্ত রজা স্বরূপে রাজত্ব করে। জলপাইগুরির বর্ত্তমান জমিদার 'রায়কট' বংশ এই শিশুয়ে বা শিবসিংহরে বংশধর। এই কথারপরা অনুমান করির পারি যে কবি মনকরে 'জল্পেশ্বর আরু কমতাইর রজা সম্ভবত: বিশ্বসিংহকে বুলিছে।''[৮] সুতরাং বিশ্বসিংহের সময়েই যে মনকর কাব্য রচনা করেছেন একথা স্বীকার করতেই হবে।

আবার ভাষার দিক থেকে দেখলেও মনে হয় মনকরের ভাষা পঞ্চদশ শতকের। এ বিষয়ে শশী শর্মা উল্লেখ করেছেন ‘‘কিন্তু মনকরর মনসাকাব্যর ভাষাক সেই সময়র অসমীয়া ভাষার নিদর্শন বুলিব নোয়ারি; তেয়ঁর ভাষা মাধবকন্দলির রামায়ণর ভাষাতকৈও বেছি অবার্চীন হে। চরিত পুথিমতে মাধবকন্দলি শংকরদেবর তিনি পুরুষ আগর মানুহ। মাধবকন্দলির কাল চতুর্দশ শতিকার ভিতরত নির্ণয় করা হয়। তেতিয়া হলে মনকরর কাল ১৫ শ শতিকা লৈহে যায়।’’[৯]

কবি মনকরের ‘মনসাকাব্যে’ শিব ঃ

মনকর রচিত ‘মনসাকাব্য’ তিনটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশ সৃষ্টি খণ্ড, দ্বিতীয় অংশ ‘হর-পার্ব্বতীর বিবাহ’ এবং তৃতীয় অংশ ‘পদ্মার জন্ম’। সৃষ্টি খণ্ডে মোট ১৩টি গান, ‘হর-পার্ব্বতীর বিবাহ’ খণ্ডে ৪৮ টি গান এবং ‘পদ্মার জন্ম’ অংশে মোট ১৫ টি গান আছে। অর্থাৎ মনকর রচিত ‘মনসাকাব্য’র মোট ৭৬ টি গান রয়েছে। তিনটি অংশেই আমরা শিবের পরিচয় পাব।

সৃষ্টি খণ্ডে শিব ঃ

সৃষ্টি খণ্ডের মধ্যে এই জগত তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কি করে সৃষ্টি হচ্ছে সে কথা উল্লেখ রয়েছে। যা ধর্মমঙ্গল কাব্যের মতো মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল এবং মনকর রচিত মনসামঙ্গল কাব্যের মধ্যেও রয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রায় প্রত্যেকটি পুরাণের মধ্যেও এই সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মনকর রচিত ‘মনসা-কাব্য’ থেকে আমরা জানতে পারি যে, আদি নিরঞ্জনই এই চরাচর জগতের মূল। তিনিই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড মাঝে অবস্থান করে জল, স্থল, পশু, পাখি, মানুষ সহ বৃক্ষ, লতা সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ সৃষ্টির আদিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একেবারেই শূন্য ছিল। এই মহাশূন্যের মধ্যে আশ্রয় করে ধর্ম নিরঞ্জনের মনে সৃষ্টির বাসনা জন্মায়। ফলে ধর্ম নিরঞ্জন জল, স্থল,বাসুকি সৃষ্টি করেন। পরে ধর্ম নিরঞ্জনের শরীরের ঘাম থেকে আদ্যাশক্তির সৃষ্টি হয়। এই আদ্যাশক্তি থেকেই পরে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জন্ম হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর জন্মের পর তাঁরা তপস্যাতে মগ্ন হন। এই পরিস্থিতিতে ধর্ম নিরঞ্জন তাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য দুর্গন্ধ শব রূপে নদীর জলে ভেসে তিন জনের কাছেই দেখা দেন। প্রথমে ব্রহ্মার কাছে আসলে ব্রহ্মা দুর্গন্ধে, ঘৃণাবশত ধর্ম নিরঞ্জনকে ত্যাগ করেন। পরে একইভাবে সেই শব বিষ্ণুর নিকট আসলে বিষ্ণুও তা ত্যাগ করেন, কিন্তু শিব ধর্ম নিরঞ্জনকে চিনতে পারায় তাকে ত্যাগ করেননি। বরং সেই গলিত মৃতদেহ জল থেকে তুলে এনে শুশ্রূষা করে ভালো করেন। এতে ধর্ম খুশী হন এবং আদ্যাশক্তির সঙ্গে শিবের বিবাহের কথা বলেন।

‘‘তপ এরি মহেশ্বরে ধ্যান করি চাইল।
আতাই মারিল গোসাঁই দরদন পাইল।।
দহত নামিয়া ধরিলন্ত আথে বেথে।
কতো কাখে লয়ে গোসাঁই কতো লয়ে মাথে।।
মাথাত করিয়া কাখরিক লাগি নিল।
শঙ্খ জল আনি গোসাঁই মুখত ঢালিল।।
চেতন লভিয়া জে অনাদি মহাদেব।
ভালেতো চিনিলি মোক পুতা সদাশিব।।
মুক মেল পুতা তোর গর্ভে লঞেগা বাস।
মহেশ্বরে বোলে কেনে করা উপহাস।।
মোর গর্ভে বাসা লৈলে হৈব কোন কর্ম্ম।
অর্দ্ধ অঙ্গ মহাদেৱ অর্দ্ধ অঙ্গ ধর্ম্ম।।’’ পৃ-৯/১০

এরপর আমরা দেখি ধর্মের কথামত শিবই আদ্যাশক্তিকে বিবাহ করেন এবং দুর্গাকে লোহার মঞ্জুসে করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

‘‘বিহা করাই থৈলা জটার ভিতর।
লোহার মঞ্জুসে দুর্গা ভাসাইলা সাগর।।’’ পৃ-১১

অন্যদিকে আমরা দেখি হেমন্ত ঋষির ঘরে কোনো সন্তান না থাকায় হেমন্ত ঋষি তপস্যায় মগ্ন হন। এমন সময় সামনে লোহার মঞ্জুসে দুর্গাকে ভেসে আসতে দেখে তাকে ঘরে নিয়ে আসেন এবং লালন পালন করে তাকে বড় করেন। এই দুর্গাকে বিবাহের জন্য শিব মালঞ্চ বন নির্মাণ করেন এবং নারদের প্ররোচনায় এই বনেই তার সঙ্গে মিলিত হন।

মনকর রচিত এই সৃষ্টিতত্ত্বে শিবের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ‘হরের আদেশে ব্রহ্মা স্রজিল সকল’ কিংবা ‘অর্দ্ধ অঙ্গ মহাদেব অর্দ্ধ অঙ্গ ধর্ম্ম’ উক্তি দুটি থেকেই তা স্পষ্ট। শেষোক্ত উক্তি থেকে ধর্ম ও শিবকে একই মনে করা হয়েছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে এখানেই সৃষ্টিতত্ত্ব তান্ত্রিক বজ্রযান ও শৈব নাথ সম্প্রদায়ের ধর্মমতের সংমিশ্রণ ঘটেছে। মনকরের এই সৃষ্টি তত্ত্বই ধর্ম্ম ও শৈব নাথ ধর্মের একটি লুপ্তপ্রায় স্তর। এই সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে শশী শর্মা উল্লেখ করেছেন ‘‘সৃষ্টির বাসনা হোয়াত তেওঁ সৃষ্টি করিলে জড়প্রকৃতি মহামায়াক। মহামায়াৰ পরা সৃষ্টি হল মহৎতত্ত্ব চিত্তর। চিত্তর তিনি রূপ - ১. সাত্বিক, ২. রাজসিক আরু ৩. তামসিক। এই তামসিকর পরা সৃষ্টি হ’ল ক্রমে - শব্দ, আকাশ, স্পর্শ, বায়ু, রূপ, অগ্নি, রস, পানী, গোন্ধ, বসুমতী (পৃথিবী)র। রাজসিকর

পরা সৃষ্টি হ'ল - চকু, কাণ, নাক, জিভা, মুখ, ছাল, হাত, ভরি, গুহ্য, লিঙ্গ। এই দশ ইন্দ্রিয়র লগতে সাত্বিকর পরা সৃষ্টি হ'ল - দশ ইন্দ্রিয়র দশ দেবতা - বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, বিষ্ণু, দিশ, আদিত্য, মিত্র, প্রজাপতি, অগ্নি আরু অশ্বিনী কুমারর।

এইবরর লগতে সৃষ্টি হ'ল মনর। এক মনরে যেন চারিটা রূপ - মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত। এই চারির কাম - মনন, বোধন, অভিমান, চিন্তন। এই চারিটার উপাস্য দেৱতা হল অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুম্ন, সংকর্ষণ আরু বাসুদেব।

তমসিকর পরা অহংকারর উৎপত্তি বুলিও কোয়া হৈছে। এই অহংকারর পরা উদ্ভব হৈছে পঞ্চ মহাভূত আরু পঞ্চ গুণর। পঞ্চ মহাভূত হল - ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। আরু পঞ্চ গুণ হল - শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।''[১০]

'হর-পার্ব্বতীর বিবাহ খণ্ডে' শিব ঃ

এই অংশে শিব, পার্বতী, গঙ্গা, হেমন্ত ঋষি, মেনকা, নারদ প্রভৃতি চরিত্রের আনাগোনা রয়েছে। এক্ষেত্রে শুধু শিব'ই নয়, বাকি চরিত্রগুলিও কিন্তু হয় দেব-দেবী পর্যায়ভুক্ত, নতুবা ঋষি-ঋষিয়ানি পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু এ ধরনের চরিত্র হলেও মনকর রচিত কাব্যে এরা কেউই দেব-দেবী কিংবা ঋষি-ঋষিয়ানিতে থাকেনি। এরা প্রত্যেকেই শেষ পর্যন্ত মর্ত্য পৃথিবীর ধূলি ধূসরিত মানুষে পরিণত হয়েছে। যে শিব আদিদেব তথা এই ত্রিজগতের পতি, যার আদেশে ব্রহ্মা সব কিছু সৃজন করেছেন, বিশ্বকর্মা সৃষ্টিকর্তা রূপে খ্যাতি পেয়েছেন, কুবের ধন-দৌলত দিয়েছেন, সেই শিব এখানে অঙ্কিত হয়েছেন একজন সামান্য দরিদ্র মানুষরূপে, কামুক পুরুষরূপে।

কাব্য মধ্যে এই অংশের শুরুতেই আমরা দেখি শিব মালঞ্চ নির্মাণের জন্য প্রস্তুত। এজন্য বিশ্বকর্মাকে আদেশ করেছেন।

''ধর ধর কুবের তাম্বুল খায়।
বিশ্বকর্ম্মে জেহি খোজে আনিয়া জোগায়।।
গোসাঁইর আদেশ কুবের নাথাকিলা রই।
ব্যালিশ কোটি বস্তু দিলা ভাণ্ডারক জাই।।
বারগাচি নারিকেল তেরগাচি তাল।
তাহার তলাত নিয়া পতিলা আফার।
মাটি তুলি বিশ্বকর্ম্ম আফার পাতিল।
ঠামেকামে আনিয়াজে হাথিনা থাপিল।।

সুবর্ণ কুমুড়া আনি হাথিনাত দিল।

নিয়রি উপরে দিয়া কর্ম্ম আরাম্ভিল।।'' পৃ-১৭/১৮

এভাবেই বিশ্বকর্মা মালঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু করেন এবং নানান পরিশ্রমে শিবের মালঞ্চ নির্মাণ করেন।

'' সোনার লাঙ্গল গোসাই রূপার ফাল।

বাসুয়া বলদে জুড়িছে হাল।।

বার চাহ দিলা গোসাই তের চাহ মই।

তথাপি নিচিঙ্গিল দুর্ব্বালুই।।

ইটা মাটি ভাঙ্গি করিলা চূর।

থুপুরা পেলাই গোসাঁই বহুদূর।।'' পৃ-১৯

এভাবেই মালঞ্চ নির্মাণের কাজ শেষ করে ফুলের বীজের প্রয়োজন হলে শিব তার পত্নী গঙ্গাকে অনুরোধ করেন —

''আইস গঙ্গা ভায়া তাম্বুল খায়।

ব্যালিস ফুলেৰ বিচি আনিয়া দেয়।'' পৃ-১৯

এভাবেই মালঞ্চের কাজ শেষ হলে কিছু দিন পর মালঞ্চ টগর, জুই, বেল, কদম, করবী, চম্পা প্রভৃতি ফুলের সৌন্দর্যে সুরভিত হয়ে ওঠে। তখন মালঞ্চ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দ্বারীর ব্যবস্থা করেন। এরপর শিব দুর্গার জন্য উতলা হয়ে পড়েন , কেননা দুর্গাকে পাবার আশাতেই শিবের এই মালঞ্চ নির্মাণ । তাই মালঞ্চ নির্মাণ শেষে শিব দুর্গাকে কি করে পাবে সেই চেষ্টা করতে থাকেন।

''দুর্গাক লাগিয়া গোসাঁই পাতিলা উপাই।

দুর্গার নিমিত্তে গোসাঁই বাতুল পরাই।'' পৃ-২১

দুর্গার অন্বেষণে শিব সমস্ত দেবগণকে ডাকেন এবং কার ঘরে দুর্গা আছে একথা জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু শিবের এই প্রশ্নের সদুত্তর কোনো দেবতা দিতে না পারায় নারদকে 'ধর্ম্মখড়ি' চালাতে বলেন এবং সেখান থেকেই দুর্গার খোঁজ পাওয়া যাবে এমনটাই বিশ্বাস করেন। নারদের কথামতো সেই 'ধর্ম্মখড়ি' চালানো হলে সেখান থেকে হেমন্ত ঋষির নাম উঠে আসে —

''নারদে বোলে এ গোসাঁই চলায়ো ধর্ম্মখড়ি।

এখনে জার ঘৰে আচে দুর্গাবালি।।

নারদর বাক্যে গোসাঁই রঙ্গ ভৈলা মন।

স্থানে স্থানে থইল ত্রিদশ দেবগণ।।

ত্রিদশর ভাগে খড়ি থৈলা ভাগে ভাগ।
খড়ি চলি উঠি গৈল হেমন্তর আগ।।'' পৃ-২৩

নারদ এরপর হেমন্ত ঋষির ঘরে গিয়ে দুর্গাকে মালঞ্চে আসার কথা বলেন। এতে মেনকা ও হেমন্ত ঋষিও দুজনেই আপত্তি করেন, কিন্তু দুর্গা তার নিজের সিদ্ধান্তে মালঞ্চে আসার জন্য উদ্যত হন।

''দুর্গা করিলন্ত গহ সাজি আতাই মোক দেহ
আমি জাইবো গোসাঁইর ফুল বনে।'' পৃ-২৪

দুর্গা যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাকে আর কেউই বারণ করতে পারেনি। তাই দুর্গা নিজেকে নানান সাজে সজ্জিত করে সিংহকে বাহন করে শিবের মালঞ্চে গমন করেন।

দুর্গা মালঞ্চে প্রবেশ কালে দ্বারীর বাঁধা না মেনে নানান ফুল তুলতে থাকেন। এতে দ্বারী শিবকে সেই সংবাদ জানান এবং শিব নিজে তখন দুর্গার সঙ্গে দেখা করার জন্য নানান সজ্জায় সজ্জিত হন। তার সজ্জার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন —

''মুণ্ডত লৈলা গোসাঁই জটার ভার।
পিঠিত বোকণ্ডি হারের মাল।।
কর্পটী পরিধান ভুজঙ্গ অঙ্গে।
ভূত প্রেত গোসাঁই সাজিলা সঙ্গে।।
খটাঙ্গ ডম্বরু ত্রিশূল ধারী।
বৃষভবাহনে আসন করি।।
চলিলা দেবরাজ ডমরু বায়।
ভূত প্রেত সঙ্গে নাচিয়া জায়।।'' পৃ. ২৯/৩০

এভাবে শিব হারমালা, সর্প, ডমরু, ত্রিশূল এবং ভুত-প্রেতদের সঙ্গে নিয়ে মালঞ্চে উপস্থিত হন। মালঞ্চে গিয়ে অনেক খোঁজার পরে শিব দুর্গার দেখা পান অশোকের তলে। সেখানে দুর্গা নিদ্রায় আচ্ছন্ন। শিব দুর্গার নিদ্রা ভঙ্গ করার কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে তার হৃদয়ে হাত দেন।

''দুর্গাক দেখি গোসাঁই আকুল চিত্ত।
তেবেসে গৈল গোসাঁই শিবের ভিত।।
ডাক দিয়া তুলিম দেবি পাইবেক ডর।
লাস করি হাত দিলা হৃদি উপর।'' পৃ-৩০

তখন দুর্গার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। এরপর শিব দুর্গার আঁচল ধরলে দুর্গা ভয় পান। কেননা দুর্গা যে সজ্জায় সজ্জিত হয়ে এসেছে তা যদি নষ্ট হয় তবে হেমন্ত ঋষি বুঝতে পারবেন, ফলে দুর্গা

কলঙ্কিত হবে। কিন্তু শিব এসব কথা শোনার পাত্র নয়, সে ছলে-বলে কৌশলে এই মালঞ্চ মধ্যে দুর্গার সঙ্গে মিলিত হন।

''আনন্দ লভিলা গোসাই জে দরুগার বোলে।
অধরে চুম্বিয়া রে তুলিয়া লৈলা কোলে।'' পৃ. ৩১

শিব যে পূর্ব পরিকল্পনা মতো দুর্গার সঙ্গে মিলিত হলেন একথাও দুর্গাকে শিব জানিয়ে দেন।

'' তোমার লাগিয়া মই মালঞ্চ স্রজিলো।
উপায় করিয়া দুর্গা মই তোমাক আনিলো।।
তোমার মরণ দুর্গা ভৈল শতবার।
তোমার মুণ্ডের মালা মোর গলের হার।
তুমি দেবী আমি দেব ত্রিভূবনে সার।
তোমার লাগিয়া ভৈলো শিব অবতার।'' পৃ. ৩২

শুধু তাই নয়, দুর্গা যেন কলঙ্কিত না হন তার জন্য শিব দুর্গাকে নানান চতুরতার কথাও শিখিয়ে দেন। তারপরেও যদি না হয়, কিংবা যদি হেমন্ত ঋষি অষ্ট পরীক্ষার আয়োজন করে, সেখানেও দুর্গা যে সফল হবে তার কথাও জানিয়ে দেন। কাহিনী অবলম্বনে আমরা দেখি হেমন্ত ঋষি সমস্ত দেবতাদের সাক্ষী রেখে দুর্গার সতীত্ব প্রমাণের জন্য অষ্ট পরীক্ষার আয়োজন করেন এবং সেখানেও শিবের সহায়তায় দুর্গা নিজের কলঙ্ক মোচন এবং সতীত্বের পরীক্ষায় সফল হন।

শিবের কয়ালীর বেশ ধারণ ঃ

শিব দুর্গাকে বিবাহ করার জন্য কয়ালীর বেশ ধারণ করেন। এই বেশে ভিক্ষায় বের হলে ঋষিয়ানি যখন তাকে ভিক্ষা দিতে যান তখন শিব তা নিতে নারাজ হন। কেননা শিব দুর্গা ব্যতীত কারো হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করবেন না।

''সুবর্ণ কাঁশীত করি দান দিতে জাই।
ঋষিয়ানিক দেখি গোসাঁই দরতে পলাই।।
তোমার ঘরত আচে দুর্গা পার্ব্বতি।
তার হাতে দিলে দান লবোহো সম্প্রতি।।'' পৃ. ৪৩

কয়ালীর বেশে শিবের এমন কথা শুনে ঋষিয়ানি দুর্গাকে দিয়ে ভিক্ষা পাঠিয়ে দেন। এরপর শিব দুর্গাকে বিবাহ করার বাসনা হেমন্ত ঋষিকে জানালে হেমন্ত ঋষি রেগে যান।

'' গোত্র কুটুম্বে বোলে হইল প্রমাদ।

দুর্গাত লাগিল আসি কেয়লিয়া বাদ।।
হেন শুনি ঋষি ভৈল কোপে কম্পমান।
সেহি কেয়লিয়াক দুর্গাক দিবো দান।'' পৃ. ৪৩

তখন শিব নিজের পরিচয় দেন। এবং সেই পরিচয় পেয়ে হেমন্ত ঋষি রাজি হন।

'' হেন সুনি গোসাই জে হাসে মনে মন।
ঋষিক সম্বুদ্ধি শিবে বুলিলা বচন।।
অকুলিন নোহো মঞি কুলিনর চায়।
আপুন কুলত আচে আমার বাপ মায়।।'' পৃ. ৪৩

হর-গৌরীর অধিবাস ঃ

শিব দুর্গাকে যে বিবাহ করতে ইচ্ছুক এই অভিলাষ গঙ্গার সামনে প্রকাশ করায় গঙ্গা ভারাক্রান্ত।

''বয়সত লম্বিত রতিত ভৈলো হিনি।
বৃদ্ধকালে দিলা গোসাঁই দারুণ সতিনি।।'' পৃ. ৩৭

গঙ্গা নানান সমস্যার কথা উত্থাপন করলে শিবও তাকে বিভিন্নভাবে সান্তনা দেন। শিব দুর্গাকে বিবাহ করলেও গঙ্গা সর্বদা তার মাথার জটাতেই অবস্থান করবেন। অর্থাৎ প্রিয় পত্নী হিসেবে গঙ্গাই সমাদর পাবেন। এছাড়াও শিব বলে

'' জেহি বস্তু লাগে দেঞু তোমার হাতত।
তিনি সত্য করা দেবি আমার আগত।।'' পৃ. ৪৪

এভাবে শিব গঙ্গাকে নানান ভাবে বুঝিয়ে অনুমতি নেন এবং শেষ পর্যন্ত গন্ধ অধিবাসের জন্য দুজনেরই প্রস্তুতি চলে। তখন হিন্দু বিবাহের রীতি অনুযায়ী শিব নারদ কর্তৃক গন্ধ অধিবাসের নানান সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেন। কিন্তু নারদের চতুরতায় সেই অধিবাসের সরঞ্জাম নানান আগাছায় ভর্তি করে হেমন্ত ঋষির ঘরে পৌঁছে দেন। ঋষিয়ানি এসব দেখার পর শিবের প্রতি চরম ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কেননা —

''দধির ভার ঋষিআনি চাইল হাত দিয়া
দধি নাহি খানিক আচে কাদাএ ভরিয়া।'' পৃ. ৪৮

এ অবস্থায় ঋষিয়ানি বলে — ''কি ভৈল কপালে মোর গৌরী ঝিউ খানি।'' কিন্তু গৌরীর চেষ্টায় সকল ভার আবার পূর্ণ হয়, হেমন্ত ঋষি যাতে শিবকে খারাপ না বলেন। এভাবে হেমন্ত ঋষি

সকল দেবতাদের সামনে রেখে ব্রহ্মার মুখোচ্চারিত বেদ মন্ত্রে গন্ধ অধিবাস পর্ব সমাপ্ত হয়।

‘‘ বেদ পঢ়ে ব্রহ্মাদেবে পঞ্চ আয় মঙ্গল গাবে
হরর ভৈল গন্ধ অধিবাস।।
হররে অধিবাস ভৈল দুর্গাক অধিবাস কৈল
গন্ধ চুয়াইল হর-গৌরী।। পৃ-৪৯

হর-গৌরীর বিবাহ ঃ

গন্ধ অধিবাস পর্ব সমাপ্ত হবার পর শিব বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নেন। বিয়ের বরযাত্রী স্বরূপ ‘ত্রিদশ কোটি দেবতা’, ব্রহ্মা, দেবাসুর, ভূত-প্রেত প্রমুখেরা নানান সজ্জায় সজ্জিত হন। এইসব বরযাত্রীদের সাজ-সজ্জার বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন —

‘‘ত্রিদশ কোটি দেবগণ সবে সাজে রঙ্গ মন
নানা বাদ্যভণ্ড গীত বাণী।
সাজে ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ হাতে লৈলা শ্রবশ্রুয
গরুড় কন্ধত গয়পানি।
দেবাসুর সাজে নর সাজে গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর
ঋষি তপসি মহামুনি।।’’

শুধু বরয়াত্রীদের সাজেরই নিপুণ পরিচয় কবি দেননি, শ্মশানচারী শিবের সাজের নিপুণ বর্ণনাও কবি দিয়েছেন। কবি বলেছেন গলায় হারের মালা, পরনে বাঘের ছাল, যা সর্প বন্ধনে আবদ্ধ, সারা গায়ে ভস্মলেপন প্রভৃতি সাজে সজ্জিত হয়ে শিঙ্গা ডমরু বাজাতে বাজাতে বৃষ বাহনে শিব বিবাহ যাত্রায় বের হন।

‘‘বিপরীত জটা ভার সর্পে করে ঝাতিস্কার
ভস্মএ ভূষিত করি মনে।
বাঘের চর্ম্মক আনি কটিত বান্ধিলা টানি
সাজে গোসাই বিবাহক মনে।।
বোকণ্ডি কাখত করি হাতে দ্বাদশ কাথি ধরি
খটঙ্গ ডম্বরু জে ত্রিশুল।
মাথাত ঘোটনি দিয়া উদাস করিল হিয়া
সাজে গোসাঁই উন্মত পাগল।’’ পৃ-৫৩

এভাবেই শ্মশানের ভূত-প্রেত সঙ্গে নিয়ে শিব বিবাহ যাত্রায় বের হন এবং নানান বাদ্যযন্ত্র সহকারে শিব হেমন্ত ঋষির গৃহে পৌঁছান।

বরের আগমনে কন্যা বাড়িতে প্রথম কাজ হল বর বরণ করা। প্রথাসম্মতভাবে এখানেও আমরা শিবকে বরণ করতে দেখি। শিব তথা বরকে বরণ করার জন্য এয়োনারীগণ দীপ, ঘট নিয়ে অপেক্ষামান। কিন্তু ঋষিয়ানি যখন শিবকে বরণ করতে যান তখন শিবের মাথার সাপ ফণা তুলে ধরলে এয়ো নারীগণ ভয়ে পালাতে থাকেন। শুধু তাই নয়, কোমড়ের সাপ খুলে গেলে শিবের বাঘ ছাল খসে যায় এবং শিব উলঙ্গ হন। এমন চিত্র মেনকার সামনে ঘটলে মেনকার লজ্জায় মাথা কাটা যায়, এবং ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

''আয়গণ লগে করি দীপ ঘট বাতি ধরি
সাজে দেবি জমাইক বরিবার।
মঙ্গল করে সুর নারি পূর্ণ কাসিবাতি ধরি
বরিবাক যাই হরবর।।
দূর্ব্বাক্ষত লৈয়া হাতে দিতে চাহে জমাইর মাথে
আচে জমাই বৃষভ উপর।
মাথাত ঘোঙ্গট দিয়া শরির উদাস হৈয়া
হুয়া গোসাঁই ধুলাএ ধুসর।।
আচোক রবির বর দেখি ভৈল ভয়ঙ্কর
নগৈলন্ত জমাইর ওচর।
আয় পলাই ভিতাভিতি পেলায়া চালনি বাতি
ঋষিয়ানি গৈল অভ্যন্তর।।'' পৃ-৫৪

জামাতার এ অবস্থা দেখে ঋষিয়ানি স্বামীকেই দোষারোপ করেন। কেননা, স্বামী হেমন্ত ঋষির জন্য কন্যার এই অবস্থা। হেমন্ত ঋষির চোখ অন্ধ হয়েছে বলেই এমন জামাতা পছন্দ করেছেন। ঋষিয়ানির রাগ এতটাই চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে কন্যাকে হাতে পায়ে বেঁধে জলে ফেলে দিতে যতটা কষ্ট হবে না, তার থেকে অনেকগুণ বেশি কষ্ট হবে এমন জামাতার হাতে কন্যা দিতে। তাই এমতাবস্থায় মেনকা বিবাহের ঘট পর্যন্ত লাথি দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতেও রাজি হন। মেনকার রাগ প্রকাশ করতে গিয়ে কবি বলেছেন —

''আখি খাইলি ঋষি জে কোপাইত পাইলি বর।
লাঙ্গটে আচই জমাই বৃষভ উপর।।

কি কহিবো তোর জমাইর জত গুণ।
বাহুড়িয়া জাউক জমাই ঝিডর নেদম।।
হাতে ভরি বান্ধি ঝিউক পেলাইবো জলে।
লাঙ্গটা জমাইক নেদিবোহো একো কালে।।'' পৃ-৫৫/৫৬

কিংবা কখনো ঋষিয়ানিকে বলতে শোনা যায়--

''নেদিবো গৌরিক বিহা জাউক বাহুড়িয়া।
এ ছায়া মণ্ডপ ঘট পেলাউ ভাঙ্গিয়া।।'' পৃ-৫৬

মেনকার মনে কতটা রাগ হলে সে এমন কথা বলতে পারে, তা আমাদের সকলের কাছেই স্পষ্ট। এই দৃশ্য আমরা কোচবিহারের কাত্যায়নি ব্রতকথাতেও লক্ষ করতে পারি। সেখানেও মেনকা এমনতর পাত্রের হাতে কন্যা দিতে চাননি। বরং তিনি কন্যাকে গঙ্গা জলে ফেলে দিতে চেয়েছেন। সেখানে উল্লেখ অছে---

'' কান্দেন মেনকা রাণী গৌরী করি কোলে।
পাগল বর ছিল বুঝি গৌরীর কপালে।।
না দিব গৌরীকে বিভা ঘরতে রাখিব।
ভাল বর পাইলে গৌরীকে বিভা দিব।।''[১১]

কিংবা,

''হাতে গলায় বান্ধিয়া গৌরাইক ফেলাইবো গঙ্গা জলে।
তবুও না দিব গৌরাইক নেংটিয়া শিবের ঘরে।।'' [১১]

কিন্তু নারদের প্রচেষ্টায় এরপর শিব তার নিজ মূর্তি ধারণ করেন। যে মূর্তিতে তাঁকে দেবাদিদেব বলেই মনে হয়।

''জটা এ মুকুট রে ভূজঙ্গে অলঙ্কার
কুণ্ডলে কুণ্ডলে ভৈল হারে পেচান্দার।।
ব্যাঘ্র চর্ম্ম গুচি ভৈল এ নেত বসন।
ভস্ম এ ভুষিত ভৈল মলয়া চন্দন।।'' পৃ-৫৭

শিবের এই রূপ দেখে সকলেই বিস্মিত হন। সকলেই মেনকাকে এবং এয়ো নারীদের নিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন পুনরায় জামাতাকে বরণ করার জন্য। কিন্তু মেনকা কিছুতেই আসতে চান না, লেঙ্গটা জামাতাকে বরণ করার জন্য। শিবের এই মূর্তি যেন ''কোটি চন্দ্র সম জলে হরের বদন।'' তাই পুনরায় জামাতার এই রূপ দেখে এয়ো নারীরা লজ্জিত।

''শঙ্করের রূপ ভৈলা জগত মোহন।
হরক দেখিতে রে সবারো ভৈল মন।।
পাঞ্চ আয় এড়িলেক গৌরির পাস।
শঙ্করক দেখিতে সবার হাবিলাস।'' পৃ-৫৯

তাই সকল এয়োনারীগণ তাদের লজ্জা ত্যাগ করে, ঘন্টা বাতি নিয়ে পুনরায় জামাতা বরণ করায় ব্যস্ত হয়ে যান। শুধু তাই নয়, তাদের কণ্ঠের সুমধুর গানও সেই বিবাহকে ভিন্ন মাত্রা দান করে। শেষে মেনকাও জামাতাকে বরণ করে —

''তিনিবার দিলা খণ্ড বিচনিরু বায়।
গোঁসাইক বড়িল গিয়া মেনকাজে নায়।।'' পৃ-৫৯

এইভাবে জামাতা বরণ করে নিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করানো হয়। উলুধ্বনি, নানান বাদ্য, ব্রহ্মার বেদমন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়েই এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। লক্ষণীয় বিবাহে যেসব লৌকিক আচার প্রয়োজন তার বর্ণনাও কবি এখানে নিপুণভাবে দিয়েছেন।

''আপুনি হেমন্ত ঋষি ব্রহ্মাক বড়িলা।
কুশণ্ডি করিয়া ব্রহ্মা যজ্ঞ আরম্ভিলা।।
আপুনি জে ব্রহ্মাদেবে হোমের করে সাজ।
হোম অগ্নি জালিলা নারদ মুনিরাজ।।'' পৃ-৬৩

এভাবে বিবাহ সম্পন্ন হলে পরদিন হেমন্ত ঋষির গৃহ থেকে শিব-গৌরী, ভূত-প্রেত সকলেই কৈলাসে যাত্রা করেন। এভাবেই হর-পার্বতীর বিবাহ অংশ সমাপ্ত হয়।

পদ্মার জন্ম খণ্ড ঃ

কৈলাসে শিব দুর্গা ও গঙ্গা সহ সুখে সংসার ধর্ম পালন করেন। হঠাৎ করে শিবকে মালঞ্চে যেতে হয়। এতে গঙ্গা এবং দুর্গা দু'জনেই আপত্তি প্রকাশ করেন। কিন্তু শিব কারো কথাই শোনেন না। পরে দুই পত্নী সঙ্গে যেতে চাইলে শিব তাদেরকে সঙ্গে নিতে নারাজ হন। কেননা এতে দেবকুল শিবকে ভৎর্সনা করবে ' দেবাসুর নবে সুনি হাসিবেক মোক' ।

এভাবেই শিব দুই পত্নীকে ঘরে রেখে মালঞ্চে যাত্রা করেন। কিন্তু যাত্রা পথে বটবৃক্ষতলে শিব বিশ্রাম নেন। এমন সময় সুমধুর বাতাসে যখন নিজেকে স্নিগ্ধ মনে করেন, তখন তার দুই পত্নীর কথা মনে পড়ে। পরে সেখান থেকে কিছু দূরে এক সুন্দর সরোবর দেখে শিব সেখানে যাত্রা করেন। এবং সেখানে ভ্রমরা-ভ্রমরির নানা রঙ্গ দেখে শিবের মনেও কামভাব জাগ্রত হয়।

তখন শিব গঙ্গা দুর্গার অভাব অনুভব করেন। পরে এখানেই শিবের বীর্য পতন হয়, যা পদ্মের নল বেয়ে পাতালে প্রবেশ করে এবং এই বীর্য থেকেই মনসার জন্ম হয়।

''নানা তরু সব ফুলে ফলে মেলে ডাল।
কতো কতো ভ্রমরা করয় কোলাহল।।
কতো কতো ভ্রমরা উড়িয়া যাই সঙ্গ।
তাক দেখি শঙ্করের আতি মন রঙ্গ।।
তাক দেখি দেবের্দ্দেব পড়ি গৈল ভোলে।
এহেন সময় গঙ্গা দুর্গা নাই কোলে।'' পৃ-৭১

এমন সময় দুর্গা গঙ্গার অনুমতিক্রমে কুচনী নারীর ছদ্মবেশে মালঞ্চে যান। মালঞ্চ মধ্যে শিব কুচনী রূপী রমণীকে দেখে তার সঙ্গেও মিলিত হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন —

'' গোসাঁই বোলে কুচুনি কোথার হন্তে আইলো।
কুচুনিক আনি মোক বিধি এ মিলাইলো।।
কুচুনি বোলয় গোসাঁই কাছে নাইসো মোর।
মোর আগে কর ঈশ্বরকরিলা সত্য।।
কুচুনির বোলে গোসাই করিলা সত্তর।
কুচুনি সহিতে ক্রীড়া মালঞ্চ ভিতর।'' পৃ-৭৪/৭৫

দুর্গা এখানেই নিজের কাজ সমাপ্ত করেননি। এরপর আবারও গঙ্গার অনুমতি নিয়ে গোয়ালিনীর বেশ ধরে পুনরায় মালঞ্চে যান, শিবের কার্যকলাপ দেখার জন্য। কিন্তু এবারেও গোয়ালিনী দেখে শিবের মনে নানান কৌতূহল জাগ্রত হয়। এখানেও গোয়ালিনীর প্রতি শিব আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এতে দুর্গা গোসাইর কাছে যেতে নারাজ —

'' তোমাৰ কাছক গোসাঁই জাইতে নুজুবাই।
গঙ্গা দুর্গা শুনিলে যে আমাকে খঙ্গাই।।'' পৃ-৭৬

এছাড়াও মনসাকে দেখেও শিবের কাম ভাব জাগ্রত হয়। কিন্তু পদ্মার পরিচয় জ্ঞাপনে শিব নিজেকে সংযত করে। এরপর পদ্মা শিবের সঙ্গে কৈলাসে আসতে চাইলে শিব তাতে নারাজ হন। কেননা —

''কেনমতে নিবো তোক পদুমাই কুমারি।
গঙ্গা দুর্গা দেখি তোক পারিবেক গালি।।'' পৃ-৮১

কিন্তু পদ্মার কাতর মিনতি যে, সে নিজেকে ছদ্মবেশে রাখবে এবং ফুলের মধ্যে অবস্থান

করবে, তাতে তাকে কেউই চিনতে পারবে না। শেষ পর্যন্ত পদ্মার কথা মত শিব করগুলিতে করে নিয়ে এলে ধরা পড়ে যান। দুর্গা এতেও পদ্মাকে সপত্নী ভাবে, কেননা শিব দু'বার কুচনী ও গোয়ালিনীরূপী দুর্গার সঙ্গে যদি মিলিত হতে পারেন, তবে এ নারীর সঙ্গেও পারবেন। তাই এ নারীও তার পত্নী।

'' তোমারে সে গঙ্গা বাই আজ্ঞা যদি পাঁও।
গোসাঁই খরমে চড়ি করণ্ডি নুমাওঁ।।'' পৃ-৮২

এখানে মনকর রচিত কাব্যটি শেষ হয়। কাব্য মধ্যে দেখা যায়, শেষোক্ত হয়তো আরো কিছু পদ ছিল, যা পাওয়া যায়নি।

কবি দুর্গাবরের ব্যক্তি পরিচয় ও সময় সীমা ঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে দুর্গাবরের কাব্যের নাম 'বেউলা আখ্যান'। মনকরের কাব্য যেখানে শেষ হয়েছে দুর্গাবরের কাব্য সেখান থেকেই শুরু হয়েছে। অর্থাৎ চাঁদসদাগর, বেহুলা, লখীন্দরের কাহিনীই দুর্গাবরের কাব্যে মূল উপজীব্য বিষয়। তাই দুর্গাবরের কাব্য মর্ত্য পৃথিবীর নর-নারীদের নিয়েই রচিত হয়েছে। বিশেষ করে বেহুলার আর্তিই এখানে প্রকাশ পেয়েছে, দেব-দেবী চরিত্র এখানে নেই বললেই চলে। মনসা পূজা মর্ত্যলোকে প্রচলনের উদ্দেশ্যেই এই কাহিনীর অবতারণা। স্বাভাবিকভাবেই শিব চরিত্র এখানে প্রায় অনুপস্থিত। কিন্তু এই দুর্গাবর যে উত্তরবঙ্গের কবি সেকথা এখানে বলা প্রয়োজন। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি দুর্গাবরের সময় নির্ণয় করাও প্রয়োজন। মূল কাব্য 'বেউলা আখ্যান' থেকে বিভিন্ন প্রসঙ্গে উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা শিব চরিত্রকে দেখানোর চেষ্টা করবো।[১২]

কবি তার কাব্যের ভণিতায় উল্লেখ করেছেন —

''সুগন্ধ পুষ্পত যেন মালতী সুবাস।
বংশর মধ্যত বাহুবলর প্রকাশ।।
প্রতি দেব বরে পুত্র পাইলেক প্রধান।
কবি দুর্গাবরের গীত করিল বাখ্যান।।'' পৃ-৯৫

অন্য আর একটি ভনিতায় কবি বলেছেন 'বাহুবল শিক্দার গন্ধর্ব্ব যে অবতার'। এই দুটি ভণিতা থেকে বাহুবলের নাম জানা যায়। মনে হয় এই বাহুবলের সঙ্গে কবির কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে। এটুকু ব্যতীত তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয় সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

দুর্গাবর ঠিক কোন সময়ের কবি ছিলেন এ বিষয়ে সুস্পষ্ট কালজ্ঞাপক কোনো পদ পাওয়া

যায় না। তবে কাব্য মধ্যথেকে কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমরা তাঁর সময়কাল নির্ণয় করার চেষ্টা করবো। 'বেউলা আখ্যান' এর শুরুতে কবি উল্লেখ করেছেন —

'' কমতা ঈশ্বর বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবর।
আট চল্লিশ মহিষী বন্দো অঠর কোয়র।।'' পৃ-৮৫

এখান থেকে স্পষ্ট কবি কোচ রাজা বিশ্বসিংহের সমসাময়িক ছিলেন। এই বিশ্বসিংহের সময়কাল ১৫২২-১৫৫৪ খ্রিস্টাব্দ। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে যে কবি কাব্য রচনা করেছেন এ বিষয়ে দ্বিমত হবার কোনো কারণ নেই। এমন হতে পারে কবি এই রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্যটি রচনা করেছেন।

কবির জন্মস্থান সম্পর্কে কাব্য মধ্যে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে কবির বিশ্বসিংহের নাম উল্লেখে আমরা বলতে পারি যে কবি তৎকালীন কোচ রাজ্যে বসবাস করতে পারেন। অন্যদিকে কবির কাব্য অধুনা হাজোং অঞ্চলে বিশেষভাবে জনপ্রিয়। যা সেই সময় কামতাপুর রাজ্যের অধীনে ছিল। সেদিক থেকেও কবিকে আমরা উত্তরবঙ্গের কবি বলতে পারি। এ প্রসঙ্গে মূল গ্রন্থের ভূমিকা অংশে সম্পাদক ড. বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া ও ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মাও দুর্গবরকে অসমের কবি বলে মনে করেছেন।

বিক্ষিপ্তভাবে কবি তাঁর কাব্যে শিবের কথা উল্লেখ করেছেন। কাব্যের ২০টি গানের মধ্যে যেসব অংশে শিবের উল্লেখ রয়েছে তা নিচে লিপিবদ্ধ করা হল।

১। কাব্যের ১নং গানে-- '' বৈকুণ্ঠর নাথ বন্দো দেৱ নারায়ণ।
দেবতার দেব বন্দো প্রভু পঞ্চানন।।'' পৃ-৮৫

২। কাব্যের ২নং গানে-- ''শিবর চরণে সাধু পরম ভকত।
আন দেৱতাক নকরয় তৃণবত।। পৃ-৮৭

৩। কাব্যের ১৭নং গানে-- ''যাত্রা করি উঠন্তে যে উজটি লাগিল।
চিউ মারি কাকে তার শিব পরশিল।।'' পৃ-১০২

——— **** ———

মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ

কোচবিহার রাজসভার মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ নিজেই মাতৃকা শক্তির আরাধনায় ডুবে থাকার সুবাদে একাধিক শাক্তপদ রচনা করেন। সেগুলিকে তিনি 'ভক্তিগীতি-সংগ্রহ' নামে আখ্যা দেন। পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ এই ধারার পদ রচনা করেন। কবি রামপ্রসাদ সেন বাংলা সাহিত্যে যে শাক্তপদের সূচনা করেন, পরবর্তীকালে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (১৭৭২-১৮২১), দাশরথি রায় (১৮০৭-১৮৫৭) প্রমুখ কবিরা এই ধারাকে জিইয়ে রাখেন। এই সমস্ত প্রধান প্রধান কবিদের পাশে সমকালে বা পরবর্তীকালে আরও কিছু শাক্ত পদকর্তার আর্বিভাব হয়েছে। যাঁরা সমগ্র বঙ্গে শাক্তভাবনাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। আন্তরিকতা এবং শক্তিদেবীর প্রতি গভীর ভক্তিতে তাঁরা এইসব পদ রচনা করেছেন। এক্ষেত্রে নাটোর, নবদ্বীপ,বর্ধমান রাজসভার রাজা দেওয়ান ও জমিদাররা কোচবিহার মহারাজার মতোই ভূমিকা পালন করেছে। আমরা জানি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন ভারতচন্দ্র। সাধক রামপ্রসাদ সেন তাঁরই অনুগ্রহপুষ্ট। যিনি এই ধারার প্রথম সাধক হিসেবে পরিচিত। এরপর কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান শিবচন্দ্রও এই পর্যায়ের পদ রচনা করেছেন। শিবচন্দ্রের ভাই শম্ভুচন্দ্রও মায়ের চরণে নিজেকে নিবেদন করেন। এছাড়াও নবদ্বীপ রাজবংশের আর এক শক্তিশালী কবি হলেন কুমার নরচন্দ্র। মহারাজা নন্দকুমারও ছিলেন শক্তির উপাসক। এ বিষয়ে তাঁরও দুটি পদ পাওয়া যায়। এছাড়াও মেদিনীপুর নাড়াজেলের রাজা মহেন্দ্রলাল খানের আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের স্বল্প সংখ্যক গানের হদিস পাওয়া যায়। বর্ধমান রাজ তেজশ্চন্দ্রের দত্তক পুত্র মহারাজ মহাতাবচাঁদ দশমহাবিদ্যা বিষয়ক অনেকগুলি শাক্তপদ রচনা করেন। বর্ধমান রাজার আরেক অধিপতি কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় ছিলেন নিষ্ঠাবান শাক্তভক্ত। তাঁর পুত্র নন্দকিশোর ও রঘুনাথ রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত অনেকগুলি পদ রচনা করেছেন। বিশেষ করে ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদ রচনায় তাঁর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা রয়েছে।[১৩] এইসব রাজসভার পাশাপাশি কোচবিহার রাজসভাতেও শাক্তপদ রচিত হয়েছে। ১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রি. পর্যন্ত মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের সময় মহারাজা নিজেই অনেকগুলি শাক্তপদ রচনা করেন।

পিতা ও পুত্রের এই 'ভক্তিগীতি সংগ্রহ' গ্রন্থের মূল পুথিটি কোচবিহার সাহিত্য সভার উদ্যোগে শরচ্চন্দ্র ঘোষালের সম্পাদনায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। যদিও বর্তমানে তা দুষ্প্রাপ্য। পরে নৃপেন্দ্রনাথ পাল মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের 'ভক্তিগীতি-সংগ্রহ' নাম দিয়ে সেই গ্রন্থটি নতুন করে সম্পাদনা করেন। এই সংকলনে আমরা মোট ২১৭ টি গানের পরিচয় পাই।

তার মধ্যে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের ১৭০ টি, মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের ৪৪ টি এবং পরিশিষ্টে দুর্গাপ্রসাদের ৩ টি গানের সংকলন করা হয়েছে। গানের ভনিতা থেকেই যা স্পষ্ট। হরেন্দ্রনারায়ণ যেমন তার ভনিতায় উল্লেখ করেছেন শ্রী হরেন্দ্র, হরেন্দ্র, হরেন্দ্রে, ভূপ-হরেন্দ্র, শ্রীহরেন্দ্র ভূপে, হরেন্দ্র রায়, নররাজ, হরেন্দ্র হরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি। অন্যদিকে পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণ তাঁর নিজের ভনিতায় হরেন্দ্রনন্দন, হরেন্দ্রসূত, শিবেন্দ্র রায়, শ্রী শিবেন্দ্র উল্লেখ করেছেন। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের ১৭০ টি গান ব্যতীত আরো নয়টি গান ছিল। যার মধ্যে ছয়টি গান পাওয়া যায়নি এবং বাকি তিনটি অন্যান্য ব্যক্তির রচনা। তবে সবগুলি পদই আগমনী পর্যায়ের। পিতা ও পুত্রের সমগ্র পদের মধ্যে বিজয়া পর্যায়ের কোনো পদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে কালী বিষয়ক তিনি অনেকগুলি পদ রচনা করেছেন। যার মধ্যে দেবীর স্বরূপ, জগজ্জননী রূপ, ভক্তের আকুতি প্রভৃতি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এগুলি বাদ দিয়েও শিবকে কেন্দ্র করে হরেন্দ্রনারায়ণের দুটি ও শিবেন্দ্রনারায়ণের একটি পদ পাওয়া যায়।

শক্তি সাধনা ও হরেন্দ্রনারায়ণের শাক্ত পদাবলী ঃ

বৈষ্ণব পদাবলীর মতো শাক্ত পদাবলীও বাংলা ও বাঙালীর একান্ত নিজস্ব সম্পদ। মহারাজা এই পদগুলির মধ্যে তন্ত্রশাস্ত্র, সাংখ্যদর্শন , বেদান্ত প্রভৃতি তত্ত্বের আভাস দান করেছেন। এছাড়াও এইসব তত্ত্ব ও ভাবকে বাৎসল্য ও প্রতিবাৎসল্য রসে নিষিক্ত করে তিনি ভাব বিধূর পদাবলী রচনা করেছেন। একারণেই তাঁর পদ বাঙালি পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে। এইসব পদের মধ্যে শক্তিরূপিনী রূপটি যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি এর মধ্যে রয়েছে সমগ্র বাংলার সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি। যা কবির ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির আশ্রয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তন্ত্রের কঠিন তথা গূঢ় তত্ত্ব এই আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। উপরন্তু একটি আনন্দধারা পাঠক চিত্তকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তান্ত্রিকদের মতে এবং শাক্ত সাধকদের মতে পরম প্রকৃতির আদ্যাশক্তি যেন জগতের সমস্ত শক্তির অধিকারী। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মূল কারণ। এই আদ্যাশক্তির স্বরূপ কল্পনা ও সাধন প্রক্রিয়া শক্তিসাধনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই আদ্যাশক্তিকে বিভিন্ন রূপে আরাধনা করে সাধক তাঁর আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার তৃপ্তি সাধন করেন। তাকে কখনো কল্পনা করা হয়েছে উমা রূপে, কখনো তিনি ভয়ঙ্করী কখনো শঙ্করী বরাভয়দাত্রী। সাধকের কল্পনায় তিনি বিভিন্নরূপে ধরা দিলেও আসলে তিনি অবাঙমানসগোচর।

শক্তিসাধনার প্রধান ধারা মূলত কালী সাধনার ধারা। এই তন্ত্রশাস্ত্র মূলত সুপ্রাচীনকাল থেকেই আমাদের সাধারণ জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। ঋকবেদের রাত্রি সূক্তে যে

ভয়ঙ্করী রূপের কল্পনা করা হয়েছে, অনেকেই তাকে কালিকা রূপের উৎস রূপে মনে করেন। আসলে ঋকবেদের দশম মণ্ডলে মাতৃকাশক্তি 'আদ্যাশক্তি দেবতা' রূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। মুণ্ডকোপনিষদে প্রথমে কালী নামটির সন্ধান পাওয়া গেছে। পৌরাণিক যুগ থেকেই হিন্দুধর্মে প্রকৃষ্ট রূপে মূর্তি কল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। তবে এই মূর্তি কল্পনা একেবারেই অনর্থক নয়। এই মূর্তি কল্পনাতে সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞানের সূত্রেই সাধকের ধ্যান জ্ঞানের আরোপ ঘটেছে, তাদের চিন্তার বিকাশ ঘটেছে । এই মূর্তি কল্পনাতেই তাদের ধ্যানে ঈশ্বর সাধনায় সান্নিধ্য লাভ করেছেন, মোক্ষলাভ প্রাপ্ত হয়েছেন।[১৪] এই কালী মূর্তি কল্পনায় দেবী মুক্তকেশী, মুণ্ডকমালা, করালবদনা, চতুর্ভূজা। আসলে তন্ত্রশাস্ত্রে যে শক্তিদেবীকে কল্পনা করা হয়েছে তার মূলে রয়েছে মাতৃকা শক্তি। আবার শক্তি সাধনা শিবের মধ্যেও সীমাবদ্ধ আছে। একারণে তন্ত্রশাস্ত্রে মাতৃকাশক্তি ও শৈবশক্তি এই যুগল শক্তির কল্পনা করা হয়। 'পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র' গ্রন্থে এই যুগল শক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে-- ''তন্ত্রের মূল সিদ্ধান্ত আলোচনা করলে দেখা যায় শিব ও শক্তি হলেন দুটি অংশ এবং যুগলেই পূর্ণ। শৈবাগম মতে শিব প্রধান ও শক্তি যদিও অপ্রধান তবু শিব ও শক্তি অভিন্ন। শিব শক্তি ব্যতীত অবস্থান করতে পারেন না। তত্ত্বের দিক দিয়ে আলোচনাতে শাক্ত মতে ও শৈব মতে বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না। মনে হয় শক্তিবাদের প্রভাবেই নানা পুরাণে সকল দেবতারই পত্নী আছে এইরূপ কল্পনা করা হয়েছে। তাই দেবাদিদেব মহাদেবের পত্নী হলেন সতী যাঁর পার্বতী, দুর্গা, কালিকা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ বিভিন্ন নাম।''[১৫]

শাক্ত পদাবলীকে বিষয়বস্তু অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। লীলা তত্ত্ব, উপাস্য তত্ত্ব এবং উপাসনা তত্ত্ব। লীলাতত্ত্বে জগজ্জননী মহামায়ার লীলার স্বরূপ ব্যক্ত হয়েছে। এই অংশে দেখি হিমালয় ও মেনকা কঠিন তপস্যা করে জগজ্জননীকে কন্যারূপে পেয়েছেন, নাম দিয়েছেন উমা। নারদের পরামর্শে উমার সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ হয়। উপাস্য তত্ত্বে দেবীর স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে। যেখানে দেবী সৃষ্টি ও প্রলয়ের উৎস। উপাসনা তত্ত্বে শাক্তপদকর্তাগণ সাধনতত্ত্বের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। এখানে সাধকরা বাহ্যিক পূজার অনুগামী না হয়ে দেবীর মন্ময় প্রতিমা গড়ে তাকে মনে মনে আরাধনা করেছেন —

''কালী নাম বল বদনে দিবা নিশি সন্ধ্যা প্রাতেঃ।
তবে মন জানবে ধ্রুবে তুমি ঠেকবে না কালের হাতে।''

পৃ. ৯২, পদ ৯৪/১৭৬

কালিকা পুরাণে এই মাতৃকা দেবীকে আদ্যাশক্তি বা পরাশক্তি রূপে কল্পনা করা হয়েছে। প্রলয়কালে সৃষ্টির চারিদিকে যখন মহাশূন্যতার সৃষ্টি হয় তখন চরাচরে বিরাজ করে 'তমস'। এই

'তমস' ই কালীর কৃষ্ণতত্ত্বের কারণ। প্রলয় শেষে এই রূপ বিলুপ্ত হয়।

আমরা জানি ইতিহাসে আদিযুগ থেকে হিন্দুর প্রধান দেবতা হিসেবে শিব স্বীকৃত। যা পরবর্তীকালে নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক শিব মূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের মতো উত্তরবঙ্গের এই শিবের প্রাবল্য দেখা গেছে। বিশেষ করে কোচশাসনকালে। কেননা কোচ রাজা প্রাণনারায়ণের আমলেই কোচবিহারে সবথেকে বেশি শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা পায়। বিভিন্ন শৈবক্ষেত্র, মহাদেব পূজা, নীল, গাজন, শিবরাত্রি যার সাক্ষ্য বহন করে। সয়ম্ভু শিব হলেন পরম ব্রহ্ম। তারই শক্তির ভিন্ন রূপ হল এই পার্বতী, উমা, কালী প্রভৃতি। আসলে এতক্ষণ যে শক্তির আধার হিসেবে কালীর আলোচনা করা হল, তাঁর মূলেও রয়েছে এই শিবশক্তি। যার বড় প্রমাণ বোধ হয় শক্তিপূজক বাঙালীর কাছে শিব পূজা আবশ্যিক। অর্থাৎ হিন্দুধর্মের এই বিশিষ্ট শাখা 'শাক্ত'তেও শৈব ধর্ম আরোপিত হয়েছে। যাকে পরবর্তীকালে বাঙালীর নিজস্ব রূপ, রস দিয়ে নিজস্ব রূপে তৈরি করা হয়েছে। যে মত বাঙালী জীবনে সবচেয়ে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছে। সমালোচকেরা একারণেই বলেন তান্ত্রিক মতধারা বা শাক্তধর্মমত এতদঞ্চলের মাটির সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে। যার ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের শাক্ত পূজা এতদঞ্চলের একদিকে যেমন গূহ্য সাধনায় বিষয়বস্তু হয়ে গেছে, তেমনি অন্যদিকে আধ্যাত্মচেতনায় এক সহজ পথ বলে গণ্য হয়েছে।

'ভক্তিগীতি-সংগ্রহ' কাব্যে শিব সাধনা ঃ

শাক্ত পদাবলীর একটি বিশেষ দিক উমা সংগীত অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়া শীর্ষক সংগীত। এর মধ্যে লোকায়ত সংস্কার-বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি সাধারণ বাঙালি পরিবারের স্নেহ ও ভালোবাসার মানবিক সম্পর্কের আলেখ্য ফুটে উঠেছে। তিনদিন ব্যাপি দুর্গোৎসবের সঙ্গে অল্পবয়স্কা বিবাহিতা বাঙালি কন্যার তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমনের ব্যাপারটি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা প্রভৃতি আন্দোলন ছিল বাংলাদেশে। অষ্টম বর্ষীয়া কন্যাকে গৌরীদান প্রথা বর্ণ হিন্দুর নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে শোকাবহ পরিণতি দান করেছিল। এই প্রথা বা নিয়ম-সংস্কার অত্যন্ত কঠোর ছিল। বিত্তহীন পিতামাতার পক্ষে উপযুক্ত পাত্রের হাতে কন্যাকে সম্প্রদান করা সম্ভব হত না। সেক্ষেত্রে বাবা মাকে বাধ্য হয়ে কূল রক্ষা করতে গিয়ে আট নয় বছরের কন্যাকে অপাত্র, প্রৌঢ়, কদাচারী ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করতে হত। এভাবে অল্পবয়স্ক কন্যাকে সঙ্গতিহীন বৃদ্ধ পাত্রের হাতে সমর্পণ করে হতভাগ্য পিতা মাতা নীরবে অশ্রুপাত করতেন। নিয়ম ছিল বৎসরান্তে দুর্গাপূজার সময় তিন দিনের জন্য কন্যাকে পিত্রালয়ে নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু তিনদিন পর বিজয়া দশমীর দিন বেজে উঠবে বিরহের মর্মান্তিক

সুর, কেননা সেদিন তাঁকে পুনরায় স্বামী গৃহে ফিরে আসতে হবে। শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের গানে এই চিত্রই ফুটে ওঠেছে, যা গভীর তাৎপর্য বহন করে। এখানে মূল কাব্য 'হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি- সংগ্রহ' থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে শিব চরিত্রের বিভিন্ন দিক দেখানোর চেষ্টা করা হবে।[১৬]

এই লোকায়ত কাহিনীকে কবিরা শিব, পার্বতী, মেনকা, হিমালয় প্রভৃতির চরিত্রের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করেছেন। কবিদের কল্পনায় মা মেনকা হয়েছেন বাৎসল্যময়ী গৃহ বঙ্গজননী, শিব এবং পার্বতী অসমবয়স্ক বাঙালি কুলীন কন্যা ও প্রৌঢ় স্বামী, যে স্বামী সর্বদা নেশায় চুড় হয়ে থাকেন,যে স্বামী দরিদ্র, যে স্বামী ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে সংসার পরিচালনা করেন। এমনতর পাত্রের হাতে হিমালয় তাঁর শিশুকন্যাকে দান করেন। উপরন্তু এই অভাবী সংসারে আবার যদি সতীন উপস্থিত হয় কিংবা তাঁদের যদি আবার বহু সন্তান সন্ততি থাকে, তবে দুঃখ কষ্টের আর শেষ থাকে না।

কন্যার এমন দুর্দশার কথা ভেবে মা মেনকার দুশ্চিন্তার অন্ত্য নেই। তিনি কন্যার চিন্তায় বিনিদ্র রাত্রি যাপন করেছেন। মাঝে মাঝে পাষাণ স্বামী হিমালয়কে ভৎর্সনা করেন। কখনো বা কন্যার উপর অভিমান করেন। কখনো বা স্বপ্ন দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে হিমালয়কে ডেকে বলেন —

''ব্যাকুলিত হিয়া নাথে সম্বোধিয়া
কহিছে কান্দিয়া নগেন্দ্ররাণী
আজির স্বপনে দেখ্যাছি নয়নে
আমার ভবনে আইল ভবানী।
তার ত্রিনয়নেতে জলধারা আমায় বলে উঠগো জননী।
আমি আস্যাছি জনম দুখিনী
ত্রিভূবনে ধন্যা আমার সে কন্যা
রূপে সুলাবণ্যা কি দশা তার
দিনান্তে আহার ফলমূল তার
বিধির বিচার হে নগমণি।'' (পৃ-৫৮, পদ- ৪/২৯)

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের পদেও এই উৎকণ্ঠা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। সেখানে মেনকা গিরিরাজকে বলেছেন —

''গিরিরাজ আন গিয়া মোর প্রাণকুমারী ও মুখ যে হেরি।
না হৈর্য্যা উমার মুখ সদত বিদরে বুক
ধৈরজ ধরে না মন কি হবে কি করি

আইসাছিল মহামায়া সঙ্গেতে জয়াবিজয়া।
দেখ্যাছিলাম আজু স্বপনে পথশ্রমে বিধুমুখী
ক্ষুধায় হৈয়াছে দুখী তনয়ার এত দুঃখ সহিতে কি পারি।''

(পৃ-১২১,পদ- ১/১৪)

কিংবা,

''কি হেরিলাম আইজ স্বপনে
যারে ভ্যব্যা থাকি সদা সর্ব্বক্ষণে।
সিংহবাহনে গজানন সনে
আইলা মা আমার মন্দিরে
আমায় ডাকে উঠউঠ গো মা
আইসাছি চিরদিনান্তরে
বহে নীরধারা সারা ত্রিনয়ানে।''

(পৃ- ১২,পদ - ২/৩৪)

এখানে জয়া-বিজয়ার কথা আলাদা করে কোচবিহারের সংস্কৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়। কোচবিহারের দেবীবাড়িতে রাজ আমল থেকে এখন পর্যন্ত শারদীয়ার সময় দুর্গা পূজা হয়ে আসছে। লক্ষণীয় এই দেবীর ডান ও বাম দিকে লক্ষী ও সরস্বতীর বদলে জয়া-বিজয়াকে দেখা যায়। এই জয়া-বিজয়া হল দেবী দুর্গার দুই সখী। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য উত্তরবঙ্গের আর কোথাও দুর্গা মূর্তির পাশে এই জয়া-বিজয়ার মূর্তি দেখা যায় না।

ওপরের উল্লিখিত এই পদ দুটির মধ্য দিয়ে মা মেনকার মাতৃসুলভ আচরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিবাহের পূর্বে যে উমা পিতৃগৃহে অভাব বুঝতে পারেনি, সেই উমাকে এখন ভিখারী শিবের ঘরে গিয়ে তিলে তিলে কষ্ট সহ্য করতে হয়। প্রকারান্তরে শিবকে জামাই হিসেবে মেনে নিতেই মেনকার আপত্তি। জনম দুখিনী কন্যার অদূর ভবিষ্যতের কথা ভেবেই এখানে মাতৃহৃদয় ব্যাকুল। নারদের প্ররোচনাতেই হিমালয় নিজ কন্যাকে ভিখারী শিবের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। তাইতো স্বামীকে তিনি তিরস্কার করে বলেন —

''নারদে কি কব কিবা মতি তব
পিতা হৈয়া হত্যা করিলে নন্দিনী।'' (পৃ-৫৮,পদ- ৪/২৯)

এখানেই যেন মেনকা রক্তমাংসের চরিত্রে পরিণত হয়েছে।

শুধু তাই নয়, বাঙালী মাতৃহৃদয়ের হাহাকার, উদ্বেলতা এখানে এতটাই প্রকটিত হয়ে

উঠেছে যে, মেনকা স্বামীর পাশাপাশি শিবকেও নিন্দা করতে পিছপা হননি। শিব যে অন্য নারীর সঙ্গেও সঙ্গ করেন কিংবা অন্য নারীও যে সর্বদা তার পাশে থাকেন এমন কথা বলতেও তার মুখে আটকায়নি। শিব যে বসন ভূষণহীন দরিদ্র, সংসারের প্রতি বিবাগী, নেশা ভাঙ যে তাঁর নিত্য সঙ্গী, শ্মশানে-মশানে ঘুরে ছাই ভস্ম গায়ে মাখেন— এসব কথা বলতেও মেনকা দ্বিধা বোধ করেননি, অকপটে সেসব কথা তিনি বলেছেন। এরকম কন্যার হাতে মেয়েকে দান করে কোনো মা'ই শান্তিতে, নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন না। মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতা তাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক। শুধু দারিদ্র্যই নয়, শিবের একাধিক নারী সঙ্গও মেনকা অকপটে উচ্চারণ করেন —

''জামাতা পাগল কি তার সম্বল
খাএন গরল আভরণ ফণী
নামে সুরধুনী অপর রমণী
জটামাঝে রাখেন এমন শুনি।'' (পৃ-৫৯, পদ - ৪/২৯)

কিংবা,

''ভূত ভৈরব সঙ্গে নাচে রঙ্গেতে অমনি
কত উলঙ্গ কত আভরণ কর্য়াছে ফণী।''
বাজাইছে ভাল করতাল কত করছে ধ্বনি।
সঙ্গে সঙ্গিনী নবরঙ্গিনী কত যোগিনী
হরেন্দ্রে কহে গিরি নহে তব এ নন্দিনী'' (পৃ- ৬১, পদ- ৮/৫০)

কিংবা,

''আমার জামাতা বিহীন মমতা সর্ব্বত্র সমতা দেখেন তিনি
আহার তাহার চূর্ণ ধুতুরার সিদ্ধিঘোটা আর হে নগমনি ''
(পৃ-৬২, পদ-১০/৩১)

এখানেই যেন বাৎসল্যময়ী জননীরূপী মেনকা জীবন্ত। সে জানে যে কন্যার বিবাহ দিলে সেখানে আর মায়ের কোনো জোর থাকে না, এই দুঃখ বাঙালী মা'দের কাছে চিরন্তন সত্য। তা সত্ত্বেও কন্যার প্রতি তাদের চিন্তার শেষ থাকে না, যদি আবার তার মধ্যে জামাই সংসার বিমুখ হয়। মেনকার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। কন্যাকে দেখার জন্য মায়ের মন একদিকে যেমন ব্যাকুল, ঠিক তেমনি অন্যদিকে বাবা হিমালয় কন্যা সম্পর্কে নির্বিকার। তাই মেনকা স্বামীকে বার বার তিরস্কার করে তাঁকে মেয়ের কথা মনে করিয়ে দেন।

''গত সম্বৎসর ওহে গিরিবর মনেতেনা কর প্রাণ উমারে

ধন্য দেখি ইকি তোমারে তুমি কি সুখে আছ নাথ ঘরে

তারে মজাইয়া দুঃখ পারাবারে।'' (পৃ-৫৮, পদ- ৩/১১৯)

কিন্তু এরপর আগমনী পর্যায়ের পদে আমরা দেখি উমা যখন তিন দিনের জন্য পিতৃগৃহে চলে আসে তখন মায়ের কৌতূহল যেন আরও তীব্র আকার ধারণ করে। কন্যার কাছে মা'কে সেইসব কৌতূহল, আবেগ প্রকাশ করতে দেখি। কবি হরেন্দ্রনারায়ণ যেন সেই আবেগ মুহূর্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন —

''কান্দ্যা গিরিরাণী কহিছে উমা দিনান্ধ হৈয়াছি না দেখ্যা তোমা।

আমার দেহ হৈয়াছে প্রাণছাড়া হারা হৈয়াছি নয়নের তারা।

শুন ভিখারী শঙ্করদারা।'' (পৃ-৬২, পদ- ১১/২)

কিংবা,

''অন্ধের নয়ন হারাবার ধন পাইয়া উমারে

ধাইয়া যাইয়া মেনকা গৌরীমুখ হেরি দুঃখ উথলে

কান্দিয়া বলে বল কেমন আছো মা ভিখারী সে ভবের ভবনে।

আইস মা মা আইস মা।

উমা তোমা বিনে আমি নিশিদিনে বুঝি না এ দিবা কি রজনী

মনে বুঝতে পাই প্রাণ যেন ঘটে নাই ওহে ভবানী

আইজ তোমায় পাইয়া মা পাইল যেমন জীবন জীবনে।''

(পৃ-৬১, পদ - ১০/৩১)

একই ভাবনা প্রকাশিত হয়েছে পুত্র শিবেন্দ্রনারায়ণের পদে --

''গিরিপুরে কি আনন্দ হইল

আমার উমানিধি গৃহে আইল

আমি চিরদিনের দুখি হে রাজ

ও চান্দ বদন হের্যা প্রাণ জুড়াইল

কহে শ্রীশিবেন্দ্র ভূপে

আমার মনের আন্ধার দূরে গেল।'' (পৃ-১৬২, পদ - ৩/২৬)

মেনকা চান তার কন্যাকে চিরদিনের জন্য নিজের কাছে রেখে দিতে। সে জানে এক্ষেত্রে হয়তো নানান লোকনিন্দা তাঁকে সইতে হবে, তার পরেও তিনি কন্যাকে রাখবেন। কিন্তু 'ভক্তিগীতি-সংগ্রহ' গ্রন্থে বিজয়া সংক্রান্ত কোনো পদ কবি রচনা করেননি। হয়তো কবি নিজেও এই হাহাকারকে সহ্য

করতে পারেননি।

অপত্য স্নেহের এই অভিব্যক্তি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। সপ্তমী প্রভাতে জননী কন্যার মিলনে উৎসবের রাগিনী বেজে উঠে। তিনদিনের জন্য মেনকার সংসার যেন আনন্দে ভরে ওঠে।

''শুন গিরিরাজ গগন পরে উমা জয়ধ্বনি করে অমরে
বাজে সজল জলদ গভীর দেব দুন্দুভি বীণা মুরজ সপ্তস্বরা
আসিতেছেন ভবরাণী ভব বন্দিনী তব নন্দিনী যিনি
চল চল সুমঙ্গল সকল সহকারে কুলপুরোহিত পুরঃস্বরে
বর যাইয়া হর প্রিয়া উমা মারে
চির দিনান্তরে আন তারে ঘরে
কর ধন্য ধরাহে নগমণি।'' (পৃ-৬০, পদ -৭/১)

মাতা ও কন্যার এই মিলন মুহূর্তটি কবি আনন্দবেদনার অশ্রুতে অভিষিক্ত করেছেন। যা পাঠক সাধারণের হৃদয় স্পর্শ করে। এ কারণেই এই পর্যায়ের পদগুলি বাঙালী চিত্তে এতটাই জনপ্রিয়। এই প্রসঙ্গে আশুতোষ ভট্টাচার্য যথার্থই মন্তব্য করেছেন —''বাঙ্গালীর গৃহস্থ জীবন নানা স্নেহ-সম্পর্কের দ্বারা বিজড়িত। এই সমাজের মাতাপিতা নিজেদের শিশুকন্যাকে গৌরীদান করিয়া যে ভাবে পরের সংসারে পাঠাইয়া দিতেন, তাহাতে তাঁহাদের অতৃপ্ত সন্তানস্নেহ অন্তরের মধ্যে স্তম্ভিত হইয়া থাকিত। তারপর কোনো অনুকূল অবস্থা পাইলেই তাহা সহস্র ধারায় বিগলিত হইয়া পড়িত। বাংলার আগমনী -বিজয়া গানগুলি এই স্তম্ভিত অশ্রুনির্ঝরের মুক্তি-সঙ্গীত। অপরিণত-বুদ্ধি শিশু-কন্যাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্বামী-গৃহে পাঠাইয়া দিয়া এই সমাজের জননীগণ বাৎসল্যরসের অতৃপ্তি-জাত যে আশঙ্কা ও উদ্বেগাকুল জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালীর আগমনী- বিজয়া গানে তাহারই প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়।''[১৭]

উমা পিত্রালয়ে আসার পর এবারে তাঁকে আমরা একান্ত ঘরোয়া হিসেবেই দেখি। শিবের স্ত্রী হিসেবে তাঁকে দেখি, যে শিব এখানে যেন দেবতা নন, ধূলি ধূসরিত মানুষ। আর এরকমই সংসারী বধূ হিসেবে তাকে দেখি কাব্যের 'জগজ্জননী রূপ' অংশে —

''কেরে আনন্দে আনন্দময়ী রণে রাজিছে।
অপরূপ রূপে শিব শবে সাজিছে।
মাএর ক্ষীণ কঙ্কালে কিঙ্কিনী দেখ নরকর শ্রেণী
আউলিয়া কেশের বেণী দিক পাশ ঢাক্যাছে।
দেখ শীধুপানে বিধুমুখী হৈয়াছে পরম সুখী
শ্রী হরেন্দ্র কহে হের্য্যা দুঃখ গিয়াছে।''

(পৃ-৬৪, পদ - ১৬/২৪)

এই কারণেই হয়তো অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন — ''কবিগণ আগমনী ও বিজয়ার পদে যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাৎসল্য রসের এরূপ স্নিগ্ধতা, দেবীকে মানবীরূপের মধ্য দিয়া এরূপ নিবিড় উপলব্ধি অথচ দেবীর দৈব মহিমাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহার দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরল। দীর্ঘকাল পরে গৌরী পিতৃগৃহে ফিরিতেছেন, গিরিরাণীর স্নেহব্যাকুলতার আর্তি কবিরা একেবারে মানবী মাতার অন্তর হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। গিরিরাণীর অনুযোগে গিরিরাজের গৌরীকে আনিতে কৈলাসধামে যাত্রা, কন্যাকে নিজ পুরীতে লইয়া আসা, কিছুদিন আনন্দের হাটের বর্ণনা — এ সমস্তই বাঙালির ঘরের পটভুমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।''[১৮]

জগজ্জননীর রূপ বর্ণনা কিংবা মনোদীক্ষা কিংবা মাতৃস্বরূপ বিষয়ক অসংখ্য পদ মহারাজা রচনা করলেও প্রত্যেকটি পর্যায়ের পদ এখানে স্বতন্ত্র। দেবীর বাহ্যিক রূপ বর্ণনায় যেন কবিমন তৃপ্ত হয়নি। তাই তিনি এইসব পদকে অবলম্বন করে রূপের আশ্রয়ে অরূপকেই খুঁজতে মগ্ন হয়েছেন। যার মধ্যে তন্ত্রসাধনার কথা বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

''মিছে ভাবনা কেনে অসার ভাবনা।
যদি ভবে হবে পার নিতান্ত অন্তরে ভাব করালবদনা।
এ ভব সাগরে ঘোর মায়ার তুফানে জোড়
ডুবাবে তনুতরী এই যে বাসনা।'' (পৃ- ৮৬, পদ - ৭৬/৭০)

এইসব গানে বিভিন্নভাবে শিব প্রসঙ্গ এসেছে। অবশ্য এক্ষেত্রে তান্ত্রিক ভাবনায় শিবের অবদান আমরা জানি। সেই ভাবনাবশতই কবি প্রসঙ্গক্রমে শিবের কথা উল্লেখ করেছেন —

''দৃঢ় মনে রাখ্যা এবার ভাব দেখি তারা নামে
ভাবিলে ভাবে দ্বারা ভবার্ণবে হবে ত্রাণ
নাহিক সংশয় ইথে শিব আজ্ঞা কি হয় মিথ্যে
ভণিছে এই পদ শ্রী হরেন্দ্র হত মতি জ্ঞান।'' (পৃ-৯২, পদ - ৯৩/১৭৪)

এই ধরণের তান্ত্রিক ভাবনা মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের মনোদীক্ষামূলক পদেও পাওয়া যায়। যেমন-

-

''কালী বৈলা ডাকরে রসনা
অলস কৈর না যদি ভবে হবে পার।
নানা দুঃখে দিন গেল পাপে তনু সারা হৈল

ভাবিতেছি কি হবে এবার মা।'' (পৃ-১২৯, পদ ২০/১২)

এগুলি বাদ দিয়েও অর্থাৎ আগমনী, জগজ্জননীর রূপ, নাম মহিমা, মাতৃস্বরূপ, মনোদীক্ষা, ভক্তের আকুতি প্রভৃতি পর্যায়ের পদ বাদ দিয়েও কবি আলাদা করে শিব বন্দনা করেছেন। এই শিব বন্দনা অংশে অবশ্য কবি হিসেবে শিবের স্বমহিমার কথা বলেছেন। তিনিই দেবাদিদেব মহাদেব, সৃষ্টি ও ধ্বংসের কর্তা। তিনিই একদিকে যেমন জটাধারী অন্যদিকে তিনিই জগতের দুঃখহারী। সমুদ্র মন্থনের হলাহল পান করে তিনি নীলকণ্ঠ হয়ে জগৎ তথা সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে রক্ষা করেছেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত কবি শিবের যে লৌকিক রূপের কথা ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁকে ঠিক দেবতা বলে মনে হয়নি। এখানে তাঁকে সেই লোকায়ত ভাবনার উপর কবি পৌরাণিক আভরণ পরিয়ে দেন, যাতে স্বমহিমায় শিব বিরাজ করেন। মেনকার ভাষায় তিনি যেমন অলস, পেটুক, অন্য নারীর প্রতি কামুক, ঠিক তার বিপরীত চিত্রও এখানে অঙ্কন করেছেন কবি। এখানে সত্যি যেন সমাজের দাতা ও ত্রাতা রূপে এই ত্রিলোচনধারী অবস্থান করেছেন। তাঁর ভাব গাম্ভীর্য কবির ভাষাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নিচে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের 'শিববন্দনা' কেন্দ্রিক যে দুটি পদ পাওয়া যায় তা এখানে উল্লেখ করা হল —

১. ''শিব শিব শঙ্কর শম্ভু জটাধর
স্মর হর হর বরদং দুখহারি
নীলকণ্ঠ দিগম্বর সুন্দর কৈলাস কন্দর সদাবিহারী।
সতীপতি গতি মতি দাতা ত্রাতা পঞ্চবদন ত্রিলোচনধারী।
শ্বসন অশন কর উত্তরীধারি গরল কবলকর ত্রিপুরারি
জয় মৃত্যুঞ্জয় ভবভয় হারি নমো পঞ্চানন নির্ব্বিকারি।
শ্রী হরেন্দ্রে ও পদদ্বন্দ্বে স্থান দিও যবে এ দেহ ছাড়ি।'' (পৃ-১১৪পদ - ১৬১/৩৯)

২. ''ভীম ভৈরব ভূতেশ্বর দয়া কর গঙ্গাধর দিগম্বর।
ওহে জগদীশ ইশ হে গিরীশ নমস্তে গৌরীশ শশাঙ্ক শেখর।
কহিছে হরেন্দ্রে মজ্যা ব্রহ্মানন্দে জন্ম মৃত্যু জরা হর স্মর হর।''
(পৃ-১১৪পদ - ১৬২/১৫৪)

আবার মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের পুত্র মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণ পিতার পদই অনুসরণ করেছেন। তিনি বাবার মতন আগমনী, জগজ্জননীরূপ, মনোদীক্ষা, ভক্তের আকুতি ও শিব বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। শিব বিষয়ক পদে পিতার ভাবনা থেকে একটু সরে এসে তিনি শিব মহিমা ব্যক্ত করেছেন, যা তাঁর লিখিত পদটি থেকেই স্পষ্ট। লক্ষ্যনীয় শিব বিষয়ক স্বতন্ত্রপদের সংখ্যা তাঁর

একটি। পদটি হল,

''চলরে মন কাশী বল্যা মন ভজ হর গঙ্গাধর পুণ্যদ পুণ্যাশী
অসার সংসার সার ভাবনা কৈলাশী
এ-বনে শ্রীদুর্গা নাম শুনাবে তোরে আসি
হরেন্দ্র নন্দনে কয় ভাব কিবা বসি
স্মর হর দিগম্বর বিল্বমূলবাসী।'' (পৃ- ১৩৬, পদ - ৪২/১৬)

মূলত এইসব গানে (বন্দনা অংশ) উভয় কবিই লোকায়ত ভাবনা থেকে পৌরাণিক ভাবনা কিংবা তান্ত্রিক ভাবনার উপরেই বেশি মনোযোগী ছিলেন। যদিও কোনো কোনো সমালোচক এইসব গানকে নিছক বলেই মনে করেন। অধ্যাপক দিলীপ কুমার নাহা গ্রন্থের ভূমিকা অংশে এরকমই মন্তব্য করেছেন — ''মদনমোহন বিষয়ক গান ও শিবস্তুতি, হরিস্তুতি- বিষয়ক গানগুলি নিছকই নিয়ম রক্ষার প্রথানুগ রচনা, এগুলি বিশেষত্ব বর্জিত।''[১৯] তবে আর যাই হোক এইসব স্তুতি যে মূলভাবের পরিপূর্ণতার সহায়ক সেকথা বলাবাহুল্য। মনে হয় এই শিব বিষয়ক আলাদা পদ যদি না থাকতো তবে শিবের আসল মহিমা হয়তো প্রকাশ পেত না। এছাড়াও শাক্ত ধর্মের মূল ভাবনাও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পেত না। সেক্ষেত্রে এগুলিকে একেবারেই নিছক বলা যাবে না। অন্যদিকে মধ্যযুগের সাহিত্যে বন্দনা অংশের উল্লেখ থাকাটা আবশ্যিক রীতি, যা এই ধারার প্রথম কবি রামপ্রসাদকেও করতে হয়েছে। তাই রাজসভার কবি হিসেবে হরেন্দ্রনারায়ণ কিংবা শিবেন্দ্রনারায়ণও এগুলিকে ত্যাগ করতে পারেননি। যদিও হরেন্দ্রনারায়ণ সরাসরি শিব বন্দনা অংশের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলি ছাড়াও প্রায় সমস্ত পদেই বিভিন্নভাবে শিব প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। আগমনী পর্যায়ে শিবকে মাটির মানুষে পরিণত করা হয়েছে। সেখানে হয়তো শিবকে প্রতীক চরিত্র হিসেবে অঙ্কন করেছেন। অন্যান্য পর্যায়ের পদে বিশেষ করে মনোদীক্ষা, জগজ্জননীর রূপ, মাতৃস্বরূপ, নাম মহিমা, ভক্তের আকুতি শীর্ষক পদেও শিব বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। 'মনোদীক্ষা' শীর্ষক পদে তন্ত্রসাধনার নানান কথা. রূপকের ছলে ব্যক্ত করেছেন উভয় কবিই। সেখানেও শৈবভাবনা নিজস্ব স্থান দখল করেছে।

সুতরাং আমাদের কাছে স্পষ্ট যে শাক্ত পদাবলীর আগমনী পর্যায়ের গানের বিষয়বস্তু একেবারে সাধারণ, তবে এই কাহিনী বর্ণনা করা কবিদ্বয়ের উদ্দেশ্য নয়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে —''অন্তরের একটি শাশ্বত স্নেহবোধকে সঙ্গীতের সুরে প্রকাশ করাই ইহার প্রধান লক্ষ্য। এই জন্য যে ক্ষীণতম কাহিনীটি এখানে অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক আখ্যানের উপরই পরিকল্পিত, লৌকিক আখ্যানের উপর নহে।''[২০] অর্থাৎ এক্ষেত্রে পুরাণের মূল ভাবনাকে

সকল কবিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তারপরেও প্রত্যেক কবির কলমে তা ভিন্নধর্মী হয়ে উঠেছে। যা হরেন্দ্রনারায়ণের পদ থেকেও স্পষ্ট।

দ্বিজ মাধবচন্দ্রের 'চণ্ডিকার ব্রতকথা'য় শিব প্রসঙ্গ ঃ

মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের (১৮৩৯-১৮৪৭) রাজসভায় দ্বিজ মাধবচন্দ্রের আবির্ভাব ঘটে এবং এই রাজার নির্দেশেই কবি 'চণ্ডীকার ব্রতকথা' রচনা করেন। এই গ্রন্থ থেকেই আমরা শিব প্রসঙ্গ গুলি বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো।[২১] কাব্যের রাজপ্রশস্তি অংশে কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের প্রশংসা করেছেন।

''ধনদ মিত্রের কুলে অমিত্র দমন।
অমিত বিক্রম ভূমিপতি পঞ্চানন।।
জীবের পালক সদা শিব পরায়ণ।
নাম ধরে শ্রীল শ্রীশিবেন্দ্রনারায়ণ।। পৃ.৩

এই ধরনের কাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য উল্লেখ করেছেন - ''বাংলার 'মঙ্গ লচণ্ডীর গীত' অত্যন্ত প্রাচীন। চৈতন্যজীবনী কাব্যের লেখক বৈষ্ণব কবি বৃন্দাবন দাস ষোড়শ শতাব্দীর নবদ্বীপের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, তখনকার লোক মঙ্গলচণ্ডীর গীত গেয়ে রাত্রি জাগরণ করত। 'মঙ্গলচণ্ডীগীত' মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী কিংবা তাঁর ব্রতকথার চাইতেও আকারে অনেক বড়, কারণ সারা রাত্রি ধরে তাঁর কেবল মাত্র জাগরণ পালাটিই গাইতে হত। সারা মঙ্গলগানটি ষোল পালায় বিভক্ত থাকত, আট দিনে তা শেষ হত। এই বৃহৎ রচনাটির পূর্বে পাঁচালী কিংবা ব্রতকথার ক্ষুদ্র রচনাগুলো প্রচলিত ছিল, অবশ্য তখন তা মুখে মুখে প্রচলিত ছিল, তার অনেক পরে তা লেখা হয়েছিল। যদি তাই হয়, তবে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা কিংবা তাঁর পাঁচালীগুলো খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুখে মুখে চলত।''[২২] অর্থাৎ এখান থেকে স্পষ্ট যে সমাজে আগে এই ধরনের ব্রতকথাগুলি প্রচলিত ছিল, পরে তা বিভিন্ন কবির হাতে এসে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের রূপ লাভ করে। যদিও আলোচ্য কাব্যটি অনেক পরে রচিত হয়েছে।

কাব্যটি কোন সময় রচিত হয়েছে সেই সম্পর্কে কাব্য মধ্যে একটি কালজ্ঞাপক পঙক্তি পাওয়া যায়-

''বিধি বৈরি বারানিধি বিধু পরিমাণে।
শাক বর্ষে ফাল্গুন মাসের অবসানে।।
নব নর নায়ক করিল নিদেশন।

চণ্ডিকার ব্রত কথা করিতে রচন।।'' পৃ.৪

পুথি গণনার নিয়ম অনুযায়ী কাব্যের রচনা কাল দাঁড়ায় ১৭৬১ শকাব্দ, বা ১৮৩৯ খ্রী. বা ১২৪৬ বঙ্গাব্দ। ১২৪৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে কবি পুথিটি রচনা করেন। শিবেন্দ্রনারায়ণের সময় সীমাও এর মধ্যেই পড়ে। তাই শিবেন্দ্রনারায়ণের সময়কেই কাব্যের সঠিক রচনাকাল হিসাবে মনে করা যেতে পারে।

'চণ্ডিকার ব্রতকথা' কাব্যের কবি দ্বিজমাধবচন্দ্র নিজের সম্পর্কে তেমন কিছুই বলে যাননি। তবে যে সমস্ত ভনিতা পাওয়া যায় তাতে কবির নামের উল্লেখটুকুই পাওয়া যায়- 'শ্রী মাধব ভনে'। তবে তাঁর রচিত বিষ্ণুপুরাণ গ্রন্থে কবি নিজের ব্যক্তি পরিচয় দিয়েছেন এইভাবে —

''পরম দেবতা পাদপদ্ম পরায়ণ।
দ্বিজ কৃষ্ণ মিশ্র অধ্যাপকের নন্দন।
বৃদ্ধ হৈল বিষয় না জানে অদ্যাবধি।
গোবরাছাড়ার বৈদ্যনাথ বিদ্যানিধি।।
তাহার কুমার পুরাণের পদগণ।
শ্রীমাধব শর্মা করিল রচন।। '' [২৩]

এখান থেকে কবির তিন পুরুষের পরিচয় জানা যায়। দ্বিজ কৃষ্ণমিশ্রের পুত্র বৈদ্যনাথ বিদ্যানিধি, তার পুত্র মাধবচন্দ্র শর্মা । এঁদের বাস ছিল অধুনা কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার গোবরাছাড়া নামক গ্রামে। এই গ্রামটির অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। কবি ব্রাহ্মণ কুলজাত ছিলেন, তার ধর্মপ্রবণ মনের আকুল প্রার্থনা মাঝে মাঝে গ্রন্থমধ্যে উল্লেখ রয়েছে। কখনো তিনি সবিনয়ে বলেছেন যে তার শক্তি অনুসারে দ্বিজভগবতীর পদ রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। কিন্তু ভগবতী কথা প্রচারে প্রয়াসী হলেও বৈষ্ণবীয় ভাবনাই তাঁর মধ্যে প্রবল ছিল। তবে তিনি ব্যক্তিগত জীবনে হয়তো শৈব ছিলেন। যার পরিচয় কাব্য মধ্য থেকে স্পষ্ট —

''ব্রতের কথন হৈল সমাপন
শিব বল একবার।।'' পৃ.৩৯

কিংবা তাঁর মহাভারতের স্বর্গারোহন পর্বের অনুবাদের মধেও কবি শিব ভাবনার কথাই স্পষ্ট করেছেন —

''শিব শিব বল সাধু সভাসদ জন।
শুনিলে ভারত পাপ শত বিমোচন।।'' [২৪]

কিন্তু কবি নিজের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে এর বাইরে কিছু বলেন নি। তবে এ কথাও বলা যেতে পারে

যে কবির পৃষ্ঠপোষক রাজা যেহেতু শৈব ছিলেন তাই কবিকে শৈব ভাবনা বশত এরকম উক্তি লিখতে হয়েছে। কবি যদি নিজেও শৈব হতেন তবে হয়তো বার বার করে শৈব ভাবনার কথা কাব্যে উল্লেখ করতেন। কিন্তু এখানে কবি দু'একবার ছাড়া শিব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেননি। তিনি শুধু কাব্যের শক্তি মাহাত্ম্য বলতে গিয়েই শিব ও শক্তির সমন্বিত রূপের কথা বলেছেন।

সমগ্র কাব্যটি তিনটি অংশে বিভক্ত। বন্দনা অংশ, রাজপ্রশস্তি ও রচনাকাল এবং ব্রতকথা। ব্রতকথা অংশটি আবার খুলহনার দুঃখ মোচন, ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা, শ্রীপতির বাণিজ্যযাত্রা এবং পিতাপুত্রের মিলন ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন অংশে বিভক্ত। বন্দনা অংশ ব্যতীত অন্যত্র শিবপ্রসঙ্গ সেভাবে নেই বললেই চলে।

দ্বিজ মাধবচন্দ্র 'চণ্ডিকার ব্রতকথা' কাব্যটি রচনা করেছেন মার্কণ্ডেয় পুরাণের কাহিনী থেকে দেবী মাহাত্ম্য চয়ন করে। প্রলয় বারিতে হরি যখন অনন্ত নাগের উপর যোগনিদ্রায় শায়িত ছিলেন তখন মধু ও কৈটভ নামে দুজন অসুরের জন্ম হয়। তখন তারা ব্রহ্মাকে সংহার করতে উদ্যত হন। পরে এই উদ্ধত অসুরদের মস্তক বিষ্ণু তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা ছেদন করেন। অন্যদিকে মহিষাসুরের ভয়ে ব্রহ্মা সহ অন্যান্য দেবতারা বিব্রত হলে সকলে মিলে মহাদেব ও বিষ্ণুর কাছে প্রতিকার চেয়ে প্রার্থনা জানান। সেই প্রার্থনার ফলে আমরা দেখতে পাই সকল দেবতার তেজ থেকে এক পরমাসুন্দরী নারীর জন্ম হয়। যে নারী অসুর বিনাশকারী দেবী চণ্ডী রূপে আবির্ভূত হন। এবং আমরা দেখি এই দেবীই মহিষাসুর নামক দানবকে বধ করেন। তিনি এরকম অবস্থা থেকে প্রজাদেরকে রক্ষা করবেন বলে যুগে যুগে তার আবির্ভাব হবে।

আরও পরে আমরা দেখি শুম্ভ নিশুম্ভের ভয়ে দেবগণ বিব্রত হলে তখন তাঁরা আবার দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবী তখন চণ্ডমুণ্ডকে বধ করেন এবং একে একে শুম্ভ নিশুম্ভ, রক্তবীজ প্রমুখ শক্তিশালী দানবদেরও একা বধ করেন।

''নিশুম্ভ শুম্ভের ডরে হিম গিরিবরে।
যাইয়া করিতে স্তুতি অমর নিকরে।।
.....
কমনীয় রূপ দেখি শুম্ভের কিঙ্কর।
নিবেদিতে শুনি দৈত্যগণের ঈশ্বর।।
.....
দূত মুখে আজ্ঞা ভঙ্গ শুনি দৈত্যপতি।
সেনাপতি যাইতে করিল অনুমতি।।

.....

একার শুম্ভেক বধ করি ভগবতী।

বর দিল দেবতা নিকরে কৈল স্তুতি।।

হৈল অন্তর্ধান সর্ব্বদেব বিদ্যামানে।

নমো নমো মঙ্গলচণ্ডীর শ্রীচরণে।।" পৃ. ১,২,৩

কাব্যের অন্যত্র শিব প্রসঙ্গ সেভাবে উল্লেখ নেই। খুলহনার দুঃখ মোচন থেকে শুরু করে পিতাপুত্রের মিলন ও তাদের স্বদেশ প্রত্যাগমন অংশে দেবী চণ্ডীর মহিমাই বর্ণিত হয়েছে। আসলে ব্রতকথার মধ্য দিয়ে দেবী চণ্ডীর পূজা প্রচারই এই কাব্যের মূল কথা। সেক্ষেত্রে চণ্ডীর স্বামী হিসাবে শিবের প্রসঙ্গ উত্থাপন যতটা প্রয়োজন কবি ঠিক ততটাই করেছেন।

গোসানীমঙ্গল কাব্যে শিব প্রসঙ্গ

বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় ভারতচন্দ্রই শেষ কবি। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও কয়েকটি মঙ্গলকাব্য বিক্ষিপ্তভাবে রচিত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে একটি হল রাধাকৃষ্ণদাস বৈরাগী বিরচিত 'গোসানীমঙ্গল'। আসলে এখানে গোসানী দেবী বলতে দেবী চণ্ডীর কথা বলা হয়েছে। কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার গোসানীমারী নামে একটি স্থান রয়েছে। সেখানে একটি মন্দিরও দেখা যায়, যেখানে দেবী চণ্ডীকে কবচ রূপে নিত্য পূজা করা হয়। জানা যায় কোচবিহারের রাজা বিশ্বসিংহ -এর আমলে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৬৬১ খ্রিঃ মীরজুমলা কর্তৃক কোচবিহার আক্রান্ত হলে মন্দিরটি অনেক ক্ষত-বিক্ষত হয়। এজন্য ১৬৬৫ খ্রিঃ রাজা প্রাণনারায়ণের চেষ্টায় মন্দিরটি নতুন করে সংস্কার করা হয়। বিশ্বসিংহ যে এর প্রথম প্রতিষ্ঠাতা এ বিষয়ে মন্দিরে কোনো তথ্যাদি নেই। কিন্তু বর্তমান মন্দির গাত্রে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে প্রাণনারায়ণের নাম উল্লেখ রয়েছে।

কাব্য মধ্যে কবির আত্মপরিচয় এবং রচনাকাল জ্ঞাপক কোনো তথ্যাদি নেই। তবে কাব্যের বিষয়বস্তু দেখে বোঝা যায় কবি কোচবিহারের অধিবাসী। রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত 'গোসানীমঙ্গল' কাব্য থেকে রাজা কান্তেশ্বরের জন্ম, তাঁর রাজা হবার কথা, রাজ্যজয়ের কথা, রাজ্য ধ্বংস হবার যেমন জানা যায় তেমনি শিব প্রসঙ্গও বিভিন্ন ভাবে জানা যায়।[২৫]

"গোসানীর স্থানে আসি দিল দরশন।

আদেশ করিল রাজা শুন সর্ব্বজন।।" পৃ-১২৩

কিংবা,

''তার মধ্যে পাতে হাট দক্ষিণ বাহিনী।
গোসানীর হাট বলি তাহারে বাখানী।।
আপনি বসায় হাট রাজা কান্তেশ্বর।
গোসানীগঞ্জ বলি নাম রাখিলেন তার।।'' পৃ-১২৪

এছাড়াও কাব্য মধ্যে এমন কতগুলো ভূ-খণ্ডের নাম রয়েছে যা এখনও গোসানীমারী বা তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থান করছে। নিচে এরকম কয়েকটি নাম কাব্য থেকে উদ্ধার করা হল —

''কাজিলা কুড়ায় আনি কবচ ধুইল।
তাহে তার বর্ণ ভাতি দ্বিগুণ বাড়িল।।'' পৃ-১১৩

কিংবা,

কোদালের চোটে মাটি করিয়া অন্তর।
কোদালধোয়া দিঘি কৈল অতি মনোহর।।'' পৃ-৯৫

কিংবা,

হেন মতে রাজপাট করি সমাপন।
তাহার পশ্চাতে করে অন্দর ভবন।'' পৃ-৯৪

এখানে উল্লিখিত কাজলীকুড়া, কোদালধোওয়া দিঘি, রাজপাট এছাড়াও মনোহর দিঘি, সাগর দিঘি উক্ত অঞ্চলে আজও অবস্থিত। মূলমন্দির থেকে দেড় কি.মি. দূরে এখনও কোদালধোয়া দিঘির অস্তিত্ব রয়েছে। এবং সেখান থেকে আরো এক কি.মি. দূরে রাজপাটের স্তুপ এখনও রয়েছে। তাই আমরা বলতে পারি যে কবি যদি সেই জায়গার লোক না হতেন তাহলে এইসব বিষয়গুলি তাঁর কাব্য মধ্যে উল্লেখ করতে পারতেন না। তাই এই কবিকেও আমরা কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার একজন কবি আখ্যায় ভূষিত করতে পারি।

আবার কাব্য মধ্যে রচনাকাল সম্পর্কে কোনো তথ্যের উল্লেখ নেই। তাই কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করতে গিয়েও কয়েকটি সূত্রের উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। নৃপেন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত গ্রন্থের গ্রন্থ পরিচিতি অংশ থেকে জানা যায় কাব্যটি ১২৩১ বঙ্গাব্দ বা ১৮২৫ খ্রিঃ রচিত। কাব্য মধ্যে এই সময়ের বর্ণনাও রয়েছে। অর্থাৎ বিষয়গত দিক থেকে কাব্যটি মধ্যযুগীয়। মধ্যযুগীয় আখ্যানে পরবর্তীকালে কাব্য রচনা করা যেতে পারে, হয়তো সেদিক থেকে কাব্যটি অনেক পরে লেখা। কিংবা হয়তো দেবী চণ্ডী কবিকে অনেক পরে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন । তবে কাব্য মধ্যে যে স্বপ্নাদেশের পরিচয় পাওয়া যায় তা এই রকম —

''হরেন্দ্রনারা (য়)ণ রাজা, বেহারে পালেন প্রজা,
যাঁর যশ ঘোষে সর্ব্বজন।।
সেই রাজ্যে করে ঘর, সাধু সে করুনা কর,

পরম বৈষ্ণব গুণধাম।।
তাহার তনয় এক, পাইয়া চৈতন্য ভেক
চিন্তে হরি চরণ-কমল।।
তাহে আদেশিলা দেবী, কহে রাধাকৃষ্ণ কবি,
সুমধুর গোসানীমঙ্গল।'' পৃ-৬৯

এখান থেকেও স্পষ্ট যে রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময় কাব্যটি রচিত হয়। আর হরেন্দ্র নারায়ণের সময়সীমা হল ১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রিঃ পর্যন্ত। অর্থাৎ তাঁর রাজত্বকাল ৫৬ বছর। সুতরাং কাব্য মধ্যে এই রাজার উল্লেখে বোঝা যায় কাব্যটি এই সময় রচিত হয়েছে। তবে এই কাব্য সম্পর্কে অনেক সমালোচক ভিন্ন মন্তব্য করেছেন। মূল গ্রন্থের প্রকাশক ব্রজচন্দ্র মজুমদার বিজ্ঞাপনে 'গোসানীমঙ্গল'কে কোচবিহারের আদিকাব্য বলে দাবি করেছেন। মজুমদার মহাশয় যখন গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তখনও পর্যন্ত কোচবিহার রাজকীয় গ্রন্থাগারে (অধুনা রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে) এবং কোচবিহার সাহিত্য সভায় সংরক্ষিত প্রাচীন পুথিসমূহের পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়নি, তাই তার পক্ষে সে সম্পর্কে কৌতুহলী হওয়াও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তার সময়ে জনপ্রিয় ও বহুল প্রচারিত এই কাব্যকেই তিনি আদি কাব্য বলে ধরে নিয়েছেন। আবার নৃপেন্দ্রনাথ পাল এটিকে পরিপূর্ণ মঙ্গ লকাব্য বলতে চেয়েছেন। অন্যদিকে শ্রীসুবোধচন্দ্র রায় গ্রন্থটিকে ব্রতকথা জাতীয় গ্রন্থ বলে মনে করেন। কেননা, তাঁর মতে বাংলার নানা অঞ্চলের স্থানীয় লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন করে এই ধরনের ক্ষুদ্রাবয়ব পদ্য রচনা কম হয়নি। তবে মঙ্গলকাব্য, আদিকাব্য কিংবা ব্রতকথা জাতীয় কাব্য যাই বলা হোক না কেন এর মধ্য দিয়ে যে সমকালীন সমাজ এবং নানান ঐতিহাসিক ঘটনা উঠে এসেছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যদিও এতে অন্যান্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মতো দেবখণ্ড বা বণিকখণ্ড নেই। তাই যথার্থ অর্থে একে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বলা না গেলেও দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য যে এতে বর্ণিত রয়েছে একথা স্বীকার করতেই হবে। আর অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মতো এতে আমরা শিবচরিত্রকে পাই না। মূলত কান্তেশ্বরের জন্ম থেকে শুরু করে তার বিবাহ, রাজা হবার ঘটনা এবং হুসেন শাহ কর্তৃক তাঁর রাজ্য আক্রমণের বর্ণনাই এতে প্রাধান্য পেয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রসঙ্গক্রমে শিবের কথা এসেছে।

বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মতো করে 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যকে হয়তো বিচার করা যাবে না। কেননা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেমন স্বর্গ-ভ্রষ্ট দেবতা মর্ত্য পৃথিবীতে এসে দেব-দেবীর পূজা প্রচার করেন, এখানে সে রকম কোনো ঘটনা নেই। কিংবা অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো গ্রন্থোৎপত্তির কারণ, দেবখণ্ড ও বণিকখণ্ডের মধ্য দিয়ে কাব্যটি বিভাজিতও হয়নি। কিংবা কাব্যের উদ্দীষ্ট দেবী চণ্ডী ভক্তের সঙ্গে কোনো ছলনারও আশ্রয় নেননি। অর্থাৎ অন্যান্য মঙ্গ

লকাব্যের মতো এখানে কোনো দেবতা-মানবের সংঘাত দেখা যায়নি। বরং কান্তেশ্বরের রাজা হবার কাহিনী এবং রাজ্য ধ্বংস হবার কাহিনী এতে সুকৌশলে বিবৃত হয়েছে। আর এতেই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলির মতো দেব মহিমা নেপথ্য থেকে প্রচারিত হয়েছে। এবং এতে দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম প্রচার করার জন্য শিবও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। শিব চণ্ডীর পারষ্পরিক পরামর্শেই এরা ভক্তদেরকে বরদান করেছেন -

''পার্ব্বতী সহিত শিব শ্রীফলের তলে।
একত্র বসিয়া কথা কহে নানা ছলে।।
শিব কহে শুন দুর্গা আমার বচন।
এই রাজ্যে যত লোক সুখী সর্ব্বজন।।
সুবর্ণ বরণ ফল বেলাদি শ্রীফলে।
ঘরে ঘরে শিবদূর্গা পূজে কুতূহলে।।
চণ্ডী কহে বর দেও ভোলা মহেশ্বর।
এই রাজ্যে রাজা হ'ক নাম কান্তেশ্বর।।'' পৃ.৭১

কিংবা

''কোচ রাজ্য মধ্যে কান্তা সুপবিত্র স্থান।
আমিও তথায় গিয়া হব অধিষ্ঠান।।
কান্তনাথ হ'তে হবে পূজার প্রচার।
মনে মনে এই যুক্তি করিয়াছি যার।।'' পৃ. ৭৫

এখান থেকেই স্পষ্ট যে এই কাব্যের শিব বা চণ্ডী কেউই ভক্তদের কাছ থেকে পূজা আদায়ের জন্য কোনো ছলনার আশ্রয় নেননি। বরং ভক্তের ভক্তির মাধ্যমেই নিজেদের কাজ হাসিল করে নিয়েছেন। এতে ভক্তও সহজেই আশাতীত সাফল্যে পৌঁছে গিয়েছেন। আসলে দেবদেবীর আশীর্বাদ থাকলে চলার পথে যে কোনো প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে না, তার নিদর্শনই এই কাব্য। আবার নিজকৃত ভুলের জন্য সর্বনাশও ঘটতে পারে, তারও দৃষ্টান্ত বুঝি এই 'গোসানীমঙ্গল'কাব্য।

কাব্য পাঠে আমরা দেখি বিভিন্ন নগরপত্তনের কথা। কান্তেশ্বর রাজা হবার পর রাজ্য বিস্তৃতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন নগর, হাট-বাজার বিভিন্ন মঠ-মন্দির পত্তনের প্রসঙ্গ আসে। এই সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেও শিব-দুর্গার নেপথ্য ভূমিকা কাজ করেছে। যা কাব্য পাঠে স্পষ্ট। যেমন —

''পশ্চিমের দ্বারে দিল বালাখান করি।

নহবত বসাইল তাহার উপরি।।
এরূপে চণ্ডীর মঠ করিয়া নির্ম্মাণ।
পশ্চিমের দ্বার লাগি করিল প্রস্থান।।
মনোহর দিঘি এক তথায় কাটিয়া।
চারি ধার বান্ধে তার ইট পাথর দিয়া।।
চারি ধারে চারি ঘাট পাথরে শোভিল।
মহেশের পাট তথা নির্ম্মাণ করিল।।
অপূর্ব্ব হইল পাট দেখিতে সুন্দর।
কান্তেশ্বর পূজে তথা উমা মহেশ্বর।।'' পৃ.৯২

স্পষ্টতই এখানে দেবী চণ্ডীর মন্দির নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। আবার এখানে যে 'মহেশের পাট' এর উল্লেখ রয়েছে সেটি এখনও সিতাই ব্লকে অবস্থান করছে। সেখানে একটি প্রাচীন মন্দির রয়েছে এবং সেখানে প্রাচীনকাল থেকে এখনো শিবরাত্রির দিন এই শিব পূজিত হন। লক্ষণীয় এই শিবমন্দির 'মহেশের পাট' নামেই পরিচিত।

''নানাবিধ কারুকার্য্যে করিল শোভন।
মহেশের পাট হল অমর ভূবণ।।'' পৃ. ৯৩

আবার কবি রাজ্য জয় প্রসঙ্গে লিখেছেন —

''পূর্ব্বেতে বিরাট রাজা ঘোড়াঘাটে ছিল।
অশ্ব গো পালন যাহে পাণ্ডব করিল।
করি ঘোরাঘাট জয় পূর্ব্ব দিকে যায়।
পাঙ্গা নামে রাজ্য তথা উত্তরে ত্বরায়।।'' পৃ.১১৭।

এইভাবে শুধু রাজ্যবিস্তারই নয়, মৃগয়া করতে গিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতাও তাঁর কাজকে তরান্বিত করে। সেই অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে দেব-দেবীর স্বপ্ন দর্শন অন্যতম। আমরা জানি কোটেশ্বর শিবেরই আর এক নাম । এখানে কান্তেশ্বর যখন মৃগয়ায় গমন করেন তখন কোনো পশু পাখি শিকার করতে না পেরে রাজা বনমধ্যে আগুন লাগিয়ে দেন। ফলে বনের সবকিছু আগুনে পুড়ে যেতে থাকে। কিন্তু সেই বনে 'কোটেশ্বর' শিব অবস্থান করায় তিনিও পুড়ে যেতে থাকেন। তখন কোটেশ্বর শিব তাকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং বলেন —

''প্রকাশ হইব বলি মনে ইচ্ছা কৈনু।
ভালুকের রূপে আমি তোরে দেখা দিনু।।

বন ঘেরি অগ্নি দিলা ছাও না পাইলা।
কোটেশ্বর লিঙ্গ আমি যে দেখিলা শিলা
কান্তেশ্বরী কোটেশ্বর ভিন্ন দেহ নয়।
করিলে আমার পূজা বাঞ্ছা সিদ্ধি হয়।।" পৃ. ১১৮-১১৯

আবার এখানে বানেশ্বর শিবমন্দির প্রসঙ্গে কথাও এসেছে। এই চণ্ডীর সঙ্গে বানেশ্বর যে অভেদ তাও দেবীর স্বপ্নাদেশের মধ্যে স্পষ্ট —

"শুনশুন কান্তেশ্বর আমার বচন।
ভগদত্ত স্থাপিত আমরা দুইজন।।
বিদেশ্বরী বানেশ্বর এই দুই নাম।
কান্তেশ্বরী কোটেশ্বর জান আর নাম।।" পৃ. ১২০

কিংবা

'বন মধ্যে পায় রাজা লিঙ্গ বানেশ্বর'। পৃ.১২০

লক্ষণীয় বানেশ্বর, কোটেশ্বর এগুলি উত্তরবঙ্গে শিবরূপেই পরিচিত। কোচবিহার রাজ আমলে এই দেবতারা প্রতিষ্ঠা পায়। শুধু বানেশ্বর, কোটেশ্বর বা মহেশ্বরই নন, জল্পেশ্বরও রাজাকে স্বপ্নে দেখা দেন —

"নিশা ভাগে মহাদেব কহে নৃপস্থান।
ভগদত্ত স্থাপিত আমি জল্পেশ্বর নাম।।
করহ আমার পূজা ওহে কান্তেশ্বর।
তব যশঃ ঘোষিবেক এ তিন সংসার।।" পৃ-১২২

এইভাবেই শিবরূপী জল্পেশ্বরও তাকে দেখা দিয়ে পূজা প্রচারের কথা বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই জল্পেশ্বর উত্তরের শৈবক্ষেত্রগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ শৈবতীর্থ। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানা থেকে ৪-৫ কিমি. দূরে যে মন্দিরটি এখনও শৈব ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছে। আবার ভগদত্তের প্রসঙ্গও এখানে বার বার করে এসেছে। এই ভগদত্ত সম্পর্কে কোচবিহার জেলার গোসানীমারী অঞ্চলে আজও একটি মিথ প্রচলিত আছে। এই মিথটির ইঙ্গিত অবশ্য কাব্য মধ্যেও খানিকটা রয়েছে। মিথটি হল এতদঞ্চল একসময় প্রাচীন কামরূপ নামে পরিচিত ছিল। এবং সেখানে একাধিক রাজবংশ শাসন কার্য সম্পাদন করেছে। যার মধ্যে নরকের পুত্র ভগদত্ত নিজেও ছিলেন। এই নরকের পুত্র ভগদত্ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দুর্যোধনের পক্ষে যোগদান করে অর্জুনের হাতে নিহত হন। পরে তার এই কবচরূপী হাতকে চিল মুখে করে নিয়ে যাচ্ছিল এবং বর্তমান গোসানীমারীর

যে স্থানে মন্দিরটি রয়েছে, সেখানেই চিলের মুখ থেকে কবচটি পড়ে যায়। এ কারণেই এখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। যেখানে আজও কবচরূপী দেবী চণ্ডীর পূজা দেওয়া হয়।

এতো গেল দেব-দেবীর দিক থেকে মর্ত্যের মানব মানবীর প্রতি সহৃদয়তা। আমরা কান্তেশ্বরের দিক থেকেও দেবীর প্রতি সেই সহৃদয়তা দেখতে পাব। শিব এবং দুর্গার বরে ভক্তিশ্বর-অঙ্গনার গর্ভে কান্তেশ্বরের জন্ম হয়। এই সময় কান্তেশ্বরের বাবা ও মা ভক্তিশ্বর ও অঙ্গনা ক্রমে শিব পূজার ব্রতে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। সেই চিত্রও আমরা কাব্য মধ্যে পাব। কান্তেশ্বরের বয়স পাঁচ বছর পূর্ণ হলে, ভক্তিশ্বর যখন মারা যাবেন, তখন চিত্রগুপ্তকে দিয়ে তার জীবনের আদি অন্তের খোঁজ নেওয়া হয়। তখন চিত্রগুপ্তের মুখ থেকে সেসব কথা জানা যায় -

''চিত্রগুপ্ত কহে তবে সকল বৃত্তান্ত ।
ভক্তীশ্বর সম সাধু নাহিক কৃতান্ত।।
চতুর্দশী পালে দেখ আর দুর্ব্বাষ্টমী।
শিবরাত্রি পালে আর জয়ন্তী অষ্টমী।।
শুক্লপক্ষ কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমী পাইয়া।
উপবাসে জাগরণে পূজে পুষ্প দিয়া।।
একাদশী ব্রত আদি যত তিথি পায়।
ব্রত উপবাসে পূজে হরগৌরী পায়।।'' পৃ. ৭৮

ভক্তিশ্বর এতটাই শিবভক্ত ছিলেন যে মৃত্যুর পরেও তার শিবলোকেই স্থান হয়।

''শিবদুর্গা বলি প্রাণ বাহির হইল।
শিবদূতে ধরি তারে শিব-লোকে নিল।।'' পৃ. ৭৯

ভক্তিশ্বর মারা যাবার পর পাঁচ বছরের পুত্রকে নিয়ে অঙ্গনার দুঃখের অন্ত নেই। তাই বাধ্য হয়ে এক ব্রাহ্মণের গৃহে দু-বেলা অন্নের বিনিময়ে কান্তেশ্বরকে রাখাল বালক হিসাবে রেখে দেন। রাখাল কান্তেশ্বর একদিন জমিদারের গরু চড়াতে গিয়ে প্রচণ্ড নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন এবং বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে নিদ্রা যান। যা শিব এবং দুর্গা সহ্য করতে পারেনি। তাইতো কৈলাস থেকে তারা পদ্মাকে আদেশ করেন যাতে কান্তেশ্বরের নিদ্রায় কোনো ব্যাঘাত না ঘটে।

''সুস্থ হয়ে গাভীগণ ইতস্থতঃ যায়।
সুশীতল স্থান পেয়ে কান্ত নিদ্রা যায়।।
বৃক্ষতলে কান্তনাথ শুয়ে নিদ্রা গেল।
কৈলাসে থাকিয়া তাহা ভবানী জানিল।।

চণ্ডী কহে শুন পদ্মা কর অবধান।
শীঘ্রে গতি দেও নাগ কান্তনাথ স্থান।।'' পৃ. ৮২

অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে যেমন নানান অলৌকিক কাহিনী স্থান পায়, এখানেও যেন তাই হয়েছে। এভাবেই দেবীর বরে কান্তেশ্বরের দাসত্ব মোচন হয়, এবং দেবীর বরে সে রাজায় উন্নীত হয়। তবে রাজা হবার সময় দেবী তাকে সাবধান বাণীও দিতে ভোলেননি।

''শুন কান্ত এই মম স্বরূপ বচন।
অবিচারে রাজ্য তুমি না কর পালন।।
যদ্যপি আমার বাক্য অন্যথা করিবে।
আপনার দোষে তুমি আপনি মজিবে।।'' পৃ. ৮৯

রাজা হবার পর হয়তো কান্তেশ্বরের আর এই কথা মনে ছিল না। তাই নিজ কৃতকর্মের ফলে নিজে এবং নিজ রাজবংশকে ধ্বংস করেছেন। আসলে এইখানেই অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কেননা অন্যত্র দেব-দেবীরা নিজের পূজা প্রচার শেষে যেমন শাপভ্রষ্ট মানব মানবীকে স্বর্গে ফিরিয়ে নিয়ে যান, সেক্ষেত্রে মর্ত্যে পূজা প্রচারই যেমন তাদের মূল উদ্দেশ্য, ঠিক তেমনি এখানেও তাই ঘটেছে। চণ্ডীর পূজা প্রচারও শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কান্তেশ্বরের ধ্বংসও দেখানো হয়েছে। এখানেই যেন দেবী নির্মম, নিষ্ঠুর।

এই কাব্যের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে কাব্যের পরিশিষ্ট অংশে নির্মল দাস লিখেছেন - ''গোসানীমঙ্গল' উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবী গোসানী চণ্ডীর মাহাত্ম্য বর্ণনার জন্য রচিত। কোচবিহারের রাজা হরেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে (১৭৮৩-১৮৩৮) বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ দাস কাব্যটি রচনা করেন। কাব্যটি বয়সে অর্বাচীন ও কলেবরে ক্ষুদ্র হলেও নানা দিক থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কাব্যটি চণ্ডী বিষয়ক হলেও এতে চণ্ডীমঙ্গলের প্রচলিত কাহিনী দুটির কোনটিই বর্ণনা করা হয়নি। এর কাহিনীর ভিত্তি ইতিহাস। কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের আগে এই অঞ্চলে ছিল 'খেন' রাজাদের আধিপত্য। এই 'খেন' বংশীয় রাজারাই ছিলেন গোসানীচণ্ডীর উপাসক। এঁদের রাজ্যলাভ ও রাজ্যলোপ নিয়ে এ অঞ্চলে যে কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল সেগুলি নিয়েই গোসানীমঙ্গলের কাহিনীবৃত্ত গড়ে উঠেছে। অথচ এই কাব্য পুরুষানুক্রমিক রাজকাহিনী নয়। কবির কাহিনী-পরিকল্পনার নৈপুন্যে তিন রাজার কাহিনী এক নায়ক- রাজার রাজ্য লাভ, প্রেম, প্রতিহিংসা ও রাজ্যলোপের অখণ্ড বৃত্তান্তে পরিণত হয়েছে। ধর্মাশ্রয়ী কাব্য বলে এতে অলৌকিকতা থাকলেও তার সঙ্গে ইতিহাস, ধর্মবিশ্বাস ও লোকাচারের যে মানবধর্মী নিখুঁত বিবরণ পাওয়া যায় তা কোন সমঝদার আধুনিক পাঠকই উপেক্ষা করতে পারবেন না।''[২৬]

খ. মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে শিব

১. জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' কাব্যে শিব ঃ

দীর্ঘ পাঁচশ বছর ধরে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন কবিরা বিভিন্ন ধারায় মঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে 'মনসামঙ্গল' কাব্যধারা অন্যতম। দীর্ঘদিন ধরে এই মনসামঙ্গল কাব্যের যে কাহিনী প্রচলিত আছে তা একদিকে যেমন প্রথাসম্মত তেমনি অন্যদিকে মাহাত্ম্যমূলক। প্রথাসম্মত হবার কারণ হল একই কাহিনীকে পরবর্তী কবিরা গ্রহণ করছেন আর মাহাত্ম্যসূচক বলার কারণ সেখানে দেব-দেবীদের মাহাত্ম্যের কথাই সূচিত হয়েছে। অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেব-দেবীরাই যে শেষ কথা, সেখানে মানুষের প্রাধান্য যে প্রায় নেই তা বেশির ভাগ মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই বলা হয়েছে।

সুতরাং বলা যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে সমস্ত কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাব্যের মূল সুরের উৎস প্রায় এক। কিন্তু এঁরা একই কাহিনীকে গ্রহণ করলেও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। কাহিনীগত দিক থেকে (স্থানগত) মনসামঙ্গল কাব্য ধারাকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি —

১. পূর্ববঙ্গের ধারা
২. রাঢ়বঙ্গের ধারা এবং
৩. উত্তরবঙ্গের ধারা

— পূর্ববঙ্গের ধারায় যে সমস্ত কবিরা রয়েছেন তাঁরা হলেন - বিপ্রদাস পিপলাই, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণু পাল, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র, দ্বারিকা দাস প্রমুখ। রাঢ়বঙ্গের ধারায় যে সমস্ত কবিরা রয়েছেন তাঁরা হলেন - বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজবংশী দাস, গঙ্গাধর সেন প্রমুখ। উত্তরবঙ্গের ধারায় যে সমস্ত কবিরা রয়েছেন তাঁরা হলেন তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র প্রমুখ। এছাড়াও উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারায় মনকর ও দুর্গাবর, নারায়ণদেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি ভয়, আর এই ভয় বিস্ময় থেকেই সমাজের প্রাচীনতম দেবতাদের কল্পনা করা হয়েছে। তাই আমরা দেখতে পাই সমাজে যেসব প্রাচীন দেব-দেবী এখনও রয়েছে তারা প্রকৃতিরই অন্তর্গত আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক ভয় বা বিস্ময়ের বস্তু। আদিম মানুষ ছিল অরণ্যচারী, ফলে তারা পর্বত গুহা মধ্যে বাস করতো। একারণে অরণ্যচারী জীবজন্তুদের সঙ্গে তাদের সর্বদা সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হতো। এই অরণ্যচারী জীবজন্তুদের মধ্যে সাপ অন্যতম।

কেননা সাপ, বাঘ, ভাল্লুক কিংবা অন্য অরণ্যচারী জীব থেকে আকৃতি কিংবা গঠনগত দিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বুকে ভর দিয়ে চলে, এছাড়াও এরা দীর্ঘকাল নিঃশ্বাস বন্ধ করে শীতঘুম পর্যন্ত দেয়, বার বার খোলস পরিত্যাগ করে নতুন জীবন লাভ করে। তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রাচীনকালের মানুষদের কাছে এই প্রাণীটি ভয়েরই কারণ ছিল। আর আমরা জানি সভ্যতার ঊষালগ্নে যা একসময় ভয় ছিল, তা পরবর্তীকালে ভক্তিতে পরিণত হয়। সেক্ষেত্রে সর্পভয়ও ব্যতিক্রম নয়। এ বিষয়ে আসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন যুগে ও আদিম মানবসমাজে সর্প-উপাসনার সন্ধান পাওয়া যাইবে। প্রাচীন যুগে সর্প-ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র প্রাণীকে মানুষে ভয় করিত এবং আত্মরক্ষা করিবার জন্য তাহার পূজা-অর্চনা করিত, কোথাও-বা সেই জীবজন্তুকে 'জীবক' (Totem) রূপে গ্রহণ করিয়া নিজেদের সেই বংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিত। প্রাচীন ভারতের আর্যেতর নাগজাতি নাগপূজক ও সর্প - 'জীবকে' বিশ্বাসী কোনো সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেহ কেহ বলেন ব্যাবিলোনিয়া হইতে ভারতবর্ষে সর্পপূজার রীতি প্রচার লাভ করে। এ অনুমান যুক্তিসংগত নহে। ভারতবর্ষের জলবায়ুর গুণে এ-দেশে নির্বিষ সর্পের সংখ্যাও যেমন গণনাতীত, তেমনি বিষধর সর্পের সংখ্যাও কিছু অল্প নহে। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন যুগ হইতে আজ পর্যন্ত ঈষৎ অনগ্রসর সমাজে যে সর্পপূজা প্রচলিত থাকিবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? ভারতের অস্ট্রিক গোষ্ঠী অপেক্ষা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মধ্যে সর্পপূজার অধিকতর প্রচলন দেখা যায়। অসমের কোনো কোনো আদিবাসীর মধ্যে সর্পপূজা এখনও অনুষ্ঠিত হয়। এই সমস্ত আর্যেতর সংস্কার আর্যজাতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল; তাঁহারা অনার্যদের উপর শুধু উৎপাত করেন নাই, তাহাদের অনেক সংস্কার ও আচার-বিচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে এই সর্পপূজাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।''[২৭]

এই সর্পপূজা দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসার পর সমাজের ক্রমবিবর্তনের ধারায় তা একসময় অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পরিণত হয়। আর সর্পের অধিষ্ঠাত্রী এই দেবীই হলেন মনসা। আমরা লক্ষ্য করি বিভিন্ন দেবতার সঙ্গে সর্প বিদ্যমান। যেমন শিব, বিষ্ণু, কৃষ্ণ প্রভৃতি--- এদের কেউই সর্প দেবতা রূপে কিন্তু পরিগণিত হয়নি। সেক্ষেত্রে মনে করা হয় আদিম মানুষেরা তাঁকেই সর্প দেবীরূপে পূজা করেছেন যিনি বিষাক্ত সাপের বিষ ধ্বংস করতে পারেন। যার পরিচয় মনসামঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। এ কারণেই হয়তো মনসাকে সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে পূজা করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন পুরাণ যেমন 'ব্রহ্মবৈর্বত পুরাণ', 'অথর্ববেদ', 'মহাভারত' প্রভৃতিতে এই মনসা তথা সর্পদেবীর উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয় এতে সর্পদেবী সংক্রান্ত নানান কথা প্রচলিত আছে। যেমন 'অথর্ব বেদে' আর্য সমাজের বাইরে মোঙ্গল জাতির মধ্যে উদ্ভুত এক কিরাত কন্যার কথা

বলা হয়েছে। যে কন্যা সর্প বিদ্যায় পারঙ্গম। শুধু তাই নয়, এই নারী সর্প দংশনের প্রতিকারও করতে পারে। তাই এখান থেকে স্পষ্ট এই কিরাত কন্যার ধারণা থেকেই মনসা সম্পর্কে ধারণা তৈরি হয়েছে। এই ধারণা থেকেই হয়তো আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে মনসাদেবী বাংলার প্রতিবেশি গাঢ় কিংবা খাসিয়া জাতির মতো এক মাতৃতান্ত্রিক জাতির কন্যা। তবে একথা আমরা বলতে পারি এ ধরনের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কিরাত জনগোষ্ঠী থেকেই মনসার উদ্ভব হয়েছে।

কবি ও কাব্য পরিচয় ঃ

মনসামঙ্গল কাব্য ধারার একজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন জগজ্জীবন ঘোষাল। জগজ্জীবন ঘোষালের খণ্ডিত পুথিটি জলপাইগুড়ি জেলার একটি স্কুলের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগ্রহ করেন। পরে এই খণ্ডিত পুথিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিনী অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্ত মহাশয়কে দেখানো হলে তিনি তা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় ড. আশুতোষ দাসও জগজ্জীবন ঘোষালের একটি প্রাচীন ও পূর্ণাঙ্গ পুথি সংগ্রহ করেছিলেন। তাই অধ্যাপক শশীভূষণ দাসগুপ্তের পরামর্শে শ্রীসুরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও ড. আশুতোষ দাসের যৌথ সম্পাদনায় ১৯৬০ খ্রি. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগজ্জীবন ঘোষালের 'মনসামঙ্গল' প্রকাশিত হয়। এই কাব্যটিকেই মূল কাব্য ধরে নিয়ে শিব চরিত্র বিভিন্ন দিক তেকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে।[২৮]

উক্ত গ্রন্থের মধ্যে কবির আত্মপরিচয়জ্ঞাপক বেশি ভনিতা পাওয়া যায় না। যেটুকু ভণিতা পাওয়া যায় তার নিরিখেই কবির পরিচয় দেবার চেষ্টা করবো। কবির আত্মপরিচয়যুক্ত পঙ্‌ক্তিটি হল —

''চৌধুরী রূপরায় সর্বদেশে গুণ গায়
জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার কনিষ্ঠ অনুপাম
বিরচিল জগতজীবন।।
ব্রাহ্মণ ঘোষাল খ্যাতি কুচিয়ামোড়ে বসতি
প্রাণ মহামহীপতির দেশে
জগতজীবন গায় বন্দিয়া মনসার পায়
কবি দুর্গাচন্দ্র পতির আদেশে।।'' (পৃ-ভূমিকাংশ)

কিংবা, ঘোষাল রসালবংশে গুণান্বিত সর্ব্ব অংশে
রূপরায় চৌধুরীর পুত
জগতজীবন নাম নানা গুণে অনুপাম
রচিত পাঁচালি অদ্ভুদ।।
ব্রাহ্মণীর মহিমায় গীত পাইল স্বপনে।
পদ্মমুখী প্রাণনাথ জগতজীবনে।।'' (পৃ-ভূমিকাংশ)

— এই আত্মপরিচয় জ্ঞাপক পঙ্‌ক্তি থেকেই জানা যায় কবি জগজ্জীবন ঘোষাল বংশে দিনাজপুর জেলার কুচিয়ামোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির পিতামহ জয়ানন্দ। জয়ানন্দের পুত্র রূপরায় চৌধুরী। রূপরায় চৌধুরীর পুত্র ঘনশ্যাম। আর ঘনশ্যামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জগজ্জীবন। তাই কবিরও পিতা রূপরায় চৌধুরী, পত্নী পদ্মমুখী। কবি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই গ্রাম যে মহারাজা প্রাণনাথের রাজ্যভুক্ত ছিল তাঁর পরিচয়ও পাই উল্লিখিত পঙ্‌ক্তি থেকে। লক্ষণীয় দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত যে কুচিয়ামোড় গ্রামে কবির জন্ম তা বর্তমান পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত। এ সম্পর্কে শ্রীআশুতোষ দাস মূলগ্রন্থের ভূমিকা অংশে বলেছেন --- ''উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিশেষতঃ পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহের পল্লীঅঞ্চলে ঘুরিয়া প্রাপ্ত সংবাদে জানিয়াছি যে জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যই এতদঞ্চলে বিশেষ পরিচিত। কেবলমাত্র মালদহ সদর মহকুমার কালিয়াচক থানা এবং হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অঞ্চল বিশেষে তন্ত্রবিভূতির পুথি এখনও প্রচলিত। তন্ত্রবিভূতি লোপ পাইতে চলিয়াছে। জগজ্জীবনেরও প্রায় সেই দশা। এমন সময় এই সুবিরল গ্রন্থ সম্পাদনার জন্য আমার ডাক পড়িয়াছে--- আমার বড়ই সৌভাগ্য। আমি গ্রন্থে বর্ণিত কবির বসতগ্রাম কুচিয়ামোড়ার খোঁজ করিয়া কবির বংশতালিকা সংগ্রহ করার সোৎসুক প্রয়াস লইয়া দেড় বৎসর পূর্বে কুচিয়ামোড় যাই। স্থানটি পূর্ণিয়া জেলার বারসুই থানার অধীন। পূর্বে ইহা দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বতন্ত্র বিহার প্রদেশ গঠনকালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ফলে ইহা নাকি দিনাজপুরের অঙ্কচ্যুত হইয়াছে।।''[২৯]

কালজ্ঞাপক কোনো পঙক্তি কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় না। তবে মহারাজা প্রাণনারায়ণের উল্লেখ তিনি কাব্য মধ্যে করেছেন। তাই সেদিক থেকে বিচার করেই কবির কাব্যের রচনাকাল নির্ণয় করার চেষ্টা করা হবে। আমরা জানি মহারাজা প্রাণনাথ ১৬৮৭ খ্রি. সিংহাসনে আসীন হন। পরবর্তীকালে ১৭৫২ খ্রি. তার পুত্র জমিদারী পান। এখান থেকে স্পষ্ট জগজ্জীবন ঘোষাল উক্ত সময়ের মধ্যে কাব্য রচনা করেছেন। এছাড়াও সুরেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য যে খণ্ডিত পুথি সংগ্রহ করেছেন, তার শুরুতে কবি জগজ্জীবন ঘোষাল ক্ষেমানন্দ ও কেতকাদাসের নাম উল্লেখ করেছেন। সেদিক থেকে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের পরে জগজ্জীবনের কাব্য রচিত হয়েছে বলে মনে করা

যেতে পারে।

কাব্যের সৃষ্টিতত্ত্ব অংশে শিবের জন্ম প্রসঙ্গ ঃ

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল কাব্য দুটি খণ্ডে বিভক্ত --- দেবখণ্ড ও বানিয়াখণ্ড। বানিয়াখণ্ডে চাঁদসদাগর ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী এবং দেবখণ্ডে বিভিন্ন দেব-দেবী প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এখানে এই দেবখণ্ড অবলম্বনেই শিব চরিত্রকে দেখানোর চেষ্টা করা যেতে পারে।

দেবখণ্ডের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শূন্য, চারিদিক জলময়। এই শূন্য, নিঃসীম, নিরাবয়ব প্রকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলেছেন -

''জলময় সংসার সকল জলময়।
সজড় অজড় নাই সংসার প্রলয়।।
স্বর্গ মর্ত্ত্য নাহি ছিল অষ্ট লোকপতি।
যদুপতি প্রলয় নাহি পুরুষ প্রকৃতি।'' পৃ-৩

এই নিরাবয়ব শূন্যতা তথা জল মধ্য থেকেই অনাদি ঈশ্বরের জন্ম। কবি এই অনাদি ঈশ্বরের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলেছেন —

''অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ বটপত্রের উপর।
জলমধ্যে ভাসে দেব অনাদি ঈশ্বর।'' পৃ-৩

লক্ষণীয় এই অনাদি ঈশ্বরই হলেন নিরঞ্জন, যিনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। নিরঞ্জন অর্থাৎ অনাদি ঈশ্বর তাঁর চার ভাইকে জগৎ সৃষ্টি করতে বলায় তারা কোনো উপায় খুঁজে পান না। পরে উপায়ান্তর না দেখে সেই জলের উপর ধর্ম নামে এক পুরুষের আবির্ভাব হয়। এই সময় ধর্ম জল স্থল সৃষ্টি করার জন্য নানা উপায় খুঁজতে শুরু করেন। অনাদি ঈশ্বরের ইচ্ছায় চারি ভ্রাতা ধর্মের জন্ম রহস্য জানতে চান। এতে ধর্ম গুরুর কৃতিত্বের কথা স্বীকার না করে নিজের কৃতিত্বের কথাই ঘোষণা করেন। এতে মিথ্যা কথা বলার অপরাধে অনাদি ঈশ্বর সহ চার ভাই তাকে অভিশাপ দেন। শুধু তাই নয়, এই অভিশাপের পর তাকে সৃষ্টি পত্তন করারও উপদেশ দেন। আর এই উপদেশহেতু ধর্ম স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল, দেব, নর, সূর্য, চন্দ্র, পশু, পাখি প্রভৃতি সৃষ্টি করেন এবং পৃথিবী পালনের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সৃষ্টি করেন।

''ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ সৃজিল তিনজন।
তিন পুরুষে করিবে পৃথিবী পালন।'' পৃ-৬

উত্তরবঙ্গের লোকায়ত সমাজেও আমরা এই একই ধরনের মিথের পরিচয় পাই। সেখান

থেকে জানা যায় যে এ পৃথিবী সৃষ্টির আগে তা জলময় ছিল। সেই সময় ভগবান সেই জলের উপর একা ভেসে বেড়াচ্ছিলেন। তখন ভগবান ভেবেছেন যে এইভাবে একা থাকা সম্ভব নয়, সেখানে মানুষ সৃষ্টি করতে হবে। এইভাবে ভাবতে ভাবতে একদিন তার শরীর থেকে একফোঁটা ঘাম নির্গত হয়। সেই ঘাম থেকেই আদ্যাশক্তির জন্ম হয়। এরপর আদ্যাশক্তি ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন এবং সে নিজেই একদিন ভগবানকে বলেন যে 'বাবা আমি আর থাকতে পারছি না, আমার যৌবনকাল কিছুতেই অতিক্রম হয় না।' তখন ভগবান তাকে আশীর্বাদ দেন এবং সে গর্ভবতী হন। সেই আদ্যাশক্তির গর্ভ থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের জন্ম হয়। আবার কিছুদিন পর ভগবানকে আদ্যাশক্তি একই প্রশ্ন করেন যে সে আর থাকতে পারছেন না। তখন ভগবান তাকে বার বার আশীর্বাদ না দিয়ে এই তিন জনের মধ্যে একজনকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে বলেন। তখন আদ্যাশক্তি প্রথমে ব্রহ্মার নিকট যান এবং সমস্ত ঘটনা ব্রহ্মাকে বলেন, উত্তরে ব্রহ্মা তাকে মা বলে সম্বোধন করেন এবং একদিকে পালিয়ে চলে যান। যেদিকে ব্রহ্মা পালিয়ে যান সে দিকে সঙ্গে সঙ্গে সমতল হয়ে যায়। এবার আদ্যা ব্রহ্মাকে না পেয়ে বিষ্ণুর কাছে চলে যান , বিষ্ণুও ব্রহ্মার মতো আর একদিকে পালিয়ে যান এবং তার পালিয়ে যাবার পথও সমতলে পরিণত হয়। এবার আদ্যা আর কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে শিবের কাছে যান এবং দৃঢ় সংকল্প করেন যে সে কিছুতেই তাকে ছাড়বেন না। কিন্তু মহেশ্বরও যখন পালাতে যাচ্ছিলেন তখন আদ্যা তাকে ধরে ফেলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মহেশ্বরও পালাতে গিয়ে যতদূর গেছে ততদূরও সমতলে পরিনত হয়েছে। একারণেই পৃথিবী তিনকোণা। তখন মহেশ্বরও কোনো উপায় না দেখে তাকে মা বলে সম্বোধন করেন। কেননা মা'য়ের সঙ্গে কখনোই সৃষ্টকার্যে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কিন্তু আদ্যাও এক্ষেত্রে নাছোড়বান্দা, সেও কিছুতেই মহেশ্বরকে ছাড়বেন না। তখন মহেশ্বর আদ্যাকে বলেন যে এইরূপে তাকে সে গ্রহণ করতে পারবেন না। তাই তাকে ১০৮ বার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। এই ১০৮ বার জন্ম গ্রহণ করলে তবেই শিব তাকে গ্রহণ করবেন। শিবের কথা মতো আদ্যাশক্তি ১০৮ বার জন্ম গ্রহণ করেন এবং পার্বতী রূপ লাভ করেন। পরে শিব তাকে বিবাহ করে সৃষ্টি কার্যে লিপ্ত হন। এখান থেকেই এই জগৎ এবং মানুষের সৃষ্টি।[৩০]

অন্যদিকে কাব্য মধ্য থেকে জানা যায় যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করার জন্য তপস্যায় আসীন হন। তপস্যায় অনেকদিন গত হয়ে গেলে ধর্ম পুত্রশোকে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর এই দীর্ঘনিঃশ্বাস থেকেই নপুংসক হয়ে মনসার জন্ম হয় —

''নিঃশ্বাসত নিঃস্বরিল মনসার জন্ম হৈল
বসিলা উঠিয়া বাম পাশে।'' পৃ-৮

নপুংসক মনসাকে ধর্ম নারী রূপ দেন এবং পরবর্তীকালে ধর্ম মনসার রূপে মুগ্ধ হয়ে আলিঙ্গন কামনা করলে মনসা তাতে বারণ করেন —

''মনসা বলেন ধর্ম না করহ এমন কর্ম্ম
করিবে সে লোকে উপহাস।'' পৃ-৮

— এরপরেও ধর্ম আলিঙ্গন কামনা করেন মনসার কাছে। তখন মনসা সৃষ্টিনাশ ভয় এবং নরক ভয় দেখিয়ে তাকে আলিঙ্গন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য আহ্বান জানান। পরে ধর্ম বিবাহ করার জন্য পুত্রদের কাছ থেকে উপদেশ নিতে যান। পিতার হঠাৎ আগমনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বিস্মিত হয়ে যান। তখন ধর্ম তার আসল উদ্দেশ্য তিন পুত্রের কাছে প্রকাশ করেন।

''তিন ভাই বলে বাপু কেনে আইলি এথা
ধর্ম্ম বলে আছে এক বিবরণ কথা।।
কহ এক কথা তিন পুত্র মোর কাছে।
উপার্জ্জিয়া খাল্যে ফল দোষ কিবা আছে।।
বাপের বচনে কথা কহে তিন ভাই।
উপাজ্জিয়া খাইলে ফল দোষ কিছু নাই।।
গোসাঞি বোলে তিন পুত্র শুন মোর বাণী।
ভগ্নি এক সৃজিল তোমার মনসা কামিনী।।
তার রূপ দেখি মোর স্থির নাই মন।
বিভা করাইয়া দেহ পুত্র তিন জন।।'' পৃ-৯

এসব কথা শোনার পর পুত্রগণ সম্মতি প্রকাশ করেন এবং বেদমন্ত্র উচ্চারণে ধর্ম-মনসার বিবাহ কার্য সমাপ্ত করেন। কাহিনীধারা থেকে জানা যায় বিবাহের রাতে স্ত্রী সম্ভোগের পর ধর্ম মনসাকে ত্যাগ করে পালিয়ে যান। এবং পূর্বে উল্লিখিত গুরু নিন্দা জনিত অভিশাপে তার গলিত, পচা শব জলমধ্যে ভাসতে থাকে। এভাবে সেই মৃত শব প্রথমে ব্রহ্মার নিকট এলে ব্রহ্মা তাকে চিনতে না পেরে ধ্যানমগ্ন হন। পুনরায় সেই মৃতদেহ ভাসতে ভাসতে বিষ্ণুর নিকট গেলে বিষ্ণুও চিনতে না পারলে তা শেষে শিবের নিকট যায়। শিবের নিকট এলে শিব ধ্যানে পিতাকে চিনতে পেয়ে ক্রন্দনরত হন। এমতাবস্থায় শিবের ক্রন্দনে ধর্মের চেতন হয় এবং ধর্ম শিবকে দুঃখ কষ্ট করতে বারণ করেন, কেননা ধর্মই মৃত্যুর পর শিবের অঙ্গে স্থান পাবেন।

''এক কথা কহি না করিহ উপহাস।
মুখ মেল সত্ত্বরে উদরে দেহ বাস।।

মহেশ্বর বোলে বাপু ইহা নাকি হয়।
ধর্ম্ম বোলে শুন বাপু মিথ্যা কথা নয়।।
তুমি আমি অর্দ্ধ অঙ্গ হইব শূলপাণি।
মনসা কামিনী হবে তোমার ঘরণী।'' পৃ-১২,১৩

অর্থাৎ ধর্মের কথা মতো শিব মনসাকে বিবাহ করবেন। এরপর ধর্মের মৃত্যু হলে তিন ভাই পিতার সৎকার্য সম্পাদন করেন —

''আগর চন্দন খড়ি চাপায় অনেক করি
অনল ভেজায় তিন ভায়।
মন্ত্র পড়ে ব্রহ্মা হর অগ্নি দিলা মহেশ্বর
পুড়িয়া হইল ছাই।'' পৃ- ১৩,১৪

এদিকে মনসা প্রভাতে উঠে স্বামীকে দেখতে না পেয়ে ক্রন্দনরতা হন। স্বামী তাকে কেন ত্যাগ করল তার কারণ তিনি খুঁজে না পেয়ে পুত্র দর্শনে যান। প্রথমে ব্রহ্মার কাছে আসেন এবং ব্রহ্মা ধর্মের মৃত্যুর কথা মনসার কাছে স্বীকার করতে না পেয়ে মিথ্যা কথা বলেন। পরে বিষ্ণুর কাছে গেলে বিষ্ণুও একইভাবে ব্রহ্মার মতো তা অস্বীকার করেন। সবশেষে মনসা শিবের কাছে এলে সেখান থেকেই ধর্মের মৃত্যুর খবর পান। তখন মনসা স্বামী শোক সহ্য করতে না পেয়ে ধর্মের সহমৃতা হতে চান এবং শিবকে চিতা শয্যা নির্মাণ করতে বলেন। শিব মনসার কথা মতো চিতা শয্যা নির্মাণ করেন এবং স্নানান্তে ধর্মের স্তুতি করে মনসা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর রচিত চিতায় পুড়ে আত্মবিসর্জন দেন। পরে এই চিতা থেকেই এক শিশুকন্যার উদ্ভব হয়। চিতার মধ্যেই শিশুটি 'উহু চুঁহা' করে কেঁদে ওঠে। ফলে সেই শিশুকন্যাটি নিয়ে তিন ভাই কি করবেন, তা নিয়ে তাঁরা বড় দুশ্চিন্তায় পড়েন। এবং শেষ পর্যন্ত যুক্তিসম্মতভাবে একটি লোহার মঞ্জুসে করে সেই শিশু কন্যাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

''ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আপনে গাঅ তোলে।
নির্ম্মাণ করিল চিতা মনসার বোলে।।
নির্ম্মাণ করিল চিতা সাগরের ঘাটে।
বান্ধিলেক মঞ্চখান চন্দনের কাষ্ঠে।।
স্নান করি মনসা সুন্দরী মহা সতী।
জোড় হস্ত করিয়া ধর্মকে দেয় স্তুতি।।
চিতা প্রদক্ষিণ দেবী করে সাত বার।

চিতাত শুতিলা মনে ভাবিয়া আমার।।
চারিদিগে তিন ভাই ভেজায় আগুনি।
আনলে পুড়িয়া মরে মনসা কামিনী।।
আনলের মধ্যে হইল শিশু কন্যাখানি।
জনম হইল কন্যার শিবের গৃহিনী।।
উহাঁ চুহাঁ করিয়া মনসা কাঢ়ে রায়।
আনলের মধ্যে হইল তিনদিনের ছায়।।
মহেশ্বর বোলে ভাই করি কোন কর্ম্ম।
আনলের মধ্যে মনসা পাইল জন্ম।।
ব্রহ্মাদেবে বোলে যুক্তি শুন দুই ভাই।
লোহার মঞ্জুসি করি সাগরে ভাসাই।।'' পৃ-১৫,১৬

অন্যদিকে সন্তানহীন হেমন্ত ঋষি সন্তান কামনায় সাগরতীরে বসে তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। তপস্যা ভাঙ্গলে তিনি সাগর জলে একটি কন্যা সন্তান ভেসে যেতে দেখেন। ঋষি ভাসমান সেই মঞ্জুসটিকে তপস্যার ফল বলে মনে করে গৃহে নিয়ে এসে স্ত্রী মেনকার হাতে দেন। ঋষিপত্নী মেনকা শিশুকন্যা পেয়ে খুবই আনন্দিত হন। তখন ঋষির কথা মতো কপট গর্ভবতীর বেশ ধারণ করে হাটে হাটে লোকজনের সঙ্গে আলাপ করে নাড়ু, আমলকি কিনে বাড়ি ফিরে আসেন। এরকম করার কারণ লোকজনদের কাছে মেনকা প্রমাণ করতে চান যে সে সন্তানসম্ভবা। এভাবেই গৌরী হেমন্ত-মেনকা গৃহে বড় হতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই সৃষ্টিতত্ত্বের সঙ্গে নির্মলেন্দু ভৌমিক তাঁর 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত' গ্রন্থের সৃষ্টিপত্তন অংশের গানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

''নাহি জলো, নাহি স্থলো, নাহি তো আকাশ।।
এ ছিরিমণ্ডপে নাই ছিরি কবিলাস।।
ধান-দূবা নাহি ছিল, লক্ষ্মী সরস্বতী।
ঘরেরো গহণী নাই, গঙ্গা ভাগ্যবতী।।
চাইরো পুখে চাইর পববত, মইধ্যে গোঙ্গার ঘর।
বাইর হইল গোঙ্গামাতা হয়া ছত্রেকধর।।
আগে আগে যায় ভগীরথ শঙ্খধ্বনি দিয়া।
পাছে পাছে যায় গোঙ্গা নিবারণ করিয়া।।
.....

বিক্ষের তলে নিচা
আছে তো পড়িয়া ;
কমরত পাও দিয়া মাটি
নিলে তো কাড়িয়া।।
সেইকিনা মাটি নিলেক
ডাকাতি করিয়া;
ধর্মের আগোতে মাটি
দিলে তো মিলিয়া।।
পোঁটলা হারেয়া নিচা
কান্দে থোপাথোপা।।
কান্দিতে কান্দিতে নিচা
করিলে গমন,--
ধর্মের আগতে যায়া
দিলে দরশন।।
অইন্যের কাজে গেলে প্রভু
পান-ফুলো পাই।
তোমার কাজে গেলে প্রভু
জীবনো হারাই।।
ধর্ম বোলে,
নিচা, তুমি না কর ক্রন্দন।
আশুরবাদ করি--
মরিলে পাতালে তুমি
করিবে গমন।
আর মাছ মরিলে, উঠিবে ভাসিয়া,--
তোর বংশধর মরিলে
যাবে পাতালক নাগিয়া।।
সেইকিনা মাটি গোঁসাই
নাড়িবা নাগিল,--

নাড়িতে নাড়িতে গোঁসাই
নওগুলি পাকাইল।
সেই কিনা গুলি গোঁসাই
নও দিকে ফিকিল।
নও দিকে নও সংসার
ছিষ্টি যে হইলো।।''[৩১]

শিবের মালঞ্চ নির্মাণ ও গান্ধর্ব বিবাহ ঃ

অন্যদিকে শিবের 'মদন-অনল জ্বলে কাঁপে কলেবর।' এমতাবস্থায় শিব কি করে গৌরীর দেখা পাবেন সে নিয়ে নারদের কাছে পরামর্শ চান। উত্তরে নারদ শিবকে মালঞ্চ নির্মাণ করতে বলেন। যে মালঞ্চের মধ্যে গৌরী ফুল তুলতে আসবেন এবং সেখানেই শিবের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। এমত কথা শুনে শিব মালঞ্চ নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে যান —

''ব্যালিস ফুলের বিচি আনহ ত্রিলোচন।
হাল বাহিয়া কর মালঞ্চ সৃজন।।
মালঞ্চ দেখিতে আসিবে ত্রিনয়ানী।
তথাতে হইবে দেখা শুন শূলপাণি।।
নারদের বচন শুনিয়া ত্রিলোচন।
বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া আনিল ততক্ষণ।।'' পৃ-২০

এরপর আমরা কৃষক শিবের পরিচয় পাই। সেখানে তিনি কৃষকরূপে জমি চাষ করেন---

''হাল বাহে শিব কৌতুক বড় রঙ্গে।
বৃষহ জুড়িল হর খায় পান রঙ্গে।।
লাঙ্গল জুড়িয়া এক চাষ দিল আগে।
প্রথম দিনের চাষ হাল নাহি লাগে।।
আর বার দিল দেব দুই তিন চাষ।
চার চাষে ভুমিখানের উপারিল ঘাস।।'' পৃ-২২

এভাবেই বারো চাষ সম্পূর্ণ করে শিব মালঞ্চ নির্মাণের জন্য জমি তৈরি করেন এবং বিশ্বকর্মার সহযোগিতায় বিন্ধ্যাগিরি প্রদত্তস্থানে সুন্দর এক মালঞ্চ নির্মাণ করেন। কিন্তু মালঞ্চ নির্মাণ হবার পরেও শিব পার্বতীর দেখা পান না। কাতরপ্রাণা শিব নারদের কাছে অনুনয় বিনয় করতে থাকেন--- কি করে পার্বতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। এই চিত্রের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কাতিপূজার গানের মিল

খুঁজে পাওয়া যায়। এই গানেও দেখি শিব বিবাহের জন্য কাতর হয়ে গেছেন। কোথাও কোনো নারীর খোঁজ পাচ্ছেন না। তাই শিব তাঁর ভাগ্নে নারদকে ডেকে মেয়ে খোঁজার কথা বলেন--

''শুন শুন নারদ ভাগিনা না থাক নিশ্চিন্তে বসিয়া।
শিগগির করি চলিয়া যাও হেমন্ত ঋষির বাড়ি।।''[৩২]

শিব জানে যে সেখানেই তার জন্য হেমন্ত ঋষির কন্যা গৌরী অপেক্ষা করে আছেন। উত্তরের লোকায়ত সমাজে শিবের এই চিত্রের সঙ্গে জগজ্জীবন ঘোষালের শিব চরিত্র যেন একাকার হয়ে গেছে। কাব্য মধ্যে দেখি শিবের এমতাবস্থায় নারদের পরামর্শে শিব ইন্দ্রসহ বাকি দেবতাদের মালঞ্চে ডাকেন। শিবের ডাকে অবশ্য সমস্ত দেবতারা সাড়া দেন। তখন শিব তার মালঞ্চে মালিনী পাবার আশায় কোনো দেবকন্যার আশা করেন। কিন্তু এতে কোনো দেবতাই রাজি হন না। তাই শিব নিরাশ হলে পুনরায় নারদ শিবকে ধর্মখড়ি পাতার নির্দেশ দেন। সেখানে যার নাম উঠবে তার কন্যাই শিবের মালঞ্চের মালিনী হবেন। এতে ঋষি হেমন্তের নাম উঠে আসে। তাই পূর্ব কথা মতো হেমন্তের কন্যা গৌরীকে মালিনী হতে হয়। কিন্তু গৌরীর কম বয়স জনিত কারণে হেমন্ত ঋষি আপত্তি প্রকাশ করেন।

''ঋষি বোলে আছে মোর শিশু কন্যা খানি।
কেমতে হইবে তোমার ফুলের মালিনী।'' পৃ-২৫

কিন্তু পার্বতী নিজে রাজি হলে হেমন্ত ঋষি বাধ্য হয়ে পাঠিয়ে দেন শিবের মালঞ্চে ।

এমতকথা শুনে হেমন্ত ঋষি গুরুগম্ভীর হয়ে ঘরে ফিরে এলে মেনকা অত্যন্ত ভীত হয়ে যান। তার মনে হয় কন্যাকে এভাবে মালঞ্চে পাঠানো ঠিক হয়নি। এই চিত্র যেন আমাদের অনেক পরিচিত, যা বাঙালী পরিবারের বলেই মনে হয়।

''ত্রিনয়ানী বোলে বাপ কেনে কর অনুতাপ
মালঞ্চে যাইতে কিবা ভয়।
যাইব মালঞ্চ বন তুষিব শিবের মন
মনে কিছু না ভাবিহ সংশয়।। পৃ-২৭

কন্যা মুখে এমন কথা শুনে ঋষি হেমন্ত খুশী হন। পরে নিজ ইচ্ছায় কন্যাকে সাজিয়ে, কালু ডোমের কাছ থেকে সাজি তৈরি করে এনে, সেই সাজি দিয়ে ঋষি সিংহের পিঠে কন্যাকে মালঞ্চে পাঠান।

পার্বতী মালঞ্চে প্রবেশকালে মালঞ্চের দ্বারী বাঁধা হয়ে দাঁড়ান। এতে পার্বতী নিজ মূর্তি ধারণ করলে রক্ষক ভয় পেয়ে শিবকে খবর দিতে যান। এই সুযোগ নিয়ে পার্বতী মনের আনন্দে

ফুল তোলেন এবং নিজে সেই মালঞ্চের ফুলে সজ্জিত হন। এমন সময় হঠাৎ শিবের কথা মনে হলে সেখানেই বাসক পুষ্পপত্রের মধ্যে আত্মগোপন করেন এবং ঘুমিয়ে যান। অন্যদিকে দ্বারীর কাছ থেকে শিব খবর পেয়ে তার সঙ্গী সাথীদের নিয়ে বৃষপৃষ্ঠে মালঞ্চের দিকে যাত্রা করেন। মালঞ্চে পৌঁছে কাউকে দেখতে না পেয়ে শিব নারদের পরামর্শে ঊনপঞ্চাশ পবনকে স্মরণ করেন। ফলে বাতাসে ফুলের লতাপাতা সব উড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত মালঞ্চের অশোক তলে শিব ঘুমন্ত অবস্থায় পার্বতীকে দেখতে পান। পার্বতীর ঘুম কি করে ভাঙানো যায় এই চিন্তা করে শিব পার্বতীর শরীরে হাত রাখেন। এতে পার্বতী ভয় পেয়ে উঠে যান —

‘‘ গোসাঞি বোলে দুর্গাক কেমনে উঠায়।
চঞ্চলনয়ানী দুর্গা পাছে ভয় পায়।।
ধীর করি দিল হাত হৃদের উপর।
চমৎকার হয়্যা ওঠে প্রাণে পাঞা ডর।।
না ছুয় শঙ্কর দেব ধরহু চরণ।
অবলা না জান মুই সুরতি কেমন।।’’ পৃ-৩৪

শুধু তাই নয়, শিবের এই স্পর্শে তাকে কলঙ্কের বোঝা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে একথাও শিবকে জানিয়ে দেন —

‘‘হাতে হাত না ধরিহ ভাঙ্গিবেক শঙ্খ।
ই তিন ভূবনে মোর রহিবে কলঙ্ক।’’ পৃ-৩৪

একথা শুনে শিব নিজের মাহাত্ম্যের কথা পার্বতীর সামনে ব্যক্ত করেন। শিব দুর্গাকে সাত জন্মের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের কথা জানালে পার্বতী এতে আশ্বস্ত হন। এভাবেই পার্বতীকে প্রবোধ দিতে গিয়ে শিব বলেন —

‘‘গোসাঞি বোলে অভয়া ক্রন্দন ক্ষেমা কর।
সপ্ত জন্মের আমি তোমার প্রাণেশ্বর।।
না চিহ্ন আমাক দুর্গা আমি তুমার স্বামী।
সপ্ত জন্মের কথা কহিয়া দিব আমি।। পৃ-৩৬

— এভাবে শিব পার্বতীর সপ্ত জন্মের কথা বলে দিলে পার্বতী শিবের প্রতি বিশ্বস্ত হন। ফলে শিবের আহ্বানে গৌরীর সখী জয়া-বিজয়া প্রমুখরা বিবাহ সজ্জা রচনা করেন এবং মালঞ্চ মধ্যে হর-গৌরীর গান্ধর্ব বিবাহ দেন এবং এখানেই তাদের মিলন হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে গৌরীর সখী জয়া ও বিজয়া এখনো দেবী দুর্গার সঙ্গে অবস্থান করে আছেন কোচবিহারের সংস্কৃতিতে। কোচবিহারে

আজও শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় বড় দেবীর পাশে এই জয়া বিজয়া পূজিত হন। সেখানে দেবী দুর্গার বাম ও ডান দিকে এই জয়া বিজয়া অবস্থান করে আছেন। লক্ষণীয় এখানে লক্ষ্মী কিংবা সরস্বতীকে আমরা দেখতে পাব না। এই জয়া বিজয়ার পরিচয় উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিতে আর কোথাও সেভাবে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত সখীদের উপস্থিতিতেই হর-গৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

''এই পঞ্চ জনে করে বিবাহের সাজ।
হরগোরীর বিভাহ হৈল মালঞ্চের মাঝ।।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে জয় জয় শব্দ হৈল।
শঙ্কর গৌরীর বিভা মালঞ্চেতে হৈল।।
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
পুষ্পের বিছান করে পুষ্পের মুসুরি।
তার মাঝে শয়ন করে হর আর গৌরী।।
- -
আলিঙ্গন করে দেবী পসারিআ বাহু।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন গ্রাসিলেক রাহু।।'' পৃ-৩৮

এখানে 'পঞ্চজন' বলতে রত্নমালা, জয়া, ঊষা, বিজয়া ও ঊর্বশীর কথা বলা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই স্বর্গের অপ্সরী। এভাবেই মালঞ্চবনে হর-গৌরী বিবাহ ও মিলন সম্পন্ন হয়। এতে দেবীর বাহন সিংহ দীর্ঘক্ষণ ধৈর্য্য ধরে না থাকতে পেয়ে পরে হেমন্ত ঋষির রোষের কারণ হয়ে যান এবং এই কারণেই সিংহ দুর্গাকে মালঞ্চে রেখে গৃহে চলে যায়। এবং গিয়ে হেমন্ত ঋষির কাছে দুর্গার দুষ্ট আচরণ বলে দেন।

শিবের কয়ালির বেশ ধারণ ঃ

মালঞ্চ বনে হর-গৌরীর গান্ধর্ব বিবাহ সম্পন্ন হলে, গৌরীর বাহন সিংহ গৌরীর বিলম্ব সহ্য করতে না পেরে হিমালয়ের কাছে সকল কথাই জানিয়ে দেন। এতে গৌরী শঙ্কিত হন, কারণ সে নিজেকে কলঙ্কিত মনে করেছে। এতে পিতার সন্দেহ দূর করার জন্য তাকে নানা রূপ পরীক্ষা দিতে হবে। কিন্তু সে তো সত্যি কলঙ্কিত, তাই সেসব পরীক্ষায় সে উর্ত্তীণ হতে পারবে না। এসব কথা শুনে শিব তাকে অভয় দেন। প্রথমে তাকে ছল করতে বলেন, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলতে

বলেন।

''গোসাঞি বোলে ভয় মনে না করিহ অবলা।
তুমি কি না জান প্রাণস্ত্রীর ছলা কলা।।
- -
যে কথা কহি দুর্গা মনে করি নিঅ।
বাপমায়ে শুধাইলে এহি কথা কৈঅ।।
প্রথমে তুলিল পুষ্প এ বেল বউল।
তার কাঁটা লাগিয়া আউলাল মাথার চুল।।
মাধাঁই কুচাই বউল কাটার ধার।
তার কাটা লাগিয়া ছিণ্ডিল গলার হার।।
চম্পা নাগেশ্বর পুষ্প ডাল অনেক দূর।
ডাল ভাঙ্গি পড়িলু শঙ্খ হইল চূর।।
ব্যথার ঘায়ে বাপু বসিনু চাপিয়া।
ভাঙ্গা শাড়িখান গেল পাএর ভর পায়া।।
চৈত্র বৈশাখের রৌদ্র গাত্র ঘাম আইল।
মুছিনু শিরের সিন্দুর নয়ানের কাজল।।
সিংহ ছাড়ি গেল সঙ্গে নাহি সাথী।
এই হেতু মালঞ্চবনে রহিনু বাসি রাতি।।'' পৃ-৩৯,৪০

এই চিত্র যেন আমাদের অতি পরিচিত দৃশ্য। আজকের দিনেও যেসব পুরুষ বা নারী অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে লিপ্ত থাকে তারাও কিন্তু নিজ বাড়িতে একই রকম ছলনা করে অবৈধ সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন ।তাই এই কথাগুলি শুনে আমাদের মনে হয় না যে এ কোনো স্বর্গের দেবতার কথা, মর্ত্য পৃথিবীর কামুক পুরুষের সঙ্গে যেন শিবের এখানে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু বর্তমানে তো নিজেকে সতি প্রমাণ করার জন্য কোনো পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই, কিন্তু সেই যুগে ছিল। তাই গৌরীর ভয়, ছলনা করার পরেও যদি পিতার সন্দেহ দূর না হয়, যদি তার সতীত্বের জন্য অষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করে --- এই ভেবেই সে শঙ্কিত। এসব কথা শুনেও শিব অভয় দান করেন।

''এতেক কথায় যদি না যায় প্রত্যয়।
যে পরীক্ষা চাহে দিঅ তাহার গোচর।।
পরীক্ষাত স্মরণ যে করিহ আমারে।

হইবে সর্বত্র জয় কহিলাঙ তোমারে।।" পৃ-৪০

-এখানে যেন শিব নিজ মূর্তি ধারণ করেছেন। পরীক্ষার সময় দুর্গা যদি শিব নাম নেন, তবে সে যে কোনো পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হবেন। এই কথা ভেবেই দুর্গা বাড়িতে ফিরে আসেন। অন্যদিকে শিব-দুর্গার এই অবৈধ সম্পর্কের কথা গঙ্গার কানে গেলে গঙ্গা মনে বড়ই দুঃখ পান। কেননা বাঙালী গৃহবধূর মতো গঙ্গাও সতীন কামনা করতে পারেন না। তাই যত তাড়াতাড়ি আপদ বিদায় করা যায় ততই ভালো, একারণেই নদী পারাপারের জন্য গঙ্গা দুই পুত্রকে পাঠান এবং মাঝনদীতে নৌকা ডুবিয়ে দেবার কথা বলেন। কিন্তু ডাকুর ও মহানন্দ দুই ভাই গঙ্গার কথা মতো দুর্গাকে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করলে দুর্গা নিজ মূর্তি ধারণ করেন এবং দুর্গা সেখান থেকে উদ্ধার পেয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

হেমন্ত ঋষি মালঞ্চ প্রত্যাগতা দুর্গার বেশভূষা ও অষ্ট আভরণে সন্দেহ প্রকাশ করে ঘরে যেতে বারণ করেন, এবং বেশভূষার এই পরিস্থিতি হবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এতে দুর্গা শিবের কথা মতো মিথ্যা কথা বলে পিতার সন্দেহ দূর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু হেমন্ত ঋষি কিছুতেই সেসব কথা না শুনে দুর্গার সতীত্ব প্রমাণ করার জন্য অষ্টপরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। গৌরীও এতে শিবের কথা মাথায় রেখে নিঃসংশয় সম্মতি জানান।

" দেবী বোলে এই হয় নাহি কুন সংশয়
আন পরীক্ষার সাজ।
মুই যদি সতী হইমু পরীক্ষাতে উত্তরিমু
যশ হইবে ত্রিভুবণ মাঝ।" পৃ-৪৫

— তাই দুর্গার ইচ্ছায় এবং হেমন্ত ঋষির চেষ্টায় সমস্ত ঋষিবরের সামনে দুর্গা অষ্ট পরীক্ষা দেন। এতে প্রথমে পানিডুবি, পরে সর্পঘট, এবং ক্রমে সাবল, ক্ষুর, সিঁদুর, তুলা, অগ্নি, ঘৃতকাঞ্চন রূপে অষ্ট পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। প্রত্যেকটি পরীক্ষাতে দুর্গা সফল হন। তাই পরীক্ষা শেষে সুলজ্জিত হয়ে ঋষি অষ্টম পরীক্ষার সাজ ঢেলে ফেলে দেন। মনে করেন এই কন্যা শিবের মন্ত্রবল লাভ করেছে বলে খুব সহজে অষ্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাই হেমন্ত ঋষি ঠিক করেন এই কন্যাকে কয়ালির হাতেই সমর্পন করবেন।

"কিনা মন্ত্র শিখিলে বেটি তপস্বীর ঠাই।
পরীক্ষা করিতে মনে ডর ভয় নাই।।
অঙ্গীকার করু এই সভা বিদ্যমান।
রজনী প্রভাতে দিবো কয়ালিকে দান।" পৃ-৪৮

অতঃপর রজনী প্রভাত হলে শিব কয়ালীর ছদ্মবেশে শিঙ্গা, ডমরু বাজিয়ে ভিক্ষা করতে থাকেন। ভিক্ষা করতে গিয়ে শিব হেমন্ত ঋষির বাড়িতে উপস্থিত হন। সেখানে অন্য লোকের দেওয়া কোনো দ্রব্যই শিব গ্রহণ করেননি, এমনকি মেনকার সূবর্ণ থালায় দেওয়া দ্রব্য দেখেও শিব মুখ না ঘুরিয়ে পারেননি। শিব এই সময় বলেন —

''কুমারী বিনে আন আর কেহ দেয় দান
তার দান দেঙ ফিরাইয়া।
তুমার মন্দিরে রানী থাকে কুমারী নন্দিনী
তার হাতে দিয়া পাঠাঅ দান।।'' পৃ -৫০

মায়ের আদেশে দুর্গা কয়ালিকে ভিক্ষে দিতে গেলে শিব প্রসন্নচিত্তে তার ভিক্ষের ঝুলি সামনে ধরেন এবং দুর্গার বক্ষ স্পর্শ করেন। এতে দুর্গার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। কিন্তু এই দৃশ্য পাড়া পড়শিরা দেখতেই সকলে কয়ালীর সঙ্গে দুর্গার সম্পর্ক কল্পনা করতে থাকেন।

''দুই হাতে তুলিয়া দুর্গা দান দিল তাত।
কাপড়ের সড়কে হৃদয়ে দিল হাত।।
অন্তরে হইল দুর্গার মনে মনে হাসি।
দেখিল ঋষির পুরীর পাশপড়োসি।।
পাশপড়োসি লোকে করে ঠারাঠারি।
হেমন্ত ঋষির ঝি কয়ালী ভাতারি।।'' পৃ-৫০

প্রতিবেশিদের মুখে এমন কথা শুনে হেমন্ত ঋষি ক্রোধান্বিত হয়ে কয়ালীকে কাঠের ঘরে বন্দী করে রাখেন। এতেও হেমন্তের মধ্য দিয়ে একজন আদর্শ পিতার চিত্রই ফুটে ওঠে। কিন্তু এতো কয়ালী নয়, কয়ালীর বেশধারী শিব। অর্থাৎ এখানে দেবতা মানবে দ্বন্দ্ব, যেখানে দেবতার জয় স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

কয়ালিকে কাঠের ঘরে বন্দি করে হেমন্ত ঋষি পূজার ঘরে যান পূজা করার জন্য। এতে ঋষি দেবতাদের উদ্দেশ্যে যত ফুল অর্পণ করেন সবই কয়ালীর চরণ তলে আসে। এ দৃশ্য হেমন্ত ঋষির মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে —

'' হেমন্ত যতেক ফুলে পূজিল সাগর কূলে
সুগন্ধি চন্দন কুতূহলে।
দেখিয়া পাইল ধন্দ সে সব হইল বন্দ
দেখিল কয়ালির পদতলে।।'' পৃ-৫১

এই দৃশ্য দেখে কয়ালীরূপী শিবকে তার গৃহে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। এতে শিব হেমন্ত ঋষির যুবতী কন্যাকে বিয়ের কথা বলেন -

‘‘ গোসাঞি বোলে ঋষিবর প্রাণে না করিহ ডর
অকুমারী কন্যা আছে তোর
বিরবণ কহিনু তোকে তাকে বিভা দেহ মোকে
সেজনা ঘরের গৃহিনী আমার।’’ পৃ-৫১

শিবের এমন বাক্যে ঋষি সন্তুষ্ট হন এবং বলেন —

‘‘কন্যার ভাগ্যের ফলে তুমি হেন বর হৈলে
অবশ্য করিব কন্যাদানি।’’ পৃ-৫২

এভাবেই শিব কয়ালীর বেশ ধরে হেমন্ত ঋষির ঘরে দুর্গার সঙ্গে তার বিবাহের কথা উত্থাপন করেন এবং ঋষির মুখ থেকে সদুত্তর নিয়ে তবেই কৈলাসে ফিরে আসেন। লক্ষণীয় এর পরের ঘটনা প্রায় প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যের ন্যায় গতানুগতিক। সেই হর-গৌরীর বিবাহ, গঙ্গা-গৌরীর কোন্দল, শিবের পুষ্পবনে যাত্রা, শিবের জলক্রিরা, মনসা বিষহরির জন্ম ইত্যাদি।

শিবের বিবাহ ঃ

হেমন্ত ঋষির নিকট শিব বিবাহের সম্মতি পেয়ে নারদকে বিবাহের আয়োজন করতে বলেন। নারদের পরামর্শে শিব গৌরীর অধিবাসের জিনিস পাঠিয়ে দেন। যে সমস্ত জিনিস শিব পাঠায় সেগুলি হল —

‘‘লাড়ু লবণ চিনি দধি কদলীর ভার।
শঙ্খ সিন্দুর লাগে সুবর্ণ অলঙ্কার।।
অধিবাসের সাজ লাগে নানা উপহার।
শঙ্খ বস্ত্র লাগে আনিব ব্যবহার।।’’ পৃ-৫৩

শুধু অধিবাসের জিনিস পাঠিয়ে দিয়েই শিব বসে থাকলেন না, নারদকে আরও বলেন যে গন্ধ অধিবাসের সামগ্রী নিয়ে নারদ যেদিন যাবেন তার পরদিন শিব বিবাহ যাত্রায় বের হবেন।

লক্ষণীয় মাঝপথে অধিবাসের সমস্ত জিনিস নারদ ভোগ করে শূন্য ভাড় হেমন্ত ঋষির ঘরে নিয়ে যান। একথা গৌরী জানতে পারলে শিবের সম্মানহানী হবে বলে দুর্গা সেই শূন্য ভাড় পুনরায় পূরণ করেন। এরপরই অধিবাসের সূচনা হয়। উঠোনে আলপনা, ফুল, ধান, দুর্ব্বা, দিয়ে মুনিগণ মন্ত্র পড়ে শিবের অধিবাসের আয়োজন করেন। ব্রহ্মা ক্ষীর, শঙ্খ, সিন্দুর হাতে বেদমন্ত্র

উচ্চারণের মাধ্যমে বিবাহাচার সম্পন্ন করেন।

''অধিবাস করায় মুনি প্রাঙ্গণে দিয়া আলিপনি
নানা পুষ্প আনিল সুবাস।।
ঘট কৈল স্থাপনে মন্ত্র পড়ে মুনিগণে
গন্ধ ছোয়ায় মন্ত্র করি ঘটা।
* * *
অসুর অমর নর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর
শিবের হইল অধিবাস।।'' পৃ-৫৮,৫৯

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বিয়ের গানেও আমরা এই অধিবাস পর্ব দেখতে পাই। বিয়ের অধিবাসের সময় নানান রীতি-নীতি, লোকাচার এইসব গানের মধ্য দিয়ে উঠে আসে।

''আজি বাতাস থামাম,
চাইলন সাজাম,
আজি বাবার অধিবাস করাম।
বৈরাতী ডাকেয়া হলদা বাটিম,
আজি বাবার অধিবাস করাম।।
উপার খুন্তি দিয়া ঘাট না খুঁড়িম,
চৌপাখে বসেয়া দিম কড়ি।
মাকেলা বাঁশের পাতা দিয়া
ঘাটো না সাজাম।
চন্দন খুটার ফেলেয়া দিম পিঁড়ি।
নাউয়া ডাকেয়া, কামান করেয়া,
আজি বাবার অধিবাস করাম।
হলদা মাখেয়া সিনান করাম--
কোমরে পড়েয়া দিম দশ হাতিয়া ধূতি।।
নন্দন কাজল দিয়া বাবাক সাজাম
মাথাত বাঁধিয়া দিম শাশুকের পাগুড়ি
তুলসী তলাত বাবাক বসেয়া মাও দিবে আশুব্বাদ।''[৩৩]

এই গানটির মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বিয়ের অনেক লোকাচার ফুটে ওঠে। যা

জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যে শিবের বিবাহ অংশেও লক্ষ্য করা যায়।

কাব্যের মধ্যে দেখি শিব দুর্গাকে বিবাহ করবে এমন কথা শুনে গঙ্গা অভিমান করেন এবং শিবের সঙ্গে উক্তি- প্রত্যুক্তির পর বাধ্য হয়ে শিবকে বিবাহ সভায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এতে শিব বিবাহ সজ্জায় সজ্জিত হন। শিবের এই বিবাহ সজ্জা দেখেও তাকে স্বর্গের দেবতা বলে মনে হয় না। সর্প অলঙ্কৃত ভস্মভূষণ, ব্যাঘ্রচর্ম তার বসন, জটাধারী কেশ, সেখানে সাপের ফণা, কণ্ঠে হাড়ের মালা, বাম স্কন্ধে শিঙ্গা ডমরু, হাতে রুদ্রাক্ষমালা ও ঝুলিসাজে সজ্জিত হয়ে শিব বিবাহ যাত্রা করেন। সঙ্গে নানা বাদ্যসহ দেবতা, তাপস, ভুতপ্রেত সকলে বর যাত্রায় সঙ্গ নিলেন। এছাড়াও সঙ্গ নিলেন লক্ষ্মী, সরস্বতী ও শচী। কবির ভাষায় —

''বিবাহে চলিল হর হেমন্ত ঋষির ঘর
পঞ্চশব্দী বাদ্য বাজে।
অসুর অমর নর গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর
ঋষি তপসি মুনি সাজে।।
ইন্দ্র সুরপতি সাজে চঢ়ি মত্ত গজরাজে
গরুড় পৃষ্ঠেত নারায়ণ।
হংসবাহনরথে বেদ পুথি লঞা হাতে
সাজে ব্রহ্মা সাক্ষাতে ব্রাহ্মণ।।
ভূত পিচাশ যক্ষ কত সাজে লক্ষ লক্ষ
আর সাজে কত প্রেতভূত।
শিবের আমাত্যগণ সবে আনন্দিত মন
সাজিলেন অযুতে অযুত।।'' পৃ-৫৯

এভাবে শিব যখন হেমন্ত ঋষির গৃহে উপস্থিত হন। তখন বিবাহের আচার পালনের জন্য মেনকা এয়ো নারীদের নিয়ে জামাই বরণ করতে আসেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী বিয়ের গানেও এই জামাই বরন করার চিত্র ফুটে ওঠে। সেখানেও আমরা আলেচ্য কাব্যের মতোই এয়ো নারীদের দেখি উলুধ্বনি দিতে---

''কাখেঁর চাইলোন বাতি
মাটিত থুয়্যা
নয়্যা বরক বরণ করে
উলুলু করিয়া।''[৩৪]

কিন্তু জামাই এমন সজ্জিত হয়ে আসছেন যা দেখে মেনকা নির্ভয়ে জামাতাকে বরণ করতে পারেন নি। কেননা যখনই মেনকা জামাতার মাথায় ধানদুর্ব্বা দিতে যান ঠিক তখনই শিবের মাথার উপর সর্প ফোঁস করে ওঠে, ফলে মেনকা সহ সকল এয়ো নারীগণ ভয়ে পালাতে থাকেন।

''ধান্য দুর্ব্বা দিতে যায় জামাতার মাথার উপরে।
ফফায়া উঠিল সর্প রাইহো পালায় ডরে।।
ঋষিয়ানী বোলে জামাতা নহে বাদিয়ার পো।
মাথায় আশির্ব্বাদ দিতে সাপে মারে ছো।।
জামাতার যতেক রূপ দেখিতে বড় ধান্ধা।
পরিধান ব্যাঘ্র ছাল সেও সর্পে বান্ধা।।'' পৃ-৬১

শুধু তাই নয়, বরণ করার সময় কোমরে বাঁধা সাপও যখন ফোঁস করে ওঠে তখন শিবের ব্যাঘ্র ছাল খসে যায়, ফলে শিব উলঙ্গ হন। এই দৃশ্য একদিকে যেমন মেনকা সহ্য করতে পারেন নি, ঠিক তেমনি এয়ো নারীদের কাছেও তা হাস্যকর হয়ে যায়। জামাতার এই রূপ পরিদর্শন করে সকল এয়ো রমণীরা কৌতুক প্রকাশ করেন। ফলে মেনকা ভীষণভাবে লজ্জিত হন। মেনকার খেদ যে এত ব্রত পার্বণ করার পরেও গৌরীর অদৃষ্টে এরকম বর ছিল? তাই আক্ষেপ করে মেনকা হেমন্ত ঋষিকে তিরষ্কার করেন। কেননা, জেনে শুনে কোনো মা চাইবে না যে এমন আত্মভোলা পুরুষের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে। স্বামী সংসারে গিয়ে সুখে মেতে থাকুক এটাই প্রত্যেক বাঙালী মায়ের ইচ্ছা। তাতে অর্থ, ধন, দৌলত না থাকুক, শুধু স্বামী ভালো থাকলেই যেন সব কিছু সহ্য করা যায়। কিন্তু শিবের উপর মেনকা ভরসা রাখতে পারেননি। তাইতো ক্ষত বিক্ষত হয়ে মেনকাকে বার বার বলতে শুনি —

''মর মর ঋষি তোর চক্ষে পড়ুক ফুল।
দেখিয়া আনিলে বর উন্মত্ত বাউল।।
বোল গিয়া জামাই ফিরিয়া যাইক ঘরে।
সোনার পুতলী গৌরী না দিবো বুঢ়া বরে।।
তবে যদি ঋষি গৌরীকে দিবে বলে।
হাতে পায়ে বান্ধিয়া ফেলিব গঙ্গা জলে।'' পৃ-৬২

কাত্যায়নি ব্রতকথাতেও মেনকার একইরকমের খেদ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে মেনকাকে তার স্বামীর উদ্দেশ্যে বলতে শুনি —

''কান্দিয়া মেনকা বলে গৌরী করি কোলে।

গৌরীকে লইয়া আমি ঝাপ দিব জলে।।''[৩৫]

এই ধরনের কথা নারদ সহ্য করতে পারেন নি, তাই সে তার মামা শিবকে নিজ মূর্তি ধারন করার জন্য অনুরোধ করেন। ফলে শিব মনোহর বেশ ধারণ করলে মেনকা স্তম্ভিত হয়ে যান।

'' হেন রূপ ধর মামা কামিনীমোহন।
তুমার রূপ দেখি যেন ভুলে ত্রিভুবন।'' পৃ-৬২

এবার শিবের মাথার জটাভার খসে যায়, তৈরি হয় সুন্দর কেশভার, শিবের সকল সর্পভূষণ খসে যায়, মাথার উপর শোভা পায় সুন্দর মুকুট, গলায় গজমতি হার, বাঘছাল সুন্দর সুবেশ পোশাকে পরিণত হয়। শিবের এই রূপ সৌন্দর্য দেখে ঋষি জায়ার মনে বেশ আনন্দের সঞ্চার হয়। শুধু তাই নয় শিবের এই বেশে ত্রিভূবন মোহিত হয়। আর একারণেই হেমন্ত জামাতা শিবকে নতুন করে বরণ করে নেন। গৌরী শিবকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে সম্মুখে বসেন। এবং হেমন্ত ঋষি কন্যাকে শিবের কাছে সম্প্রদান করেন। লক্ষণীয়, ব্রহ্মা বেদমন্ত্র পড়লে শিব সেই বেদমন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিয়ে যজ্ঞ সমাপণ করে পূর্ণাহুতি দেন।

''ঘটের উপরে রাখে শঙ্করের হাত।
পার্ব্বতীর হাত দিয়া ফল দিল তাত।।
তিল কুশ জল ঋষি করিল এক স্থান।
পঞ্চ হর্ত্তকি দিয়া দিল কন্যা দান।।'' পৃ-৬৭

এভাবেই হর-গৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হলে মঙ্গল উলুধ্বনি দ্বারা নব-দম্পতিকে বাসর ঘরে পাঠানো হয়। ব্রহ্মার বেদ মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে শিব-পার্বতীর বিয়ের পর বাসর রাত অতিক্রম হলে পরের দিন গৌরীর পিতৃগৃহ ত্যাগ করার পালা। এই সময় যে কোনো বাঙালী ঘরে বেদনাতুর অবস্থা থাকে, যা এখানেও হয়েছে। মায়ের মন কিছুতেই সায় দেয় না, কিছুতেই কন্যা বিদায় দিতে চায় না, বার বার মেনকা আত্মবিলাপে ভেঙ্গে পড়েছেন। কিন্তু তবুও তো যেতে হবেই। অন্যদিকে শিব কৈলাস যাবার জন্য প্রস্তুত —

''বিদায় দেহ ঋষি আমি যাবোত কৈলাস।'' পৃ-৬৭

কিন্তু ১২ বৎসরের গৌরী শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে কি করবে এ নিয়েই মায়ের মন ভারাক্রান্ত।

''ঋষিয়ানী কান্দে তবে মুষ্টিকা হানি বুকে।
ঝি যাবে স্বামীর বাড়ি কান্দে মনদুঃখে।।
এগার বৎসর দুর্গা বার নাহি পূরে।
দুগ্ধের ছাওয়াল মোর যাবে কত দূরে।।

মনুষ্য করিলাঙ ঝিউ পালিয়া পুষিয়া।
আঁচলের মাণিক মোর কে নিল কাঢ়িয়া।।
খাইতে চাহিলে বাছা আনি দিবে কে।
কে মোকে বোলিবে মাগো খাইতে মোকে দে।'' পৃ-৬৮

মায়ের এই বিলাপ যেন নতুন কোনো দৃশ্য নয়। এ যেন চিরন্তন বাঙালী গৃহের পরিচিত দৃশ্য। কবি এইসব দৃশ্যের মধ্য দিয়ে যেন বাঙালী মায়ের ব্যথা, বেদনা ও করুণ অর্তির কথাই বলেছেন। এরপর আমরা দেখি শিব দুর্গা কৈলাসে চলে আসেন এবং শিবের আরেক পত্নী গঙ্গা তাদের বরণ করে ঘরে তুলে নেন।

কৈলাসে হর-গৌরী ঃ

কৈলাসে চলে আসার পর বরপক্ষ থেকে যেসব বিবাহাচার প্রয়োজন সব সম্পন্ন হলে গৌরী ঘুমিয়ে পড়েন। দুর্গা যখন সম্পূর্ণ রূপে ঘুমিয়ে পড়েন তখন শিব ধীর পদক্ষেপে গঙ্গার ঘরে যান এবং গঙ্গার সঙ্গে অনেক সুখ, দুঃখ ও হাস্য-পরিহাসে রাত্রি গত করেন। এমন সময় হেমন্ত দুহিতা গৌরীর ঘুম ভেঙ্গে গেলে পাশে শিবকে দেখতে না পেয়ে অস্থিরমনা হয়ে যান। তখন গৌরী শিবকে খুঁজতে খুঁজতে গঙ্গার ঘরে দেখতে পান। এতে দুর্গা ক্রোধান্বিত হয়ে শিবকে তিরস্কার করেন —

''দুর্গা বোলে শঙ্কর এমত ছিল মনে।
হেমন্তনন্দিনী বিভা কৈলে কি কারণে।।
জানিলু শঙ্কর তুমার মুখে নাহি লাজ।
বিভা রাত্রিতে তুমি কর মন্দ কাজ।'' পৃ-৭০

গঙ্গার সামনে শিবকে তিরস্কার করায় গঙ্গা তা সহ্য করতে পারেননি। ফলে গঙ্গা এবং দুর্গার মধ্যে কোন্দলের সৃষ্টি হয়। এই কোন্দল আবার শিব চোখের সামনে দেখতে না পেরে রাগ করেই রাত্রিতে পুষ্পবনে যাবার জন্য তৈরি হন।

''শিব বোলে দ্বন্দ্ব তোরা কর দুই জনে।
সাজ নন্দী বৃষ আমি যাবো পুষ্পবনে।'' পৃ-৭০

কিন্তু দুর্গার কাতর আবেদনে শিব আর এই মুহুর্তে পুষ্পবনে যেতে পারেন না। পরে পাশা খেলায় নিশি যাপন করেন।

মনসার জন্ম ঃ

রাত্রি অবসান হলে প্রভাতে মালঞ্চের দ্বারী শিবের সম্মুখে আসেন। দ্বারীর কাছ থেকে বর্তমান মালঞ্চের অবস্থা জানতে পেরে শিব সেখানে যাবার জন্য উদ্যত হন এবং নন্দীকে বৃষ সাজানোর জন্য আদেশ করেন। এতে গঙ্গা এবং দুর্গা উভয়েই শিবের সঙ্গে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কেননা, দুই সতীন এক সঙ্গে থাকলে ঝগড়া লেগেই থাকবে। কিন্তু শিব এতে দু'জনকেই যেতে বারণ করেন। কারণ তাতে শিব দেবসভায় বঞ্চনার স্বীকার হবেন। তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন এই আশা দিয়ে শিব মালঞ্চে যাত্রা করেন।

'' মোর তরে গঙ্গা দুর্গা না করিহ ডর।
পুষ্প লয়া সকালে আসিব আমি ঘর।'' পৃ-৭১

মালঞ্চ বনে যাবার সময় শিব এক দিব্য সরোবর দেখতে পান, যেখানে সুন্দরী রমণীরা স্নানে লিপ্ত। এই দৃশ্য দেখে শিবও স্নান করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। সেই সময় সুন্দরী রমণীদের দেখে দুর্গাকে কল্পনা করে শিবের বীর্যপাত হয়। সেই বীর্য পদ্মপাতায় রাখলে তা পদ্মের নল বেয়ে পাতালে প্রবেশ করে, এবং সেখান থেকেই বিষহরি মনসার জন্ম হয়।

'' শঙ্করের বীর্য্য জুলে কমলের পত্রদলে
জন্মিলেন দেবী বিষহরি
বিন্দু থুইল হর জলের সে উপর
শতদল কমল উপরি।
মৃণালের বিন্দু দিয়া শিবের বীর্য্য যায় ধায়া
যায়া পাইল রসাতল পুরী।।
শঙ্করের বীর্য্য জয় অক্ষয় সে অব্যয়
জন্মিল দেবী বিষহরি।'' পৃ-৭৪

গণেশ ও কার্তিকের জন্ম ঃ

কৈলাস ত্যাগ করে পুষ্পবনে যাবার এক বৎসর অতিক্রম হলেও শিব কৈলাসে না ফেরায় দুর্গা ও গঙ্গা দুঃশ্চিন্তায় থাকেন। তখন শিবকে দেখার জন্য ছদ্মবেশে দুর্গা মালঞ্চ বনে যাবার জন্য গঙ্গার অনুমতি নেন। এতে গঙ্গা অনুমতি দিলে গোয়ালিনীর ছদ্মবেশে দুর্গা শিবের সঙ্গে দেখা করেন। গোয়ালিনীকে দেখে শিব কামোত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং তার সঙ্গে রতি মিলনে লিপ্ত হন।

''আনন্দিত মহাদেব গোয়ালিনীর বোলে।
হাত ধরিয়া গোয়ালিনীকে লৈল কোলে।।
হাস্য পরিহাস্যে শিব পুহাল্য রজনী।
প্রভাতে বিদায় দেহ বোলে গোয়ালিনী।'' পৃ-৭৫

গোয়ালিনীরূপী গৌরীকে শিব চিনতে পারেননি। তাই সে রতি সঙ্গ করে তাতে গোয়ালিনীরূপী দুর্গা সন্তান সম্ভবা হয়ে ওঠেন এবং গৃহে ফিরে গণেশের জন্ম দেন।

''ফিরিয়া চলিলা দেবী আপনার ঘর।
গণেশ জন্মিলা দেবীর গর্ভের ভিতর।'' পৃ-৭৫

একইভাবে শিব মালঞ্চ বনে বারো বৎসর কাটিয়ে দিলেন, তথাপি গৃহে গঙ্গা এবং দুর্গার খোঁজ খবর পর্যন্ত নিলেন না। এতে ব্যথিত হৃদয়ে গৌরী আর একবার 'কুচুনি' ছদ্মবেশে মালঞ্চে যাবার জন্য গঙ্গার কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেন।

''দ্বাদশ বৎসর হৈল আমার গণেশ।
তথাপি শঙ্কর দেব না কৈল উদ্দেশ।
যদি গঙ্গাদিদি তুমার আজ্ঞা পাই।
কুচুনীরূপে আমি শিবস্থানে যাই।'' পৃ-৭৫

গঙ্গা এতেদুর্গাকে ছদ্মবেশে পুনরায় যাবার আজ্ঞা দিলেন এবং প্রমাণস্বরূপ শিবের অঙ্গুরী আনতে বললেন। এভাবে কুচুনীর ছদ্মবেশে দুর্গা মালঞ্চ বনে উপনীত হলে, কুচুনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে শিব আলিঙ্গন প্রার্থনা করেন।

''শঙ্করের আগে দিয়া চলিল কুচুনী।
কুচুনীর রূপে মোহিত শূলপাণি।।
গোসাঞি বোলে কুচুনী বচন মোর ধর।
আলিঙ্গন দান দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।'' পৃ- ৭৬

এতে কুচুনীরূপী দুর্গা শিবের আজ্ঞা ত্যাগ করতে পারেন না। ফলত পুনরায় তাদের মিলন হয়। মিলন শেষে কুচুনীরূপী দুর্গা যখন ফিরে আসেন, সেই সময় কুচুনীরূপী দুর্গা শিবের নিকট অঙ্গুরী প্রার্থনা করেন। এখানেও শিবকে দেবতা বলে মনে হয় না। শিব যে কামুক চরিত্র তার পরিচয় এখান থেকেও স্পষ্ট। কোচবিহারের একটি প্রচলিত মিথ থেকে জানা যায় যে শিব এতদঞ্চলের কোচ রমণীদের প্রতি আসক্ত ছিলেন। কোচরাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তথা কোচবিহারের মহারাজা বিশ্বসিংহের জন্ম প্রসঙ্গই এই মিথকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সেখান থেকেই জানা যায় এই বিশ্বসিংহ

শিবের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন। তাই আলোচ্য কাব্যে শিবের সঙ্গে যে কুচুনি নারীর সম্পর্ক আছে তা অস্বীকার করা যায় না। আবার মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে হীরা কোচের প্রসঙ্গ রয়েছে। দেবী চণ্ডী যখন শিবের অবর্তমানে ধন দিতে যান তখন মাঝপথে চণ্ডীর সাথে নারদের দেখা হয়। সেইসময় তাদের পারস্পরিক কথোপকথনে হীরা কোচের প্রসঙ্গ আসে। লক্ষণীয় এই হীরা কোচের গর্ভেই বিশ্বসিংহের জন্ম হয় বলে জানা যায়। এই ঘটনার সমর্থনে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মন্তব্যকে স্মরণ করা যেতে পারে-- ''বাংলার সর্বত্র প্রচলিত লৌকিক ছড়ায় কোচনী রমণীর প্রতি শিবের আসক্তির বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।''[৩৬]

শিবের কৈলাস প্রত্যাগমন ও মনসার সঙ্গে সাক্ষাত ঃ

এরপর শিব প্রণয় কাতরে কাতরিত হয়ে গৃহ অভিমুখে যাত্রা করেন। যাবার সময় সরোবরতীরে মনসাকে দেখতে পান এবং তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সেখানেও শিব কামোত্তেজিত হন। কিন্তু মনসা এখানে নিজ পরিচয় শিবের নিকট ব্যক্ত করেন। যে পরিচয় থেকে শিব বুঝতে পারেন যে মনসা তারই কন্যা। এই পরিচয় দানের ফলেই শিবের কামমোচন হয়।

''শঙ্করের বচনে পদ্মা কিছু নাহি বোলে।
পদ্মার রূপ দেখিয়া শঙ্কর পৈল ভোলে।।
মদনে পীড়িত শিব হইল বিকল।
চাপিয়া ধরিল হর পদ্মার আঁচল।।
আঁচল ধরিয়া হর পদ্মাক করে কোলে।
পড়িয়া সঙ্কটে বিষহরি বাক্য বোলে।।
পদ্মা বোলে তুমি বাপ জগতপূজিত।
ঝিউকে হরিতে বাপ না হয় উচিত।।'' পৃ-৭৭

এরপর শিবের সম্বিত ফিরে আসে এবং কন্যার পরিচয় পাবার পর শিব কন্যাকে আশীর্বাদ করেন। শিবের এই চিত্রের মধ্য দিয়েও কামোন্মত্ততার দিকটিই প্রকাশ পায়।

দুর্গা-মনসার দ্বন্দ্ব ঃ

শিব-কৈলাসে যাবেন শুনে মনসা ইচ্ছা প্রকাশ করেন পিতার সঙ্গে যাবার জন্য। কিন্তু এতে শিব তাকে বারণ করেন, কেননা এতে গঙ্গা এবং দুর্গা সপত্নী ভেবে আবার ঝগড়ায় মেতে উঠবেন। তাই শিব আগে থেকেই সচেতন।

''গোসাঞি বোলেন শুন বাছা পদ্মাবতী।
তোমা যাইতে না লয় আমার যুকতি।।
তোমা সঙ্গে গেলে হয় বড়ই সংশয়।
গঙ্গা দুর্গা মরিবেক সতীন কহিয়া।।'' পৃ-৭৯

কিন্তু পদ্মা কিছুতেই ছাড়ার পাত্র নন, তাই পদ্মা শেষ পর্যন্ত পিতৃ আজ্ঞায় ফুলের সাজির মধ্যে আত্মগোপন করে কৈলাসে যাত্রা করেন। অন্যদিকে শিবের আগমন বার্তায় গঙ্গা ও দুর্গা আনন্দে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং দু'জনেই প্রণাম করেন। শুধু গঙ্গা কিংবা গৌরী নয়, গৌরীর পুত্র গণেশ কার্ত্তিকও শিবকে প্রণাম করেন। এতে শিব অজ্ঞাত বালকদ্বয়ের পরিচয় জানতে চান। গঙ্গা তাদের পরিচয় জ্ঞাপন করেন —

'' গোসাঞি বোলেন গঙ্গা ই দুইটি কে।
নিশ্চয় করিয়া মোরে পরিচয় দে।।
গঙ্গা বোলে গোসাঞি কহিতে বাসি লাজ।
যেখানে সেখানে প্রভু কর মন্দ কাজ।।
গোয়ালিনীর পুত্র গণেশ গজানন।
কুচুনীর গর্ভে কার্ত্তিক ষড়ানন।'' পৃ-৮০

এতেই পরিচয় শেষ হয়নি। গণেশ-কার্ত্তিক যে শিবেরই পুত্র তা আরও বিশ্বস্ত করতে গৌরীকে দেওয়া প্রণয়োপহার সুবর্ণ কাটারি ও অঙ্গুরীয় শিবকে দেখানো হয়। এতে শিব খুশী হয়ে দুই পুত্রকে ক্রোড়ে টেনে নেন।

মালঞ্চ থেকে ফুল এনে শিব সেই ফুল পত্নীদ্বয়ের কাউকে না দিয়ে তা চালের উপর রাখলে সন্দিগ্ধমনা পার্বতী গঙ্গার নিকট সংশয় প্রকাশ করেন। গঙ্গার অনুমতিতে গৌরী সেই ফুলের সাজি চাল থেকে নিচে নামিয়ে আনেন এবং সেখানে জয়ব্রাহ্মণীকে দেখতে পান। এতে চরম অশান্তির সৃষ্টি হয়। শিব পূর্বেই মনসাকে নিয়ে আসার সময় যা কল্পনা করেছেন বাস্তবেও তাই ঘটেছে। পদ্মা শিবের মানসকন্যা বলে যতই নিজের পরিচয় দিতে যান, দুর্গা শিবের পত্নী ভেবে ততই পদ্মার উপর চড়, থাপড়, লাথি প্রহার করেন। দুর্গা ক্ষিপ্ত হয়ে এমন কঠিন অত্যাচার করেন যার ফলে পদ্মার কোমর ভেঙ্গে যায় এবং এক চোখ অন্ধ হয়ে যায়

''লাফ দিয়া পার্ব্বতী পদ্মার চুল ধরে।
অঝোর নয়নে পদ্মা ক্রন্দন সে করে।।
কেশ ধরিয়া মারে লাথি আর গুড়ি।

চড় চাপড় মুটকি মারে বাঢুনের বাড়ি।।
পদ্মা বলে না মারিহ পার্ব্বতী সতাই।
বিনি দোষে মার মোকে আমার দোষ নাই।।
- -
না বোল সতীন মোকে না করিহ পাপ।
শিব মোর স্বামী নহে জন্ম দাতা বাপ।'' পৃ-৮৩,৮৪

কিন্তু দুর্গা এতেও থেমে থাকার পাত্রী নন। কেননা দুর্গা ভালো করেই শিবের চরিত্র সম্পর্কে জানেন। কেননা দু'বার গোয়ালিনী ও কুচুনীর বেশে গেলে দু'বারই শিব তার সঙ্গে রতি সঙ্গম করেন। তাই দুর্গার সন্দেহ এই পদ্মাকেও সে এমনিভাবে কাছে টেনে নিয়েছে। তাই এই পদ্মার উপর আরো অত্যাচার চালান এবং বলেন —

''দুর্গা বোলে মালঞ্চে করিলে নানা কেলি।
সঙ্কট দেখিয়া স্বামীকে বাপ বোল বালি।।
কোপিত হইয়া লাথি মারে ভদ্রকালি।
সমুখে লাগিল পদ্মার ভাঙ্গিল কাঁকালি।।
পদ্মাকে দেখিয়া দেবী ক্রোধে কম্পমানা।
আঙ্গুলের ঘায়ে তার চক্ষু কৈলা কানা।'' পৃ-৮৪

পদ্মা, গৌরী এবং গঙ্গার এরূপ মানসিকতার জন্য দায়ী একমাত্র শিব। সপত্নীকে আজকের দিনেও যেমন কোনো নারী প্রাধান্য দেন না, ঠিক তেমনি গৌরী, গঙ্গাও তা দেননি। আর শিবের এরূপ চরিত্রের জন্য পদ্মাকে স্বপত্নী ভাবাটা অন্যায় নয়, এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু পদ্মার সহ্যের সীমা অতিক্রম হয়ে গেলে পদ্মাও দুর্গার উপর আক্রমণ না করে পারেননি। তখন পদ্মা নিজ রূপ ধারণ করে দুর্গাকে আঘাত করেন —

''সপরূপে পদ্মাবতী করিলেন ঘাঅ।
টলিয়া পড়িল দেবী কার্ত্তিকের মাঅ।'' পৃ-৮৪

পদ্মার সর্পাঘাতের ফলে সেই বিষ দুর্গা সহ্য করতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং প্রাণত্যাগ করেন।

গৌরীর জীবন দান ঃ

নারদের কাছে শিব এই খবর পাওয়া মাত্র শীঘ্র ঘরে চলে আসেন এবং দুর্গার এইরূপ অবস্থা দেখে শিব থাকতে পারেন নি।

''পার্ব্বতী দেখিয়া হর কান্দিয়া বিকল।
উছলিল নদী যেন নয়ানের জল।'' পৃ-৮৬

এই সময় শিব যেন 'মনি হারা ফণি'। সাধের কোনো জিনিস হারিয়ে গেলে যে অবস্থা হয় শিবেরও একই অবস্থা হয়েছে। এমন সময় শিব দুর্গা ব্যতীত কি করবে ভেবে না পেয়ে রাজ্যভার ছেড়ে দেশান্তরী হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন। কিন্তু এতে বাকি দেবগণ কিছুতেই রাজি নন। তখন দেবগণের ইচ্ছায় মনসাকে ডেকে গৌরীর শরীর থেকে বিষ নষ্ট করে পুনরায় তাকে জীবিত করতে হবে বলে শিবকে পরামর্শ দেন। পরামর্শ মত শিব মনসার স্মরণ নেন। মনসাও এসে উপস্থিত হন। তারপর মনসার কাছ থেকে দুর্গার এরূপ পরিণতির কারণ জানতে চান। তাতে ক্রুদ্ধ মনসা তার ভাঙ্গা কোমর ও অন্ধ চক্ষু দেখান। তারপরেও শিব মনসার নিকট কাতর প্রার্থনা জানান দুর্গাকে জিইয়ে দেবার জন্য।

''শিব বোলে পদ্মাবতী মোর বাক্য ধর।
জিয়াহ পার্ব্বতী মোর প্রাণের দোসর।'' পৃ-৮৬

এতে উত্তরে মনসা বলে —

''শুনিয়া বাপের বাণী বোলে দেবী ব্রহ্মাণী
অবধান কর মহাশয়
তোমার যে আজ্ঞা পাই জিয়াইঞা পার্ব্বতী দেই
অন্য হইলে না জিয়াই নয়।'' পৃ-৮৬,৮৭

পিতার আদেশ পেয়ে মনসা দুর্গার শরীরের কালকূট বিষ বিনষ্ট করেন এবং দুর্গা বেঁচে উঠেন। দুর্গার পুনর্জন্ম লাভের পরে শিব আনন্দে আত্মভোলা হয়ে মহারঙ্গে নেচে ওঠেন। এই দৃশ্য দুর্গার সহ্য না হওয়ায় ক্রোধ কম্পিতা দুর্গা মহেশের গলার নরহাড় মালা, সুবর্ণথালা, বাঘ ছাল ইত্যাদি প্রাঙ্গণে ছুড়ে ফেলে দেন এবং তাতে আগুন লাগিয়ে দেন। কিন্তু সেসব সামগ্রী অগ্নিদাহ্য নয় বলে পরে তা সাগরের জলে ফেলে দেন।

নীলকণ্ঠ শিব ঃ

শিবের এমন ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে গঙ্গা-দুর্গা পরিকল্পনা করে শিবকে ত্যাগ করে দু'জনেই দেশান্তরী হন। কিন্তু গঙ্গা-দুর্গাকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য শিব নারদকে পাঠান। এতে নারদ বাসুয়াকে সঙ্গে নিয়ে যান গঙ্গা-গৌরীকে উদ্ধার করার জন্য। মাঝ পথে নারদ শৌচকর্ম সম্পাদন করে জল না পেয়ে বিপদে পড়ে যান, এমন সময় বাসুয়ার পরামর্শে নারদ সাগরতীরে যান। কিন্তু

এমন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নারদ দেখতে পান সমুদ্রের জল ক্ষিরে পরিণত হয়েছে। পরে অবশ্য ইন্দ্রের সহযোগিতায় নারদ জল পেয়ে যান কিন্তু সমুদ্র জল ক্ষিরে পরিণত হবার কথা শিবকে জানানো হলে শিব প্রথমে তা বিশ্বাস করেননি। পরে শিব স্নান করার ছলে সেখানে এসে উপস্থিত হলে তাই দেখতে পান। সেখানে শিব ধ্যানে বসলে এর কারণ জানতে পারেন -

''শিব বোলে এমত করিল কুন জন।
ধ্যান করিয়া তবে দেখেন ত্রিলোচন।।
মনোহর ছাপান কৈল সাগরের নীর।
কপিলা সমস্ত সিন্ধু ভরাইল খির।।'' পৃ-৯৬

এরপর শিব সমুদ্র মন্থন করেন। কৃষ্ণের নামে মন্থনে লক্ষ্মী ও সরস্বতী, ইন্দ্রের নামে মন্থনে নর্তকী ও অপ্সরাগণ এবং দেবতাদের নামে মন্থনে চন্দ্র ও অমৃত ওঠে। শেষে শিবের নামে মন্থন করলে বিষ ওঠে। বাকি দেবতারা সকলেই অমৃত খেয়ে নিলে শিব সেই গরলই ভক্ষণ করেন। কিন্তু সেই গরল শিব জোর করে ভক্ষণ করলে তা জীর্ণ করতে না পেয়ে ঢলে পড়েন এবং অচেতন হন। শিবের এই অবস্থা দেখে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ক্রন্দনাকূল হন। পরে এখানেও পদ্মাকে ডাকা হয় এবং শিবের কণ্ঠের বিষ বিনষ্ট করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

''দেবতা সমস্ত বোলে পদমকুমারী।
তুমি জিঞাহ বাছা দেব ত্রিপুরারি।।
সত্বরে পালিল পদ্মা দেবের বচন।
মহামন্ত্রে ঝাড়িয়া জিয়ায় ত্রিলোচন।।
উত্তর শিয়রে রাখে ত্রিদশের ঈশ।
তন্ত্রে মন্ত্রে পদ্মাবতী বিনাশিল বিষ।'' পৃ-১০০

শিব সচেতন হলে সমগ্র দেবতাকূল, পশু-পাখি মনুষ্য জগৎ আনন্দে আত্মহারা হয়ে যান। কিন্তু সকলেই এতে আনন্দ পেলেও একমাত্র পদ্মার মন বিষণ্ণ থাকে। পদ্মার এই বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে পদ্মা উত্তরে জানান। —

''পদ্মা বোলে ত্রিপুরারি মাঙ্গিয়া খায়া মরি
পরঘরে অন্ন বিনে মরি।
মোর প্রাণপতি নাই রহি আমি কার ঠাই
এই অভিমান আমি করি।'' পৃ-১০১

শিব তখন দেবসভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের মধ্যে যে কোনো একজনকে পতিত্বে বরণ

করতে বলেন। এমন সময় বাসুকীর পরামর্শে শিব জরৎকারু মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ ঠিক করেন।

''নাগরাজবচনে শিবের পড়ে মনে
জরৎকারকে ডাকি আনে।
কন্যা তার হাতে আনি কন্যা সমর্পে শূলপাণি
সুরাসুর নাগ বিদ্যমানে।'' পৃ-১০১

বিবাহ হলে জরৎকারু বলে —

'' মোক যদি গর্হিত করিবেক কদাচিত
এড়িয়া পলাইব তবে।'' পৃ-১০১

এরপর আমরা দেখি জরৎকারু মুনি পদ্মার উরুতে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে পদ্মা স্বামীর নিদ্রভঙ্গ করান। এতে জরৎকারু মুনি ক্রোধান্বিত হয়ে পূর্বেকার কথা মনে করিয়ে পদ্মাকে পরিত্যাগ করেন। পরবর্তী ঘটনায় আমরা দেখি পদ্মা অন্তঃসত্ত্বা হন এবং আস্তিকের জন্ম দেন। পদ্মা পুত্র কোলে করে যাবার সময় রাস্তায় রাখাল বালকদের সঙ্গে দেখা হয়, তাদের কাছে পদ্মা পুত্রের খাবার জন্য দুগ্ধ চাইলে তারা পদ্মাকে দুধ দিতে নারাজ হন। পদ্মা এখানেও ক্রুদ্ধ হয়ে রাখাল বালকদের গরু লুকিয়ে রাখেন এবং পরে তারা মনসার ঘটে পূজা দিলে মনসা সন্তুষ্ট হন। একইভাবে পদ্মা জালোদের কাছেও পূজা আদায় করেন। এভাবেই পদ্মার পূজার সূচনা দিয়ে দেবখণ্ডের সমাপ্ত হয়।

এরপর বাণিয়াখণ্ডের শুরু। এখানে আমরা দেখি মনসা মর্ত্য লোকে পূজা প্রচার করার জন্য চাঁদ সদাগরকে ধরে। কেননা, মর্ত্য লোকের সম্ভ্রান্ত কেউ যদি মনসার পূজা করেন তাহলে সকলেই সশ্রদ্ধ চিত্তে মনসার পূজা করবেন। এতে মনসার পূজার প্রচলন মর্ত্য পৃথিবীতে শুরু হবে। কিন্তু চাঁদ কিছুতেই মনসা পূজা করেন নি। এতে মানবও দেবতার দ্বন্ধ দেখা যায়। চাঁদ মনসার কোপে পরে সপ্তডিঙ্গা ও সাত পুত্র হারায়। অবশেষে স্বর্গের অধিবাসী ঊষা-অনিরুদ্ধ মর্ত্য পৃথিবীতে যথাক্রমে সায়বেনের ঘরে বেহুলা রূপে এবং চাঁদসদাগরের গৃহে লক্ষীন্দর রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। বেহুলা লক্ষীন্দরের বিবাহ হলে মনসার প্ররোচনায় বিবাহ বাসরে লক্ষীন্দরের মৃত্যু হয়। অর্থাৎ চাঁদসদাগরের সঙ্গে মনসার বিরোধিতা করাই 'বাণিয়াখণ্ডে'র প্রধান উপজীব্য বিষয়। বেহুলা-লক্ষীন্দর মনসার পূজা শেষে পুনরায় স্বর্গে ফিরে যান, ফলে মর্ত্যে মনসা পূজার প্রচলন ঘটে।

২. তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ

প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্য শুরু হয় দেব বন্দনা অংশ দিয়ে। আর এই বন্দনা অংশে প্রত্যেক কবিই প্রায় পুরাণের সমস্ত দেবতাদের স্মরণ করেছেন। এতেও অবশ্য একটি নির্দিষ্ট ধারা চোখে পড়ে। যেমন প্রথমেই গণেশ বন্দনা, তারপরে অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা। এই অন্যান্য দেবদেবীদের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, মহামায়া, ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রমুখ দেবতারা স্থান পান। এ পর্যন্ত বেশিরভাগ মঙ্গলকাব্যেই তা নজরে আসে। তবে উত্তরবঙ্গের কবিদের ক্ষেত্রে কখনো কখনো তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে কবিরা যে স্থানের অধিবাসী হন, সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক দেবতারা তাদের কাব্যে স্থান পান। এখানেই প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যের বন্দনা অংশের হেরফের ঘটে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাব অনেকটাই কার্যকরী বলে মনে করা হয়। আলোচ্য তন্ত্রবিভূতির 'মনসাপুরাণ'ও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। যদিও 'মনসাপুরাণে'র বন্দনা অংশের বিস্তার সেভাবে নেই, খুব সংক্ষেপে করেছেন। তবুও শিব বন্দনা যেন সর্বত্রই বাধ্যতা মূলক। এখানে কবি মনসাকে 'তোতলা সর্ব্বেশ্বরী' নামেই চিহ্নিত করেছেন, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই 'তোতলা সর্ব্বেশ্বরী'র সঙ্গে শিবের সম্পর্কটুকুও বন্দনা অংশে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। তন্ত্রবিভূতির 'মনসপুরাণ' কাব্যে প্রাসঙ্গিকভাবে শিবের কথা এসেছে, মূল কাব্য থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে আমরা সেই শিব প্রসঙ্গ স্পষ্ট করার চেষ্টা করবো।[৩৭] কাব্যের শুরুতেই তা স্পষ্ট —

'' নম দেবী আদি জত জগৎ সর্ব পূজিত
তুমি দেবী নাম বিষহরি।
তুমি জগতের মাতা শঙ্করের প্রাণ দাতা
কৌতুকে মর্ত্যেতে অবতরি।।
নম জগতের মাতা পুণ্য পরানন্দ দাতা
বিষহরি বিষকরে হর্তা।
সাপের বিনাশহারি পাপ বিনাশকারী
হেমবর্ণ জগতের মাতা।।
তোতলা সর্বেশ্বরী নমো দেবী বিষহরি
বালকের জদি কর দয়া।
নাট নাটেশ্বরী ত্রিপুরা সুন্দরী
তুয়া গতি পদে দেহ ছায়া।।'' (পৃ-১)

এতটুকু বলার পর কবি পুরাণাশ্রয়ী বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করেছেন। কিন্তু এই পুরাণাশ্রয়ী দেবদেবীদের বন্দনার আগে কবি স্বল্প পরিসরে মনসার জন্মের বৃত্তান্ত আলোচনা করেছেন। যা অন্য কোনো ধারার কোনো কবির কাব্যে পাওয়া যায় না। এখানেই কবি স্বতন্ত্র।

''দিন হৈলে থাক মাতা ই কাগবাহনে।
রাত্রি হৈলে নামো মাগো গায়েন স্মরণে।।'' (পৃ-২)

স্পষ্টতই এখানে কবি মনসার কথা বলেছেন। এরপর কবি যেন অনেকটা পিছিয়ে গিয়ে ফ্ল্যাশ ব্যাকের মধ্য দিয়ে তার জন্ম বৃত্তান্ত তুলে ধরেন । তবে তা সবটাই বন্দনার আদলে। যাতে শিব প্রসঙ্গ স্মরণীয়—

''পুষ্পবাড়ি গেলা হর সাজি নঞা করে।
হংসের শৃঙ্গার দেখি কামাতুর হরে।।
হরের টনিলা বিন্দু তোমার উৎপত্তি।
কমলে জন্মিলা মা নাগিনী পদ্মাবতী।।
গোসাইর টনিলা বিন্দু লৈলা মহেশ্বরী।
তাহাতে হইল নাম পদমকুমারী।।
পদ্ম পুষ্পে জন্ম তোমার শঙ্করঝিয়ারী।
তে কারণে হৈল নাম দেবী বিষহরি।।
আকাশে হইল নাম আকাশকামিনী।
পাতালে হইল নাম পাতালগামিনী।।
মর্ত্ত্য ভুবনে নাম জয় জয়কারী।
তুমি দেবী স্বরূপা তুমি বিষেশ্বরী।।
ত্রিভুবন ভৈরবী তুমি ত্রিভুবনেশ্বরী।
আগমে আপনি তুমি হৈলা মহেশ্বরী।।
ব্রহ্ম সনাতনী তুমি দেবীত ব্রাহ্মণী।
ক্ষেণে পঞ্চবান ধর ত্রিভুবন জানি।।
সর্ব্বত্র ব্যাপিত রূপ তুমি ভয়ঙ্করী।
তোমার চরিত্র সুনি মনে বড় ডরি।।
জরৎকার মুনির তুমি হয় জায়া।
তুমি মোরে কৃপা করি দেহ পদছায়া।।'' (পৃ- ২)

স্পষ্টতই এখানে কবি শুধু মনসার জন্ম বৃত্তান্তই উল্লেখ করেননি। পাশাপাশি মনসা উত্তরবঙ্গে কত নামে পরিচিত (হয়তো বা বৃহৎ বঙ্গেও) তারও স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই নাম গুলি হল— নাগিনী পদ্মাবতী, পদমকুমারী, শঙ্কর ঝিয়ারী, বিষহরি, আকাশ কামিনী, পাতাল গামিনী, বিষেশ্বরী প্রভৃতি। এসব নাম হবার কারণ পর্যন্ত এখানে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত বিষের অধিকারী বলে তিনি বিষেশ্বরী, আবার শিব যখন সমুদ্র মন্থিত হলাহল পান করে নীলকণ্ঠ হয়ে মৃতপ্রায় হন তখন মনসাই সেই বিষ হরণ করেন বলে তার নাম বিষহরি। এই সাধারণ ধারণাটুকু স্বল্প পরিসরে দেবার পরেই কবি আবারও পুরাণাশ্রয়ী দেবদেবীদের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। এতে যে সমস্ত দেবদেবীরা প্রাধান্য পেয়েছেন তারা হলেন -- ব্রহ্ম নিরঞ্জন, বিষ্ণু, গণপতি, গঙ্গা, ভগীরথ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগন্নাথ, দামোদর প্রভৃতি। এখানে তিনি আবারও প্রথানুগত ধারাকে অবলম্বন করেছেন। লক্ষণীয় মঙ্গলকাব্যের এই বন্দনা অংশের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের প্রচলিত যে কোনো পূজার গানে বা লোকনাটকে বন্দনা অংশের গানের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেও যেন তারা সমস্ত পুরাণের দেবতাদের স্মরণ করেছেন। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় গমীরা খেলার গানেই তা স্পষ্ট।

‘‘পূব্বে না বন্দিয়া গামোঁ ধম্ম নিরঞ্জন;
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ ধম্ম নিরঞ্জন।।
উতরে বন্দিয়া গামোঁ গইনাৎ মহাকাল;
তাঁহারে চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও।।

পছিমে বন্দিয়া গামোঁ পীরো পগম্বর;
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও।।

দক্ষিণে বন্দিয়া গামোঁ সম্পতি সাগর;
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও।।

চাইরপুখে চাইর কণা বন্দোঁ
মইধ্যে জল্লেশ্বব;
তাঁহারো চরণো বন্দোঁ দুইয়ো পাও।।[৩৮]

মনসার জন্ম প্রসঙ্গ ঃ

মনসার জন্ম প্রসঙ্গে কবি প্রথানুগত ধারা যে অনুসরণ করেননি তার পরিচয় পাই সৃষ্টিতত্ত্ব

অংশ থেকে। এখানে শুধু মনসার জন্ম বৃত্তান্ত, তার চোখ, কান, নাক, মুখ কিভাবে সৃষ্টি হয় সেটুকুই উল্লেখ করেছেন । তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে সৃষ্টিতত্ত্ব অংশে শিব যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছেন এখানেও কবি শিবের সমধিক প্রাধান্য বজায় রেখেছেন। শিবের ধর্ম পূজা প্রসঙ্গ 'মনসাপুরাণে'র এই গুরুত্বকে বজায় রেখেছে। আমরা জানি ধর্মঠাকুরের পূজা উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ও জনপ্রিয় লোকায়ত পূজা। যদিও এতদঞ্চলে এই ধর্ম ঠাকুরকে শিব রূপেই পূজা করা হয়। তবে পূর্বে এতদঞ্চলে যে শিব এবং ধর্মঠাকুর আলাদা ছিল তার প্রমাণ তন্ত্রবিভূতির 'মনসাপুরাণ'। কেননা এখানে আমরা দেখি শিবকে ধর্মপূজা করতে। আর এই পূজার আয়োজন করতে গিয়েই শিবের বীর্য স্খলন ও সেখান থেকেই মনসার জন্ম। বিষয়টি আকস্মিক হলেও 'মনসাপুরাণ' কাব্যে এটাই সত্যি।

''একদিন প্রভু হর করিল ভূষণ।
আচম্বিতে মনে তার হইল স্মরণ।।
ধর্ম পূজিবারে শিব করিলেন মন।
ত্রিশ কোটি দেব আইলা কমলের বন।।
বিভূতিভূষণ হরে মালা ধুতুরার ফুল।
ধর্মনামে মজি হিঞা আখি ঢুলু ঢুল।।'' (পৃ-৫)

এভাবেই শিবের ধর্মঠাকুর পূজার ইচ্ছা জাগ্রত হলে পূজার নানান আয়োজনে শিব ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিশেষ করে পূজার ফুল তোলার জন্য শিব মানস সরোবরে উপস্থিত হন। এই প্রসঙ্গে শিব নানান পক্ষীর ও ফুলের পরিচয় দেন, যা মূলত উত্তরের উর্বর ভূমির পরিচয় বহন করে। ফুল তুলতে গিয়ে প্রথমে তুলসীপাতা, চাপা, গন্ধরাজ, জুঁই, মালতী, শতদল, শিউলি প্রভৃতি ফুল তোলেন। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয় এরপরে। কেননা —

''নানা পুষ্প তুলে শিব বাছিঞা বাছিঞা।
রুদ্রাক্ষ কমলের লাগি পাইল জাইঞা।।'' (পৃ-৭)

কিন্তু মানস সরোবরে রুদ্রাক্ষ ফুল তুলতেগিয়ে শিব লক্ষ্য করেন সেই ফুলের উপর ভ্রমরা -ভ্রমরী বসে আছে এবং এরা মিলনে ব্যস্ত। এই চিত্র দেখে শিবের কামোন্মাদনা সৃষ্টি হয়। তখন সে ধর্ম পূজাকে কিংবা পুষ্পতোলাকে ধিক্কার জ্ঞাপন করেন ।

''ভ্রমরা ভ্রমরী জাতে উড়ি উড়ি পরে।
মধু খাঞা ভ্রমরা ঝমকে নাদ পুরে।।
তা দেখিঞা শিবের বিপরীত মন।

মোহিলী শিবের বুকে এ পঞ্চ মদন।। (পৃ-৭)

আর এই মদনের আগমনে শিব প্রায় উন্মত্ত। ভ্রমরা-ভ্রমরীর এই মিলন দৃশ্য তাকে দুর্গার কথা মনে করিয়ে দেয়। শুধু তাই নয় সে বিচলিত হয় এই ভেবে যে --

''কেনে বা আইনু আজি ঘরে দুর্গা ছাড়ি'' (পৃ-৭)

কিন্তু সেই কামোন্মাদনা এতটাই তীব্র হয়ে উঠে যে শিবের বীর্য স্খলন হয়ে যায়। এরপর কাহিনী ধারার অগ্রগতির সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি যে শিব বড় চিন্তিত সেই বীর্য নিয়ে, কেননা তা রাখবেন কোথায়?

''কোন স্থানে থুব বিন্দু কি হবে উপায়।'' (পৃ-৭)

পৃথিবীর উপর সেই 'বিন্দু' (বীর্য) রাখার ইচ্ছা হলেও পরক্ষণেই তার মনে হয় যে সেখানে রাখলে তা চিলে নিয়ে যাবে। আবার জলের মধ্যে রাখলে তা মাছ খেয়ে ফেলবে। শুধু তাই নয়,

''পাতালে থুইব বিন্দু বাসুকী করে বল।
সপ্ত দ্বীপমধ্যে বিন্দু থুইতে নাহি স্থল।।'' (পৃ-৮)

এভাবে শিব সেই বীর্য নিয়ে নানান চিন্তা ভাবনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তা 'কমল পুষ্পের' উপর রাখেন। কিন্তু সেই বীর্য সেখান থেকে পদ্মের নালা বেয়ে পাতালে প্রবেশ করে। এমন সময় পাতাল রাজা বাসুকী পাত্র-মিত্র সভাসদদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। সেখানেই শিবের বীর্য মাংস পিণ্ড হয়ে পড়ে। এতে বাসুকি সহ সকল নাগ বিস্মিত হন। কোথা থেকে, কেমন করে, এই মাংস পিণ্ড পাতালে প্রবেশ করলো — এই তথ্য জানার জন্য পাতাল রাজ বাসুকী ধ্যান মগ্ন হন এবং ধ্যান মধ্য থেকে জানতে পারেন যে এই মাংস পিণ্ড হল মহাদেবের মহাবিন্দু। তখন বাসুকী এই পিণ্ডকে নিয়ে বড় চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং সেটিকে নিয়ে কি করবেন তা ভাবতে থাকেন। কিন্তু তারপর বাসুকী এই পিণ্ডের উপর চোখ কান দিয়ে তাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

''তখনি বাসুকী নাগ কোন কর্ম করে।
জল সেচন করে মাংসপিণ্ডের উপরে।।
আগে নাক মুখ পাছে অষ্টাঙ্গ হইল।
প্রসবিল মনভাবে মনসা নাম থুইল।।
হংসের উপরে দেবী করে আরোহণ।
অষ্টকুলা নাগ দেবী করিল ভূষণ।।
চতুর্ভুজ মূর্তি পদ্মা দেখিতে সুন্দর।
নানা আভরণ সর্প এদের উপর।।'' (পৃ-৮)

এভাবেই দেবীর অষ্টাঙ্গ, কেশভার, কাজল, চোখ, ওষ্ঠ, জিহ্বা, দাঁত প্রভৃতি স্থাপন করা হয়। পরে তাকে পাতাল রাজ বাসুকী ও অন্যান্যরা নাগকুলের দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠা করেন।

মনসার পিতৃগৃহে গমন ও দুর্গার সঙ্গে কলহ ঃ

এরপর বাসুকী মনসাকে ভগিনি সম্বোধন করে তাকে পিতৃস্থানে যাবার জন্য আজ্ঞা করেন। মনসাও বাসুকীর কথা মতো পিতৃস্থানে চলে আসেন। কেননা বাসুকীর কাছে সে জেনে নিয়েছে যে—

''শীঘ্রগতি সরোবরে তুমি উঠ গিঞা
জাবৎ না যায় শিব পুষ্প তুলিঞা।।'' (পৃ-৯)

তাই মনসা শীঘ্রই সরোবরের তীরে উঠে এসে পদ্মপাতা থেকে বাবাকে ডাকতে থাকেন। সেই ডাক শুনে অবশ্য শিব কিছুটা অবাক হয়ে যান। কেননা, তার মনে হয় যে সঙ্গে গণেশ কিংবা কার্ত্তিক কেউই তো আসেনি। তবে কে তাকে 'বাবা' বলে ডাকেন । এমন সময় শিব মনসাকে দেখতে পান এবং মনসা সঙ্গে সঙ্গে তার পরিচয় প্রদান করেন। পরিশেষে মনসা শিবের সঙ্গে পিতৃগৃহে যেতে চান। কিন্তু শিব এতে আপত্তি প্রকাশ করেন। কেননা —

''তুমাকে সে বোলি আমি সুন পদ্মাবতী।
দুর্গা করিবে তুমার এ পঞ্চ দুর্গতি।।
তুমাকে বোলিএ আমি না জাইহ ঘর।
ঘরে দুর্গা আছে মোর বড়ই প্রখর।।
আমার বাক্য সুন মা ব্রাহ্মণী তোতল।
তুমি গেলে হবে মাই দ্বন্ধ কন্দল।।
জখন বোলিবে দুর্গা কুৎসিত বচন।
সহিতে না পারিবে তুমি করিবে ক্রন্দন।।'' (পৃ-১০)

এভাবে শিব মনসার পরিণতির কথা জানিয়ে দেন । কিন্তু এতে প্রশ্ন জাগে কন্যা মনসা তাহলে থাকবে কোথায়। শিব অবশ্য সেই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন।

''মানসরোবরে ঘর দেঙত বান্ধিঞা।
নিতি নিতি জিজ্ঞাসিব ধর্ম পুজিঞা।।'' (পৃ-১০)

কিন্তু মনসা এত সহজে তা মানতে নারাজ। কেননা, সে পিতৃ গৃহে যাবে বলেই একপ্রকার পণ করেছে। তাই শিবের অন্য কোনো কথাই সে শুনবেন না। তখন বাধ্য হয়ে শিব তাকে পুষ্প সাজি

মধ্যে লুকিয়ে নিজ গৃহে নিয়ে যাবার জন্য সম্মত হন। এভাবে সাজি মধ্যে কন্যাকে নিজ গৃহে নিয়ে এসে সাজি সহ মনসাকে শিব লুকিয়ে রাখেন। কেননা, শিব জানেন যে গঙ্গা এবং দুর্গা সাজি মধ্যে মনসাকে দেখতে পেলে চরম যুদ্ধ বেধে যাবে। তাইতো শিব গঙ্গা এবং দুর্গাকে সেই সাজি ধরতেও বারণ করে দেন। কারণ —

''গঙ্গা দুর্গাকে শিব বোলে ডাক দিঞা
আজিকারি সাজি গুটি না লারিহ গিঞা।।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর গেল কলি অবতার।
আজিকারি সাজি লারিলে পড়িবে অথান্তর।।'' (পৃ-১১)

শিবের মুখে একথা শুনে দুর্গার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কেননা, শিব আগবাড়িয়ে যেহেতু ফুলের সাজি ধরতে বারণ করেন, তাঁতে দুর্গার মনে হয়েছে, সেখানে হয়তো গোপন কোনো কিছু রাখা আছে। এই কৌতূহল অবশ্য আমাদের সকলের। যেখানেই বারণ সেখানেই কৌতূহল। সেই কৌতূলহ বা সন্দেহ কবির ভাষায় এরকম—

''নিতি নিতি জায় ভাঙ্গরা ভিক্ষার জে ছলে
সুপ্রভাতে জায় বুঢ়া আইসে বিকালে।।
নিতি নিতি যায় বুঢ়া পুষ্প তুলিবারে।
পুষ্প আনি প্রতিদিন দ্যায়ত আমারে ।।
আজি কেনা পুষ্পসাজি লুকাঞা রাখিল
পুষ্পমধ্যে কোন কন্যা হরিঞা আনিল।।'' (পৃ-১২)

কোনো সন্দেহ যদি সত্যি হয় তবে তার পেছনে লুকিয়ে থাকে তীব্র ক্রোধ। দুর্গার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার সন্দেহ আরও প্রখর হয় যখন সে ফুলের সাজি ধরতে যায়, কেননা তখন সাজিটি নিজে থেকেই অন্যত্র সরে যায়। তখন দুর্গা নিজ রূপ ধারণ করেন সেই সাজি নিজের কাছে নিয়ে আসেন এবং সেটিকে খুলে ফেলেন। শুধু তাই নয়, তার মধ্যেকার সমস্ত ফুলও আগুনে পুড়ে দেন। তখন মনসাও আর কোনো লুকাবার জায়গা না পেয়ে নিজ রূপ ধারণ করে এবং দুর্গাকে মা বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু দুর্গা এবার আরও ক্রোধান্বিত হয়ে যান। সেই ক্রোধে নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে মনসার সঙ্গে মারপিট শুরু করে দেন।

'' যখন পার্বতী দেবী পদ্মাকে দেখিল।
অসুরদলনী মূর্তি তখনে ধরিল।।
ক্রোধিত হহঞা দুর্গা ধরে তার চুলে।

চড় চাপড় মারে বিষহরির গালে।।'' (পৃ-১৪)

দেবী মনসাকে দেখে দুর্গার মনে সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে। কেননা দুর্গা ভাবে যে এই মনসাকে দেখার জন্যই শিব প্রত্যহ ফুল তোলার ভান করে সকালে যায় এবং বিকালে আসেন। অন্যদিকে ঘরে দুই সন্তান থাকা অবস্থাতেও শিবের কোনো চিন্তা নেই। এসব চিত্র অবশ্য শুধু সেকালের নয় একালেও দেখা যায়। এরপরেও মনসা স্থির ও শান্ত মনে নিজের পরিচয় দান করেন—

''বাপ গেল পদ্মবন পক্ষনাদ ঘনে ঘন
মোহ বাতে পড়ি গেল ধন ।
জন্ম মোর সেই ধনে জানে সর্ব দেবগণে
আর জানে ধর্ম নিরঞ্জন।।'' (পৃ-১৫)

কিন্তু এরপরেও দুর্গা বিশ্বাস করতে পারেন না যে মনসা শিবের কন্যা। এক্ষেত্রে দুর্গার যুক্তিকেও অস্বীকার করা যায় না। তার যুক্তি হল —

১.' বিনা মা এ কাহার জনম' — অর্থাৎ গর্ভবতী মা ছাড়া কোনো সন্তানের জন্ম হতে পারে না। গঙ্গা ও দুর্গা দুজনেই শিবের স্ত্রী, আর এদের কারুর সন্তানই মনসা নন। আর মনসার যেহেতু মা নেই তাই সে শিবের কন্যা হতে পারেন না।

২. শিবের যদি সে কন্যাই হয় তবে এতদিন কেন তাকে কৈলাসে আনা হল না।

৩. শিব কেন তাকে ফুলের সাজির মধ্যে লুকিয়ে আনবেন।

এসব কারণের জন্য দুর্গা মনসাকে মেনে নিতে পারেনি। তার বার বার মনে হয়েছে মনসা শিবের আর এক পত্নী। যার জন্য সে প্রতিদিন সকালে পুষ্পবনে যায়, সারাদিন তার সঙ্গে রতিক্রিয়া করে বিকেল বেলা ঘরে ফিরে আসেন।

''বোলে দুর্গা বারে বারে বাপ নঞা রতি জার
ঘর তুমাক করিতে আছে আশ।
তোর মনে আছে আশ বাপ নঞা কর বাস
ছাড়িঞা যাউক কৈলাস।।'' (পৃ-১৬)

শুধু এভাবে গালিগালাজই নয়, রীতি মতো মারপিট শুরু হয়ে যায়। যার ফলস্বরূপ মনসার একটি চোখ অন্ধ হয়ে যায়।

'' দুর্গা মারিল ঠোকনা পদ্মার চৈক্ষ হইল কানা
পৃষ্ঠ দেবীর হৈল খান খান।

মনে দেবী অভিমানী মায়া কৈল পদ্মমুনি

ধুলামধ্যে করিল পয়ান।।'' (পৃ-১৬)

দুর্গার হিংসায় পদ্মার এক চক্ষু কানা হলে পদ্মা এবার আর চুপ করে বসে থাকেন নি। সে তার নিজরূপ ধারণ করেছেন। পাশাপাশি সে তার অষ্টকুল নাগকে স্মরণ করেন । সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নাগ তার কাছে উপস্থিত হয়। প্রতিশোধ পরায়না মনসা এবার দুর্গার প্রতি প্রতিশোধ নিতে কতগুলি কাজে উপক্রম হন —

১. সতাই মায়ের উপর সমস্ত বিষ বর্ষণ করেন।

২. 'দুর্গার মাংস পিণ্ড আজি করিব পিবনি' ইত্যাদি কাজে অগ্রগণ্য হন।

ফলে দুর্গা বিষের জ্বালায় লুটিয়ে পড়েন, যা দেখে পদ্মা আনন্দিত হন। এমতাবস্থায় দুর্গার স্বামী ও পুত্রের কথা মনে পড়ে।

দুর্গার এহেন পরিস্থিতিতে শিব অনুপস্থিত। কেননা, শিব তখন পর্যন্ত ধর্ম পূজায় ব্যস্ত।

''মাটি বাছিঞা শিব পূজা আরম্ভিল।

প্রথমতে পুষ্প তুলি ধর্ম নামে দিল।।

মূল মন্ত্র জপে শিব ভকতি করিঞা।

করিতে ধর্মের পূজা পড়িল টলিঞা।।'' (পৃ-২১)

শিব ধর্ম পূজা করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে ধ্যানে বসেন। এবং এই ধ্যানের মধ্য থেকেই কৈলাসের সমস্ত খবর পেয়ে যান। খবর পাবার পরই শিব ধ্যান ভঙ্গ করেন এবং পূজা অসমাপ্ত রেখে ঘরে ফিরে আসেন। সেখানে ফিরে দুর্গার অবস্থা দেখে শিব অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন।

''শ্বাস নিশ্বাস দুর্গার একই না পাইল।

মাথে হাত দিয়া শিব কান্দিতে লাগিল।।'' (পৃ-২১)

শিবের এই অবস্থার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের 'মেছেনি গান' এর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানেও দেখি দুর্গা মারা যাবার পর শিবকে অসহ্য কষ্ট সহ্য করতে। সেই সহ্যাতীত কষ্ট সহ্য করতে গিয়ে লোককবিরা লিখেছেন--

''শিবের মইচ্চে বোলে

কোলার মাইয়া--

দুই চক্ষের জল পরে ধায়া

শুনরে নগরিয়া নোক

মাইয়া মরার বড়ই শোক।।[৩৯]

শুধু তাই নয়, শিব এই ভেবে বড় কষ্টপান যে দুর্গার সাতবার পুনর্জন্ম সম্ভব, কিন্তু আটবার নয়। সুতরাং এবার আর তাকে বাঁচানো সম্ভব নয়। এভাবেই শিব কখনো পদ্মাকে দেখে, কখনো বা গঙ্গাকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। পিতার এহেন কষ্ট পদ্মা সহ্য করতে না পেরে পদ্মা দুর্গাকে বাঁচানোর শর্তসাপেক্ষ আশ্বাস দেন। তবে বাঁচানোর আগে পদ্মা দুর্গার কৃতকর্মের কথা একবার শিবকে বলতে চান —

''পদ্মা বোলে পিতা তুমি কর অবধান।
পৃষ্ঠ খান খান মোর চক্ষু কান।।
তুমার ঝিয়ারি আমি সর্ব লোকে জানি।
দেবলোকে নরলোকে বোলিবেক কাণী।।'' (পৃ - ২২)

কিন্তু এমতাবস্থায় শিব এসব কথা শোনার পাত্র নন। কি করে দুর্গাকে ঠিক করা যাবে সেই কথাই শিব বার বার পদ্মার কাছে বলেন। তাই পদ্মার কথায় উত্তর না দিয়ে শিব বলেন—

'' শিব বোলে সুন বাছা জানিলাম বিশেষ।
কোন বুদ্ধে জিএ দুর্গা বল উপদেশ।।
পদ্মাবতী বোলে পিতা কেনে চিন্ত আন।
না মরিবে সতাই জপহ ব্রহ্মজ্ঞান।।'' (পৃ-২২)

অর্থাৎ শিবের ধ্যান, মন, জ্ঞান সমস্ত কিছু দুর্গাময় দেখে পদ্মা বাধ্য হয়ে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন।

অনেক কষ্টের পরে দুর্গার প্রাণ ফিরে আসলে সে চোখের সামনে শিব ও পদ্মাকে দেখে। ফলে পুনরায় দুর্গা ক্রোধান্বিত হয়ে পড়েন। এতক্ষণ সে যেমন স্বামীর অনুপস্থিতিতে পদ্মাকে গালিগালাজ, চড়, থাপ্পর মেরেছেন; এবার স্বয়ং পদ্মার উপস্থিতিতে স্বামীকে সে তীব্র ভাষায় ভৎর্সনা করেন। শিব প্রত্যুত্তরে মিনতি সহযোগে পদ্মার জন্ম কথা বললেও তা দুর্গাকে বিশ্বাস করানো যায়নি। উপরন্তু দুর্গা শিবকে পদ্মার সঙ্গে ঘর সংসার করার কথা বলেছেন, আর সে নিজে পুত্র সন্তান নিয়ে বাপের বাড়ি যাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নতুবা পদ্মাকে সিয়লি পর্বতে বনবাসে পাঠালে সে শিবের সঙ্গে সংসার করবেন। এমন কথায় পদ্মা ভারি মনকষ্ট পান। বিনা কারণে তাকে বনবাসে যেতে হবে, এ যেন সে মানতেই পারেন না। তাইতো পদ্মা এসবের কারণ হিসেবে শিবকে কাতর আবেদন জানান। কিন্তু এখানে শিব চরম দোলাচল অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। একদিকে যেমন দুর্গাকে ছাড়তে পারেন না, তেমনি কন্যা পদ্মাকেও এভাবে বনবাসে পাঠাতে মন সায় দেয় না। এমনতর দোলাচল অবস্থার মধ্যে পড়ে শিব পদ্মাকে উপদেশ দেন—

''শিব বোলে সুন পদ্মা বোলিএ তুমারে।
দুর্গাকে সেবিএঞা তুমি থাক মোর ঘরে।।'' (পৃ-২৪)

শিবের এমন প্রস্তাবকে পদ্মা দুর্গার সামনে উপস্থাপিত করেন। পদ্মার নানান আকুতি দুর্গা একেবারে অগ্রাহ্য করে দেন। তাদের দ্বন্দ্বের এই চরম পর্যায় প্রশ্ন উত্তরের মধ্য দিয়ে নিচের ছকে প্রকাশ করা হল—

পদ্মার প্রশ্ন	**দুর্গার উত্তর**
১. দুর্গার চরণ ধরি বলি বোলে ধীরে ধীরে। বনবাস না দেয় সতাই রাখ মোরে ঘরে।।	১. দুর্গা বোলে ঠাই নাই আমার মন্দিরে। চলি জাহ কাণী তুমি বনে ভিতর জাহ।।
২.পিড়ামধ্যে ঠাই মাতা দেহ নিরমিএঞা। কার্তিক গণপতি সঙ্গে বেড়াব খেলাএঞা।।	২. পিড়ামধ্যে তুমাকে নাহি দিব ঠাই। জন্মের নাগিএঞা হারাই কার্তিক গণাই।।
৩. বাড়ি মধ্যে ঠাই খানি দেহ নিরমিএঞা। নিতি নিতি থাকিব মা তুমারে ভজিএঞা।।	৩. বাড়ি মধ্যে ঠাই জদি দিব নিরমিএঞা। নিতি থাকিবা বেশ সুবেশ করিএঞা।। তোর রূপে ভাঙ্গরা পড়িবে ঢলিএঞা। কেমতে এসব আমি দেখিব থাকিয়া।।
৪. গ্রাম মধ্যে ঠাইখানি দিব নিরমিএঞা। থাকিব তোমার আমি আরতি কুলাএঞা।।	৪.গ্রামমধ্যে আরে বেটী তোর নাহি স্থল। নাজ নাই নিলজি পদ্মা বনবাসে চল।।
৫. কিছু ঠাই দেহত সতাই না জাইব বন। বনে না জাইব আমি সুনহ বচন।।	৫.পদ্মার বচনে দুর্গার ক্রোধ কলেবর। বাপ নএঞা ঘর কর মুই জাই বাপার ঘর।।

(পৃ-২৪/২৫)

অর্থাৎ প্রথম থেকে ধীরে ধীরে পদ্মা বাড়ি, গ্রাম এমনকি কোথাও না কোথাও আশ্রয় চেয়েছেন। কিন্তু দুর্গাও প্রত্যেকটি উত্তর দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত রাগ সম্বরণ করতে না পেরে তাকে বাপের সঙ্গে ঘর করার কথা বলেছেন। এসব প্রশ্ন উত্তরের মধ্যে দুজন নারীর পারস্পরিক প্রতিহিংসাই প্রকাশ পেয়েছে। এত মিনতির পর পদ্মা যখন দুর্গার সংসারে ঠাঁই পেল না তখন পদ্মাও তার শেষ ক্ষমতার কথা জানিয়ে দেন—

''দুর্গার নিষ্ঠুর বাক্য পদ্মাএ সুনিএঞা
বীর গাছি বান্ধিলেন এতেক চিন্তিএঞা।।
জখন পড়িবে সতাই হবে মহামার।
আমাকে সঙরিহ তখন করিব উদ্ধার।।'' (পৃ-২৫)

কোনো বাবাই চান না কন্যাকে এভাবে বনবাসে পাঠাতে। শিবও তার ব্যতিক্রম নন। বাধ্য হয়েই শিব কন্যাকে বনবাসে নিয়ে যান। এই দৃশ্যও যেন অনেকটা মর্মান্তিক। এই বনবাস যতটা কষ্ট কন্যাকে দেয়, তার থেকেও বোধ হয় বেশি দেয় পিতাকে। কিন্তু পিতা এই কষ্ট কন্যাকে বুঝতে দেন না। শেষ মুহূর্তে শিব যখন পদ্মাকে বনবাসে রেখে আসেন, সেই মর্মান্তিক মুহূর্তটিই তার প্রমাণ। কন্যাকে নিজের কোলে শিব ঘুম পাড়িয়ে সেখান থেকে সরে আসেন ---এ যেন এক চরম ব্যথিত চিত্র। শেষ মুহূর্তে কন্যার চোখের জল পিতা হয়তো সহ্য করতে পারবেন না --- তাই কবি এরকমভাবে তাদের বিচ্ছেদ করিয়েছেন।

''দূর্গার বচনে শিব লজ্জা বড় পাইল।
পদ্মাকে নইঞা শিব বনমধ্যে গেল।।
সেখানে বসিল শিব পথশ্রম হৈঞা।
নিদ্রাগত হৈলা দেবী উরে শির দিঞা।।
জখন দেবী পদ্মাবতী নিদ্রাতে পড়িল।
শিকড়েত মাথা থুঞা উরু কাঢ়ি নিল।।'' (পৃ-২৬)

শুধু এখানেই নয়, দেবখণ্ডের শেষ দিকেও মনসা ও দুর্গার দ্বন্ধ লক্ষ্য করা যায়। সমুদ্র মন্থনে হলাহল (বিষ) পান করে শিব যখন অচৈতন্য, তাকে বাঁচানো অসম্ভব তখন নারদের প্রচেষ্ঠায় দুর্গা 'সিয়লি' পর্বত থেকে মনসাকে সমস্ত বিবাদ ভুলে গিয়ে শিবকে বাঁচানোর অনুরোধ করেন। তাতে মনসার একটি শর্ত ছিল যে সে দুর্গার (সতাইমা) কোলে করে সেখানে যাবেন। দুর্গাও বাধ্য হয়ে কোলে করে তাকে শিবের নিকট পৌঁছে দেন। মনসা শিবের অচৈতন্য অবস্থা দেখে তার সমস্ত বিষ লেহন করে নেন, তাতে শিব প্রাণ ফিরে পান। এমতাবস্থায় শিব মনসাকে বরদান করলে দেবসমাজে মনসা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে নৃত্য করতে শুরু করেন। এই নৃত্যে সে এতটাই মাতোয়ারা হয়ে যান যে তার গায়ের বস্ত্র বাতাসে উড়ে সে উলঙ্গ হয়। এমন দৃশ্য দেবসমাজে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

''নাচিতে নাচিতে দেবী আনন্দিত হৈল।
দেবীর গায়ের বস্ত্র বাতাসে উড়িল।।
তাহা দেখি নারদ মুনি বোলিতে নাগিল।
হেন ছার কন্যা দেবের সভা হাসাইল।।
এমত নিল্লজ্জ কন্যা আছে কার ঘরে
বিবস্ত্র হইঞা নাচে দেবর গোচরে।।'' (পৃ-৫৪)

পরে নারদের কথা শুনে মনসা লজ্জিত হন। কিন্তু তার এই অবস্থা দেখে দুর্গা আবার ক্রোধান্বিত হলো এবং তাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দেন।

''ক্রোধ হইল দুর্গা দেবী অতি খরতর।
নিল্লজ্জ হইঞা নাচে বেটি সভার ভিতর।।
সিয়লি পর্ব্বত হৈতে আনিলা জাঞা।
তোর রূপ দেখি ভাঙ্গরা বসিল উঠিঞা।।
মায়া করি ভাঙ্গরা পড়িঞা জে আছিল।
তোমাকে দেখিয়া শিব উঠিঞা বোসিল।।'' (পৃ-৫৪)

এসব কথা শুনে মনসা এবার স্থির থাকতে পারেননি। পূর্বে অনেক কিছু বললেও মনসা তাতে কিছু মনে করেননি। কিন্তু এবার সে ছেড়ে দেবার পাত্রী নন। তাই সে প্রতিহিংসা পরায়ন হয়ে ওঠেন এবং ফলস্বরূপ আবার সে নিজ মূর্তি ধারণ করেন।

''ক্রোধ করি পদ্মা দেবী হংসেতে চড়িল
উঘারিঞা দিল বিষ শিব টলি পৈল।।'' (পৃ-৫৪)

এতে শিব আবার অচেতন হয়ে পড়েন। পরে দুর্গার কথায় নয়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু সহ দেবসমাজের সকলের অনুরোধে মনসা এসে পুনরায় পিতাকে পুনর্জন্ম দান করেন।

যে কোনো নারীর কাছে সতীন সমস্যা চিরকালের। কোনো নারীই নিজ স্বামীর সঙ্গে অন্য অপরিচিত নারীর মেলামেশাকে সহ্য করতে পারেন না। যতই সে স্বামীর নিকটাত্মীয় হোক না কেন। এক্ষেত্রে দুর্গার এমন (পদ্মা ও শিব সম্পর্ক) ভাবাটা অতিকথন নয়। কেননা শিবের কামুক চরিত্র, সে সম্পর্কে দুর্গা ওয়াকিবহাল। শিবের সঙ্গে অন্য নারীর সম্পর্ক থাকাটা যে অস্বাভাবিক নয়, সেটাও দুর্গার জানা। তাই শিবকে মাঝখানে রেখে মনসার সঙ্গে দুর্গার এই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে কবি এক চিরন্তন দাম্পত্য সম্পর্কের টানাপোড়েনকেই উপস্থাপন করেছেন। যার মধ্য দিয়ে পুরুষকেন্দ্রিক সমাজে শিবের স্ত্রৈনতার দিকটিই প্রকাশ পায়।

নীলকণ্ঠ শিব ঃ

শিব সমুদ্রমন্থনজাত বিষ পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছেন এবং সেখান থেকে শিবকে বাঁচানোর জন্য মনসার আগমন অনেকটা বাস্তবসম্মত। কেননা এটি প্রত্যেকটি সন্তান-সন্ততির কর্তব্য। যা উত্তরবঙ্গের ধারায় আর অন্য কোনো মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়নি। সমুদ্রের জল শুকিয়ে গিয়ে তা যখন দুধে পরিণত হয়, তখন একটি টিয়াপাখি ঠোঁটে তেঁতুল নিয়ে সমুদ্রের উপর দিয়ে ছুটছিল।

টিয়া পাখির এমন অবস্থা দেখে পিছন থেকে আর একটি শুয়াপাখি তাকে ধাওয়া করেছিল। এবং মাঝসমুদ্রের উপরে এসে তাদের যুদ্ধের ফলে চঞ্চুচ্যুত তেঁতুল দুধময় সমুদ্রে পড়ে যায়। ফলে সমুদ্রের সমস্ত দুধ দধিতে পরিণত হয়। এমন সময় সমুদ্রতীরে কুশ তুলতে গিয়ে নারদ দেখতে পান যে ক্ষীরোদ সাগর দধিময় হয়ে গেছে। তখন এই খবর দেব সমাজে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে গিয়ে দেন। পাশাপাশি নারদ সেই ক্ষীরোদ সাগর মন্থন করে ধন আহরণ করার পরামর্শ দেন।

''এতেক বচন জদি নারদ কহেন।
ক্ষীরোদ সাগর মথি সভে লেহ ধন।।
নারদের বচনে দেব হৈলা হরষিত।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সাজে হৈএঞা আনন্দিত।।'' (পৃ-৪৩)

নারদের পরামর্শ মতো ত্রিশকোটি দেবতা সাগর মন্থনে উপনীত হন। কিন্তু সাগর কিভাবে মন্থিত করা হবে, এ বিষয়ে ব্রহ্মা কোনো সদুত্তর খুঁজে পান না। তাই ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে এই প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিষ্ণু তার সৎপরামর্শ দেন। এবং বিষ্ণুর কথা মতো দেবতারা সুমেরু পর্বতকে এবং বাসুকী গিরিকে খুঁজে নিয়ে আসেন। দেবতারা তখন বাসুকীর লেজ ও অসুরের মাথা টেনে ধরেন এবং ধর্মের নাম স্মরণ করে দেব ও অসুর মিলে সমুদ্র মন্থন শুরু করেন। এই মন্থনে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর উদ্ভব হয়। শুধু তাই নয়, মন্থনের ফলে ব্রহ্মার ভাগে হংস, ইন্দ্রের ভাগে ঐরাবত এবং শিব বৃষ সহ ত্রিশূল পান। এছাড়াও সমুদ্র মন্থনে চন্দ্র, কামধেনু, আর ভয়ঙ্কর তনু ওঝা ধন্বন্তরি উত্থিত হয়। সাগরমন্থনে সকলে শ্রমযুক্ত হয়ে কাছি ছেড়ে দেন, ফলে 'জাটি' গিয়া সপ্ত পাতালে প্রবেশ করে। তখন আবার সকলে মিলে সেই জাটিতে টান দেন। তখন বিষের নান্দিয়ায় জাঠি ঘুরে বিষ উত্থিত হয় —

''পুনর্বার সভে মেলি মথিতে লাগিল।
হেনকালে হাতে হৈতে কাছি ছুটি গেল।।
কাছি ছুটিল জাঠি পাতাল ভেদিল।
বিষের নান্দিএঞায় গিএঞা সে জাঠি ঠেকিল।।
জখনেতে সেই জাঠি বিষেত ঠেকিল।
হেনকালে সভ মেলি এক টান দিল।।
বিষের নান্দিএঞায় নাগি জাঠি জে ঘুরিল।
মহাশব্দে উথলিএঞা সে বিষ উঠিল।।'' পৃ-৪৫

এই বিষ উত্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভূবন অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এরূপ অবস্থা দেখে অসুর এবং সকল দেবতারা পালিয়ে ব্রহ্মার কাছে আশ্রয় নেন। তখন ব্রহ্মার বাক্য শুনে বিষ্ণু নিজের চক্রবান ছেড়ে দেন। তাতে সমস্ত বিষ চার খণ্ড হয়ে ভূমিতে পরে যায়। যার একভাগ জীবজন্তুকে, একভাগ অষ্ট নাগকে, একভাগ তৃণাদিতে এবং আর একভাগ শিব নিজে ভক্ষণ করেন। এই বিষ ভক্ষণ করার পর শিব নীলকণ্ঠ হয়ে মৃতপ্রায় হয়ে যান। যা দেখে স্বর্গের ত্রিশকোটি দেবতা বিষাদময় হয়ে যান, নারদও কৈলাসে গিয়ে দুর্গা এবং গঙ্গাকে এই খবর প্রদান করেন। এই খবর শুনে গঙ্গা, দুর্গা, কার্তিক,গণেশ সকলে মৃতপ্রায় শিবের কাছে উপস্থিত হন এবং বিষন্ন বদনে সেখানে তারা কি করবেন ভেবে না পেয়ে দেবতাদের উপদেশে নারদকে সহ দুর্গাকে সিয়লি পর্বতে পাঠানো হয়। কেননা, সেখানে মনসা অবস্থান করেন। সেখান থেকে এই মনসাকে নিয়ে এলে তবেই সে শিবের বিষ হরণ করতে সক্ষম হবেন এবং শিব পুনর্জন্ম লাভ করবেন।

মনসার বিবাহ ও পূজা প্রচার ঃ

এই অংশে শিবপ্রসঙ্গ খুব সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। একজন কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহস্থ পিতার যা কাজ শিব এখানে সেই ভুমিকাই পালন করেছেন, নারদের প্রচেষ্ঠায় জরৎকার মুনির সঙ্গে মনসার বিবাহ সম্পন্ন হয়। সেখানে শিব একজন পিতা হিসেবে জরৎকারু মুনির কাছে কন্যাদান করেন।

''তবে কোন কর্ম্ম করে ভোলা মহেশ্বর।
জরৎকার মুনিকে আনিলা নিজ ঘর।।
শাস্ত্রের বিধানে তার করি মঙ্গল।
দেবপূজা পিতৃপূজা করিল সকল।।
মুনি যজ্ঞ জ্বলিল নারদ ব্রহ্মা আইল।
জরৎকার হস্তে কন্যা উৎসর্গিঞা দিল।
কন্যাদান করে শিব আনন্দিত মন।
যৌতুক করিঞা দিল জত দেবগণ।।'' (পৃ-৫৯)

শুধু এখানেই শেষ নয়, শিব কন্যাকে দান করার পর উপহার সামগ্রী দিতেও ভুলে যাননি। অবশ্য এখানে শুধু পিতা শিবই নয়, পিতা শিব যেমন একটি রাজ্য ও পাত্র নেতাই কে কন্যার হস্তে উপহার হিসেবে তুলে দেন। ঠিক তেমনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বাসুকী প্রমুখ দেবতারা মূলত হংস ও রাজমণি, শঙ্খ, অষ্ট অলংকার, সাতলহরী হার প্রভৃতি দান করেন।

৩. মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শিব

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রধান দেবী হলেন চণ্ডী। এই চণ্ডী মূলত লৌকিকদেবী রূপেই পরিচিত। চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বলতে আমরা মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যকেই বুঝি। কিন্তু প্রদীপ জ্বালানোর আগে সলতে পাকানোর কাজ যেমন থাকে ঠিক তেমনি মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যের কথা বলতে গেলে মাণিকদত্তের প্রসঙ্গ আসে। মনসামঙ্গল কাব্যধারায় আদি কবি যেমন কানাহরি দত্ত, ঠিক তেমনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারার আদি কবি মাণিকদত্ত। আশুতোষ ভট্টাচার্য এই চণ্ডীর প্রকৃতি প্রসঙ্গে লিখেছেন ''বাংলা লৌকিক শক্তি দেবতাদিগের মধ্যে চণ্ডীর প্রকৃতিই সর্বাপ্রেক্ষা জটিল। ইহার কারণ, বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থা হইতে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সকল স্ত্রী দেবতার পরিকল্পনা করা হইয়াছিল, তাহাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছে।''[৪০] সমগ্র উত্তরবঙ্গ তথা পশ্চিমবঙ্গে আমরা এই লৌকিক দেবী চণ্ডীর পূজার প্রচলন দেখতে পাই। তবে তা ভিন্ন ভিন্ন নামে পূজিত হয়ে থাকে। যেমন নাটাই চণ্ডী, মারাই চণ্ডী, সুবচনী, উরণচণ্ডী প্রভৃতি নামে। জানা যায় ছোটনাগপুরে ওরাওঁ জনজাতি 'চাণ্ডী' নামে এক দেবীর পূজা করতো। এই দেবী মূলত শক্তির দেবী। মনে করা হয় এই 'চাণ্ডী' দেবীই 'চণ্ডী' দেবীতে পরিণত হয়েছেন। এই চণ্ডীকে একসময় শুধু ওরাওঁ জনজাতির মানুষেরা পূজা করতো, বর্তমানে তা বিভিন্ন জাতি জনজাতির মধ্যে বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে। তবে 'চাণ্ডী' নামক শব্দটি অষ্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা থেকেই এসেছে বলে অনেকেই মনে করেন।[৪১] এই চণ্ডী দেবী ছিলেন একসময় উগ্র দেবী। যা দেবীর নাম থেকেও স্পষ্ট। শিকারজীবী মানুষদের দেবতা হিসেবেই চণ্ডী বেশি পরিচিত ছিলেন। তাই কোনো শিকারী শিকারে গিয়ে মাঝে মাঝেই বিপদে পড়তেন এবং ভয়ঙ্কর বন্য পশুর হাতে তাদের নির্মম মৃত্যু ঘটতো। তখন তারা মনে করতেন এখানে চণ্ডী নামক দেবতার ছলনা আছে। তখন তারা এই দেবতার আশ্রয় নিতেন এবং এই দেবতাকে বিভিন্ন পশুকুলের দেবতার প্রতীকরূপে পূজা করতেন। এ বিষয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন — ''বাংলা মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী যে ব্যাধ ও পশুকুলেরই দেবতা, কালকেতুর কাহিনী হইতে তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়।''[৪২] অর্থাৎ দেবী চণ্ডী অমঙ্গলের দেবতা হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। তাই তাকে প্রসন্ন করার জন্য পূজা করা হতো। পরবর্তীকালে অমঙ্গল তথা অশুভ কোনো ঘটনা ঘটলেই তা মঙ্গলময় করার জন্য এই দেবীর পূজা করা হতো। এভাবেই দেবী চণ্ডী ধীরে ধীরে একটা জাতি-জনজাতি থেকে আর একটা জাতি-জনজাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েন। আর প্রথমাবস্থায় দেবী চণ্ডী যেহেতু ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূজিত ছিলেন না তাই এই দেবীর পরিচয়

চতুর্বেদেও পাওয়া যায় না। এমন কি রামায়ণ-মহাভারতেও পাওয়া যায় না। আর্যেতর দেবতা শিবের সঙ্গে এই দেবী জড়িয়ে গিয়েই পরবর্তীকালে পৌরাণিক সাহিত্যে প্রবেশ করে। তবে তার সংখ্যা এবং বিস্তারও খুব বেশি নয়। মূলত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এরপর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়।[৪৩]

মাণিকদত্তের ব্যক্তি পরিচয় ঃ

মাণিকদত্ত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায় উত্তরবঙ্গের একজন অন্যতম কবি। মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতির উদ্যোগে মাণিকদত্তের পুথিটি অষ্টমঙ্গলার পালায় রচিত। ড. সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত 'মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থটিতে এক মঙ্গলবারের রাত্রির পালা থেকে শুরু করে পরের মঙ্গলবারের রাত্রির পালায় শেষ হয়। ড. সুনীল কুমার ওঝা সম্পাদিত কাব্যটিকেই আকড় গ্রন্থ হিসেবে এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই শিব চরিত্রকে ব্যক্ত করতে গিয়ে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলি এখান থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। [৪৪] সমগ্র কাব্যটির তিনটি ভাগ রয়েছে — সৃষ্টিকথা তথা দেবখণ্ড, ফুল্লরা ও কালকেতু কথা বা আক্ষটিখণ্ড এবং ধনপতি, লহনা ও খুল্লনা কথা বা বণিকখণ্ড। মূলত দেবী চণ্ডীর মর্ত্যে পূজা প্রচারই এই কাব্যের মূল কথা। একারণে দেবী চণ্ডী পদ্মার উপদেশ নিয়ে ফুলফুল্যা নগরের অধিবাসী মাণিকদত্তকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং দেবীর মাহাত্ম্য প্রচার করতে বলেন। পদ্মা যে উপদেশ দেয় তা কাব্যের বুধবারের দিবসের পালায় উল্লিখিত আছে এবং এই পালা থেকেই কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

''দুর্গা বোলে পদ্বা বাছা কলির প্রথম।
নরলোকে কলিঙ্গ দেশেত পূজা কৈল।।
দুর্গা বোলে পদ্বা বাছা শুনহ বচন।
সুযুক্তি দেহ বাছা করিব কেমন।।
পদ্বা বোলে শুন মা সর্ব্বমঙ্গল।
মানিক দত্ত কানা খোড়া ফুলফুল্যানগর।।
তাকে স্বপ্ন দেখাহ সর্ব্বমঙ্গল।
তোমার গীত গান করুক পৃথিবী ভিতর।।'' পৃ-৩৩

— এখান থেকে আমরা জানতে পারি মাণিকদত্ত ছিলেন ফুলফুল্যানগরের বাসিন্দা। যিনি মনসা মঙ্গলের আদি কবি কানা হরিদত্তের মতো অন্ধ এবং খোড়া ছিলেন। এরপর আমরা দেখতে পাই দেবীর স্বপ্নাদেশ, যে স্বপ্নাদেশের মধ্য দিয়ে কবি দৃষ্টি ফিরে পান এবং তাঁর বিকৃত অঙ্গ সচল হয়।

এই সময় দেবী স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে কবিকে কলিঙ্গ মাঝারে পুথি পড়ে গান করার আদেশ করেন। যার পরিচয় আমরা কাব্য মধ্যে পাই —

''মানিক দত্তের শিরে নাথীকার ঘা।
কানাখোড় দূর গেল দিব্ব্য হৈল গা।।
চাও বাছা মানিক দত্ত পাএ কর বল।
আমার মঙ্গল পুঁথি শিওর উপর।।
আমি দুর্গামঙ্গল পুঁথি দিলাঙ তো তোমারে
পুঁথি পড়ি গান কর কলিঙ্গ মাঝারে।।'' পৃ-৩৪

দেবীর কৃপায় কবি দৃষ্টি লাভ করেন এবং পা স্বাভাবিক হয়। তদুপরি দেবীর দেওয়া পুথি মাণিকদত্ত পড়তে পারেন না। কেননা তিনি পড়াশুনা জানতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি গায়েন ছিলেন। বিভিন্ন গ্রামে গীত পরিবেশন করাই তার মূল কাজ ছিল। কিন্তু দেবী প্রেরিত চণ্ডী পুথি তিনি পড়তে না পারায় ব্যথিত হন। তখন আবার দেবীর স্বপ্নাদেশে তিনি অক্ষর জ্ঞান লাভ করেন —

''এমন পুস্তক আমি না পারি পড়িতে।
বান্ধিলো মঙ্গল পুঁথি সাধ নাই মোর গীতে।।
অন্তরে জানিল মা মঙ্গলচণ্ডীগণ।
পুনুরূপী মানিক দত্তে দেখাল্য স্বপন।।
শুন বাছা মানিক দত্ত না কর সংশয়।
রটীয়া করহ পুঁথি ভূবন বিজয়।'' পৃ-৩৫

এরপর আমরা দেখি দেবীর সমস্ত রকম কৃপা পেয়ে কবি দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের গান গাওয়ার উদ্দেশ্যে দল গঠন করেন এবং দেবীর কথা রাখার জন্য কলিঙ্গ নগরে প্রবেশ করেন —

''তম্বুর বায়ন তথা দিল দরশন।
রঘু বাঘব পালী আইল দুইজন।।
তিন চারি জনে তবে সম্প্রদা করিল।
কলিঙ্গ নগরে দত্ত আমি উত্তরিল।।
প্রথম মঙ্গল বারে বারি স্থাপন করিয়া।
ভবানীর মঙ্গলগান পঞ্চম আলাপিয়া।।
কার না লয় অর্থ কার না লয় ধন।
গীতে মোহিত হৈল সর্ব্বলোকের মন।।'' পৃ-৩৫

— এখান থেকে স্পষ্ট যে তম্বুর বায়ন ছাড়া গান করার জন্য কবির দুজন দোহার ছিল। তাদের নাম রঘু এবং রাঘব। এদের সহযোগিতায় কবি কলিঙ্গ নগরে চণ্ডী গান করেন এবং খুব অল্প সময়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এতে গান শোনানোর জন্য কোনো অর্থ বা ধন তিনি দাবি করেননি। তার গানে সেখানকার প্রজাগণ এতটাই মুগ্ধ যে তারা রাজার দরবারে পর্যন্ত যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। এ কথা রাজার কানে যাওয়া মাত্র রাজা কবিকে বন্দি করে রাখেন। তাতে রাজা যে যুক্তি প্রদর্শন করেন তা হল —

''রাজা বোলে মিথ্যা গীতে লোকের গেল কাজ।
মিথ্যা গায়ন কর বেটা কলিঙ্গের মাজ।।'' পৃ-৩৬

পরে অবশ্য দেবীর কৃপায় কবি ছাড়া পান। লক্ষণীয় কলিঙ্গ রাজাকে যখন কবি নিজের পরিচয় দেন সেই সময় তিনি আর একবার তাঁর জন্মস্থান হিসেবে 'প্রফুল্লনগর' এর কথা তুলে ধরেন। সেদিক থেকেও মনে করা হয় তিনি এই স্থানের মানুষ। পরিচয় অংশে তিনি বলেন —

''মানিক দত্তেক দেখি রাজা কুপিত হইল।
রাজার গোচর প্রজা সকল আইল।।
রাজা বোলে মানিক দত্ত কোন দেশে ঘর।
দত্ত বোলে আমার বাড়ী প্রফুল্লা নগর।।'' পৃ-৩৬

এই সূত্রটি ছাড়াও সমস্ত কাব্যপাঠে মনে হয় মাণিকদত্ত প্রাচীন গৌড় বা মালদহ অঞ্চলের লোক ছিলেন। কেননা, অধুনা অখণ্ড বাংলার মধ্যে একমাত্র মালদহ জেলাতেই তাঁর কাব্য প্রচলিত আছে। এছাড়াও তাঁর কাব্যে যে সমস্ত ভূ-খণ্ডের উল্লেখ আছে সেগুলিও মালদহ জেলার প্রাচীন গৌড়েই অবস্থিত। এছাড়াও কাব্য মধ্যে মোড় গ্রাম, ছাত্যা ভাত্যা, বড় গাছা, আবালা, গঙ্গা, কাঞ্চননগর, সন্ন্যাসীপাটন -- প্রভৃতি স্থাননামের উল্লেখ প্রাচীন গৌড়ের ইতিহাসেরই পরিচয় বহন করে। ছাত্যা ভাত্যা বা ছেতেভেতের বিল গৌড়ের পূর্বদিকে অবস্থিত একটি সুবৃহৎ বিল। জানা যায় এই বিল পদ্মার গর্ভ থেকে জন্মেছে। এছাড়াও চণ্ডীর বর্ণনায় মাণিকদত্ত এক জায়গায় বলেছেন —'মাজাখানি দেখি তার কেন্দুয়ার নালা'। এই কেন্দুয়ার নালার সঙ্গে এখানে দেবী চণ্ডীর কোমরের বর্ণনা করা হয়েছে। এই কেন্দুয়ার নালা মালদহ জেলায় অবস্থিত। এছাড়া কাব্য পাঠে দেখা যায় ধনপতি সদাগর যখন গৌড় ত্যাগ করে চলে যান সেই সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

''তোর রূপ দেখি মোর স্থির নহে মন।
গৌড় রাজ্য ছাড়ি আলাঙ তোমার কারণ।।'' পৃ-২৩৬

কিংবা,

''বিভা করি গৌড়ে আল্যে গড়িতে পঞ্জর।
লণ্ড ভণ্ড হইলো সকল বাড়ি ঘর।।'' পৃ-২৩৮

এখানে যে 'গৌড়ের' কথা বলা হয়েছে সেটিও মালদা জেলায় অবস্থিত। সুতরাং আমরা 'প্রফুল্লনগর' বাদ দিয়েও যে সমস্ত জায়গার নাম পাই তাতে মনে হয় কবি সেই অঞ্চলের মানুষ না হলে সেইসব ভূ-খণ্ডের এমন ভাবে বর্ণনা করতে পারতেন না। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁকে মালদহের কবি বলে মনে করেন। ''প্রাপ্ত পুঁথি সম্বন্ধে নানা সংশয় থাকিলেও কবির ব্যক্তিগত পরিচয় ও আবির্ভাব-কাল লইয়া কিছু কিছু আলোচনা হইয়াছে। পুঁথি দুইখানি মালদহ হইতে পাওয়া গিয়েছে; এখনও মালদহে এই কাব্য উৎসব-অনুষ্ঠানে গীত বা পঠিত হইয়া থাকে। উপরন্তু ইহাতে যে সমস্ত গ্রাম, নদনদী, মঠ-মন্দিরাদির উল্লেখ আছে, তাহাতে মালদহের দাবি অগ্রগণ্য হইবে।''[৪৫] তাই পরিশেষে বলা যায় মাণিকদত্ত মালদহ জেলার প্রফুল্লনগর বা 'ফুলফুল্যানগর' এর অধিবাসী ছিলেন। এই প্রফুল্লনগর বা ফুলফুল্যানগর বর্তমানে ফুলবাড়ি গ্রামে পরিণত হয়েছে। ফলে অধুনা আরও সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ড. আদিত্যকুমার লালা এই সমস্যার কথা উল্লেখ করেন। তাঁর মতে অধুনা মালদহে চারটি ফুলবাড়ি পাওয়া যায়, এর মধ্যে মাণিকদত্তের জন্ম কোন গ্রামে তা নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়। তিনি বলেন — ''মালদহ জেলায় বর্তমানে চারটি ফুলবাড়ী গ্রামের অস্তিত্ব আছে। একটি চাঁচল থানার কলিগ্রাম নিকটস্থ ফুলবাড়ী গ্রাম এবং অপর তিনটি হল — এক. ইংরেজবাজার পৌরসভার অন্তর্গত ফুলবাড়ী, দুই. গৌড়ের অদূরে কমলাবাড়ি যদুপুরের নিকটস্থ ফুলবাড়ী গ্রাম এবং তিন. ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত অমৃতির পাশের গ্রাম নঘরিয়া ফুলবাড়ী। তবে গ্রামটি পরিদর্শন করে দেখেছি, দেবী দুর্গার মন্দিরের গায়ে, শিব ও চণ্ডী মন্দিরের গায়ে এবং মনসা মন্দিরের গায়ে ফুলবাড়িয়া স্থাননামের উল্লেখ আছে। তবে 'ফুলবাড়িয়া' ও 'ফুলবাড়ী মূলত একই। এই চারটি ফুলবাড়ী গ্রামের মধ্যে চাঁচল থানার ফুলবাড়ি ও ইংরেজবাজার পৌরসভার অন্তর্গত ফুলবাড়ীতে যে কবি মাণিকদত্তের বাসস্থান ছিল না এব্যাপারে আমরা নিঃসন্ধিগ্ধ। মাণিকদত্তের কাব্যে যে সব আভ্যন্তরীণ উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায় এই দুই গ্রামের সঙ্গে তার কোনো যোগসূত্র নিরূপণ করা যায় না। তাহলে আমাদের সামনে থাকল দুই ফুলবাড়ী গ্রাম। এক. কমলাবাড়ি ফুলবাড়ী ও দুই. নঘরিয়া ফুলবাড়ী।''[৪৬] সুতরাং যে ফুলবাড়িতেই মাণিকদত্তের বাসস্থান হোক না কেন, তা যে মালদহ জেলাতেই অবস্থিত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাই বলা যায় মাণিকদত্ত উত্তরবঙ্গেরই কবি।

মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সৃষ্টিতত্ত্বে শিব ঃ

মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য মূলত তিনটি ভাগে বিভাজিত হয়েছে। লক্ষণীয় এই তিনখণ্ডের মধ্যে দেবখণ্ডেই আমরা শিব চরিত্রের বিস্তৃত সাক্ষাত পাই, বাকি দুই খণ্ডে প্রসঙ্গত শিবের কথা আসে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে এই সৃষ্টিতত্ত্বের কথা সেভাবে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন — ''কবি বর্ণিত সৃষ্টিলীলা সত্যই উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বৌদ্ধমতাশ্রিত ধর্মমঙ্গল কাব্যের প্রারম্ভে নিরঞ্জন ও আদ্যাদেবীর বিস্তৃত পরিচয় আছে। ঐ ধরনের সৃষ্টিতত্ত্ব একদা বৌদ্ধ-প্রভাবিত বাংলাদেশে সুপ্রচলিত ছিল। অন্যান্য কাব্যেও ইহার অল্পাধিক প্রভাব পড়িয়াছিল। মুকুন্দরাম মহাদেবের বর্ণনায় 'নিরঞ্জন নিরাকার' (বঙ্গবাসী সংস্করণ) - এর উল্লেখ করিয়াছেন, দিগবন্দনায় 'আদিদেব বন্দিব ঠাকুর নিরঞ্জন' এবং 'বৌদ্ধরূপে বন্দিবঠাকুর জগন্নাথ' বলিয়াছেন। দ্বিজমাধবও মঙ্গলচণ্ডীর গানে যে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন, তাহাতেও ধর্মমঙ্গলের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে।''[৪৭] এছাড়া বিপ্রদাস পিপলাই এর গ্রন্থেও এই সৃষ্টিতত্ত্বের পালা দেখা যায়।

পুরাণে উল্লেখ আছে যে সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণের সহায়তায় দৃষ্টিগ্রাহ্য সব বস্তুর সৃষ্টি। অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এই তিনগুণের আধার। পরবর্তীকালে মঙ্গলকাব্যের কবিরা এই সৃষ্টিতত্ত্বের অনুকরণে 'সৃষ্টিপত্তন' অংশের বর্ণনা করেন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি মাণিকদত্ত তাঁর গ্রন্থের প্রারম্ভে এই সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করেছেন। গতানুগতিক অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো তার কাব্যে দেববন্দনা পাওয়া যায় না। মাণিকদত্ত যে সৃষ্টিতত্ত্বের কথা বর্ণনা করেছেন সেখান থেকে জানা যায় যে শূন্যে মাংস পিণ্ডরূপে ধর্মের জন্ম হয়। এই সময় ধর্ম জীবসৃষ্টির কারণে মায়ারূপ ধরেন এবং মাংস পিণ্ডের আকারে শূন্য থেকে গোলক অভিমুখে ধাবিত হন। এই সময় তাঁর দেহে চোখ, কান, নাক প্রভৃতি মানব অঙ্গের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

''হস্ত নাহি পদ নাহি কন্ধে নাহি মাথা।
হে রূপে জন্মিল ধর্ম্ম তার শুন কথা।।
আচম্বিতে ধর্ম্ম গোলোক ধিআইল।
চক্ষু কান নাক আদি সকল হইল।'' পৃ-১

এরপর আমরা দেখি ধর্ম জল মধ্যে যোগ নিদ্রা দেন। নিদ্রা ভঙ্গ হলে ধর্ম উলুককে দেখতে পান। তখন ধর্ম উলুককে জিজ্ঞাসা করেন কতদিন থেকে সে ধ্যানে মগ্ন আছেন? উলুক তখন এর সদর্থক উত্তর দিতে না পেরে ধর্মকে পৃথিবী সৃষ্টির জন্য অনুরোধ করেন —

''উলুক বোলে চোদ্দ যুগ গেল ব্রহ্ম গিয়ানে।
তখন আছিলাঙ আমি মন্ত্র ধিআনে।।

উলুক বলেন ধর্ম্ম শুন তত্ত্বসার।
তুমি সৃষ্টি কর ধর্ম্ম সকল সংসার।।
উলুকের কথাএ ধর্ম্ম ভাবিল তখন।
সৃষ্টি করিতে ধর্ম্ম করিলেন মন।।'' পৃ-১

এরপর ধর্মের সৃষ্টি কাজ চলতে থাকে। প্রথম পর্যায়ে ধর্ম মন্ত্র জপে পদ্ম ফুল সৃষ্টি করেন। এবং সেই ফুলের উপর আদ্যমূল জপ করেন। এরপর জপ শেষ হলে ধর্ম পাতালে প্রবেশ করেন এবং সেখানে গিয়ে মৃত্তিকা সৃষ্টি করেন। সেই মৃত্তিকা খণ্ডকে ধর্ম হাতের মধ্যে রেখে নখ দিয়ে চাপ দেন, এতে মৃত্তিকা খণ্ড তিন ভাগ হয়ে যায়। এবার এই মৃত্তিকা পিণ্ডগুলিকে কার উপর রাখবেন এ নিয়ে ধর্ম দুঃশ্চিন্তায় পড়েন। সেই দুঃশ্চিন্তা দেখে বরাহের আবির্ভাব হয়। বরাহ তখন পৃথিবীকে দণ্ডের উপর রাখেন। কিন্তু ধর্মের তা মনোঃপুত হয় না, তাই ধর্ম নিজেই গজরূপ ধারণ করে গজ পৃষ্ঠে পৃথিবীকে স্থাপন করেন। কিন্তু গজ কর্তৃক এই পৃথিবী রক্ষা করা কঠিন হয়ে যায়, তাই ধর্ম কুর্ম্মরূপ ধারণ করেন, এতেও পৃথিবী তথা বসুমাতা টলমল করে, তাই ক্রমে ক্রমে ধর্মের বাহন উলুক, গজ, কর্ম্ম এবং নাগের সৃষ্টি হয়। তখন নিরঞ্জন নাগের উপর পৃথিবীর ভার অর্পণ করেন। এই ভারে পৃথিবী সৃষ্টির পর ধর্ম চন্দ্র, সূর্য, স্বর্গ-মর্ত্য, পাতাল ইত্যাদি সৃষ্টি করবেন বলে ঠিক করেন। সেইসব কথা ভাবতে গিয়ে ধর্ম দীর্ঘ হাঁই ছাড়েন, আর সেই হাঁই থেকে আদ্যা জন্মগ্রহণ করেন। এই আদ্যার পরিচয় দিতে গিয়ে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ''মাণিকদত্তের কাব্যে এই আদ্যাই চণ্ডীতে পরিণত হইয়াছেন।''[৪৮] এই আদ্যা থেকে চন্দ্র, সূর্য, বৃক্ষ, স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল প্রভৃতি সৃষ্টি হয় —

''মনতে ভাবিঞা ধর্ম হাম্বি ছারিল।
ধর্ম্মের হাম্বিতে আদ্যা তখনি জন্মিল।।
হাম্বিতে জন্মিয়া আদ্যা পড়িল ভূমিতে।
উঠিয়া ডাণ্ডাল্য আদ্যা ধর্ম্মের সাক্ষাতে।।
আদ্যাকে দেখিল ধর্ম মনের হরিষে।
স্তনে হস্ত দিতে আদ্যা রূপবতি হাঁসে।
আদ্যের উরু ধরি ধর্ম্ম নখের রেখ দিল।
সংসারের স্ত্রী পুরুষ সেই হইতে হইল।।
নখের রেখ পাঞা রক্তমাংস হৈল।
চন্দ্র সূর্য্য আকাশে তাহাতে সৃজিল।।

নখের রেখ পাঞা পৈল কিছু ধার।

গাছ বৃক্ষ হৈল তাতে এ মেরু মন্দার।।'' পৃ-২, ৩

এইভাবে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল আবিষ্কার করার পর ধর্ম যোগাসনে আসীন হন। এদিকে যত দিন যাচ্ছে আদ্যা তত সুন্দরী হয়ে উঠছে। তাই ধর্মের যোগ শেষ হলে আদ্যাকে দেখে ধর্ম কামাসক্ত হয়ে পড়েন। এবং আদ্যার রূপ-লাবণ্যে ধর্ম এতটাই মুগ্ধ হয়ে যান যে থাকতে না পেরে তার বীর্য স্খলন হয়। ধর্ম বাম হাতে ধরে সেই বীর্য তিন জায়গায় রাখেন। এই তিন স্থান থেকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উদ্ভব হয়।

''কাম চেষ্টাতে ধর্ম্মের বির্জ্জ টলিল।

বাম হস্তে ধরি ধর্ম্ম বির্জ্জ থুইল।।

তিন ভাগ করি বির্জ্জ তিন ঠাই থুইল।

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তিনের জন্ম হৈল।।'' পৃ-৩,৪

জন্মের পর এই তিন দেবতা নদী তীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তপস্যা শুরু করেন। তখন ধর্ম এদের পরীক্ষা করার জন্য শব রূপে জলে ভাসতে থাকেন। এভাবে প্রথমে সে ব্রহ্মার পাশে আসেন। তখন ব্রহ্মা শব পচার গন্ধ সহ্য করতে না পেরে উপরে উঠে যান। এভাবে ধর্ম বিষ্ণুর কাছে আসলে বিষ্ণুও তপস্যা ছেড়ে উপরে উঠে আসেন। সবশেষে ধর্ম শিবের ঘাটে গমন করেন। শিবও ব্রহ্মা কিংবা বিষ্ণুর মত ঘাট ছেড়ে উপরে উঠে আসেন কিন্তু তপস্যা ছাড়েননি। ধ্যান করার সময় শিব বুঝতে পেরেছেন যে শবরূপে পিতা ধর্ম তাঁর সামনে দেখা দিয়েছে। তাই শিব সেই শব দেহকে কাঁধে তুলে পাড়ে নিয়ে এসে সৎকার করার বাসনা প্রকাশ করেন। এমনকি শিব নিজের উরুতে উনুন করে সেখানে পিতা ধর্মকে দহন করেন।

''মরা দেখি শিব তিল কুশ ফেলি দিল।

তপস্যার ঘাট ছাড়ি উপরে উঠিল।।

ধ্যান করিঞা শিব পিতাকে চিহ্নিল।

মৃত পিতাকে শিব কান্ধে করি নিল।।

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

উলুক পক্ষ বলে শিব শুনহ বচন।

উরু স্থলে পিতাকে করাহ দহন।।

উরু স্থলে পিতাকে শিব করিল দাহন।

শূন্য থাকি ডাকিঞা বলিল ধর্ম্ম নিরঞ্জন।।'' পৃ-৪

শিবের কৃতকর্মে ধর্ম সন্তুষ্ট হন। তখন শূন্যে গিয়ে ধর্মের আদ্যার কথা মনে পড়লে ধর্ম শিবের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাবে শিব শর্তসাপেক্ষ রাজি হন।

''ধর্ম বোলে শিবের তরে বিভা কর আদ্যারে
এই কথা বলিএ তুমারে।
শিব বোলে শুন তুমি তবে বিভা করি আমি
আদ্যা যদি সাতবার মরে।।
সাতবার মরিব সাতখান হার লব
হার মালা গলাএ পড়িব।
আদ্যা দেহা ছাড়িএগ পুনুজন্ম লঅ গিএগ
তবে তাকে বিবাহ করিবো।।'' পৃ-৫

— অর্থাৎ আদ্যা যদি সাতবার মৃত্যু বরণ করে তবেই শিব বিবাহ করবেন। এতে সকলেই রাজি হন এবং আদ্যা বার বার জন্মগ্রহণ করে নিজেকে শিবের যোগ্য রূপে প্রস্তুত করেন। এই আদ্যাই যে চণ্ডী একথা আশুতোষ ভট্টাচার্যও স্বীকার করেছেন ''এই আদ্যাই চণ্ডী। চণ্ডীর উৎপত্তি নির্দেশ করিতে গিয়াই এই বিস্তৃত সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করা হইয়াছে।''[৪৯]

দুর্গার জন্ম ঃ

আদ্যা ক্রমে সাতবার জন্মগ্রহণ করেন, ক্রমান্বয়ে ভৃগু মুনি, যশোদা উদর, কুম্ভকারের ঘর, দক্ষ ঘর, হরিহর, হিমালয় প্রমুখদের ঘরে। সপ্তম জন্মে আদ্যা হিমালয় - মেনকা গৃহে দেবী দুর্গা বা চণ্ডী রূপে জন্মগ্রহণ করেন। এতে শিব পূর্বের শর্ত অনুযায়ী চণ্ডী বা দুর্গাকে বিবাহ করতে রাজি হন। এভাবে গৌরীর যত দিন যেতে থাকে তার রূপ ততই পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় বাড়তে থাকে। এদিকে গৌরীকে দিয়ে হিমালয় শিব পূজা করাতে থাকেন —

''রাজা বলে কন্যাকে শিব পুজিবারে।
পিতার আঙ্গাতে গৌরি শিব পূজা করে।'' (পৃ. ৮)

— অন্যদিকে বিবাহ সম্পর্কে শিবের কোনো হেলদোল দেখা না গেলে ব্রহ্মাসহ আদি দেবতারা শিবের সঙ্গে ছলনা করেন।

''ইন্দ্র ব্রহ্মা আদি করি জতেক দেবতা।
কামদেব ডাকিএগ কহিল সব কথা।।
ইন্দ্র বোলে কামদেব ছল গিএগ শিবে।

কাম চেষ্টা হৈলে শিব বিভা করে তবে।।'' পৃ-৮

শিবকে এভাবে ছলনা করার কারণ হল এই সময় শিব ধ্যানে মগ্ন। তাই কাম শরে এ্যস্ত করতে পারলেই শিবকে বিবাহ দেওয়া সম্ভব হবে, এজন্য স্বর্গের দেবতারা মদনদেবকে আহ্বান করেন। এই আহ্বানে মদনদেব সাড়া দিয়ে শিবকে কামবান নিক্ষিপ্ত করেন। এতে শিবের ধ্যানভঙ্গ হয়। তখন চোখ খুলে শিব কামদেব মদনকে দেখতে পান এবং তাকে ভস্মীভূত করেন। পরে অবশ্য মদন-স্ত্রী রতির অনুরোধে তার পুর্নজন্ম হয়।

অপরপক্ষে আমরা দেখতে পাই শিবকে বিবাহ করার জন্য দুর্গা কঠিন তপস্যায় রত হন। অন্নজল গ্রহণ করেন না, শীতের রাতে জলে শয়ন করেন, গ্রীষ্মকালে চারিদিকে আগুন জ্বেলে মাঝখানে বসে থাকেন। এই কঠিন তপস্যায় শিব দুর্গার ডাকে সারা না দিয়ে পারেননি। শিব দুর্গার এই তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাইলে দুর্গা শিবকে স্বামী হিসেবে পেতে চান। এতে শিব রাজি হলেও নিজ চরিত্রের নানান কথা ব্যক্ত করেন।

''শিব ঠাকুর বলে দুর্গা বর চাহ তুমি।
জে বর চাহিবা সেই বর দিব আমি।।
দুর্গা বোলেন এই বর চাহি আমি।
দআ করি মোর স্বামী হঅ প্রভু তুমি।।
শিব বোলে স্বামী হব দিলাঙ এই বর।
বলিএ তাহার কথা শুনহ উত্তর।।'' পৃ-৯

কোচবিহার জেলায় প্রচলিত কাত্যায়নি ব্রতকথাতেও আমরা দুর্গার এই অভীপ্সার কথা জানতে পারি। সেখানেও দুর্গা শিবকে স্বামী হিসেবে পেতে চান---

''পর্বতে বসিয়া গৌরী জোড় করি কয়
গৌরী জোড় করি কয়
মহাদেবের চিন্তা করি মহাদেবের ধ্যান ধরি
মাগে গৌরী বর রে, মাগে গৌরী বর।
পশুপতি পতিদেহ ওহে বিশ্বেশ্বর হে
ওহে বিশ্বেশ্বর ।''[৫০]

এরপরেই আমরা দেখি শিব নিজ চরিত্রের কথা ব্যক্ত করেন। শিব যেন এখানে গৌরীর সঙ্গে কোনো ছলনা করতে চাননি। কেননা শিবের মনে হয়েছে, তার চরিত্রের কথা নিয়ে বিবাহ পরবর্তী জীবনে অশান্তি হতে পারে, যা শিবের কাম্য নয়। এজন্য শিব নিজ চরিত্রের কথা নিজেই গৌরীকে

বলে দেন। এখানেই যেন শিব আর দেবতা হয়ে থাকেননি। একেবারে রীতিমতো মর্ত্য পৃথিবীর নর নারীতে পরিণত হয়েছেন। এমন কি শিব যে ভিক্ষা করে দিনযাপন করেন একথাও স্পষ্ট করে বলেছেন এখানে —

''ভিক্ষা করি খাই দারিদ্র বোলে লোকে।
কুনগুণে স্বামী করিতে চাহ মোকে।।'' পৃ-৯

এরপরেও আমরা দেখি গৌরী নিজ সিদ্ধান্তে অটল। সে শিবকেই বিবাহ করবেন।

শিবের প্রতি নারদ ও দেবতাদের প্ররোচনা ঃ

গৌরীর এমন সিদ্ধান্তে শিব তাকে বিবাহ না করে পারেন না। তাই গৌরীর পিতার কাছে প্রস্তাব পাঠানোর জন্য শিব নারদকে পাঠান। এবং নারদ সুচারুভাবে এই কার্যটি সম্পন্ন করেন এবং সে কার্যের ফলে হিমালয়ও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে যান —

''মুনি বোলে আছে তুমার কন্যা গৌরী।
বিবাহ করিতে তাক চাহেন ত্রিপুরারি।।
হিমালএ রাজা বোলে নারদ মুনিকে।
কন্যাদান দিব আমি শিব ঠাকুরকে।।'' পৃ- ৯-১০

ঠিক একই প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গের প্রচলিত 'কাতিপূজার গানে' দেখা যায়। সেখানেও শিবের বিবাহের জন্য নারদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এখানে বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য 'কাতিপূজার গান'টি তুলে দেওয়া হল।

''কেন ডাকেন নারদ ভাগিনা কহ মোরো আগে
পণ্ডিতের এই কথা শুনিয়া নারদ কহিতে লাগিল
শুন পণ্ডিত মশাই আমার মামার বিয়ের কাথা
কোন পাকে মামার বিয়া হবে লগ্ন দেখ গনিয়া
এই কাথা শুনিয়া পণ্ডিত চার কোণা গনে
পূব পশ্চিম উত্তর-দক্ষিন নাই শিবের জোড়া
দক্ষ রাজার বেটি আছে যুব্বে নারী হয়্যা
তার সাথে বুড়া শিবের আছে জোড়া
এই কাথা শুনিয়া নারদ বাড়িতে আসিল
বুড়া শিব কহে নারদ কিবা বচন শুনিল

নারদ বলে ওহে মামা
তোমার তানে মুনি করে চাইরো পাকে গননা
রূপার পাঞ্জি খুলিয়া দেখে মামা নাই তোমার জোড়া
এই কাথা শুনিয়া শিব মহা ক্রোধও হইলো
মামা বলে ওহে তুমি একবার শান্ত হও
শোনো মোরো কাথা
দক্ষ রাজার বেটি আছে যুব্বে নারী হয়্যা
দক্ষ রাজার বেটির সাথে আছে তোমার জোড়া
হাটিয়া গেইতে বুড়া শিবের হাটুর চাকা নড়ে
বিয়ার কাথা শুনিয়া বুড়া শিব খল খলেয়া হাসে
শুন শুন নারদ ভাগিনা না থাক নিশ্চিন্তে বসিয়া
শিগগির করি চলি যাও ব্রাহ্মণেরও বাড়ি
কাথা শুনিয়া নারদ সেখানে উপনীত হইলো।''[৫১]

এভাবেই নারদ কর্তৃক বিয়ের ঘটকালির কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর দেবসভায় নিমন্ত্রণ করার পালা। সেখানেও নারদের অগ্রণী ভূমিকা। নারদ শিবের কথামত সকল দেবতাদের বিয়েতে খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু এতে সকল দেবতাই অরাজি। কেননা, শিব যেভাবে ভূত-প্রেত নিয়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়ান তাতে তাঁর গৃহে কেউ খেতে আসবেন না। এতে দেবতারা একটি শর্ত দেন, শিব যদি গঙ্গাকে নিয়ে এসে রন্ধন করাতে পারেন তবে তারা সকলেই আসবেন।

''সকল দেবতাগণ মন্ত্রণা করিল।
শিবের আগে দেবগণ বলিতে লাগিল।।
প্রেত ভূত লঞা শিব থাক শ্মশানতে।
অন্নজল কে খাইবে তুমার গৃহতে।।
গঙ্গা আনিঞা শিব জদি করাহ রন্ধন।
তবেত তুমার ঘরে খাবে দেবগণ।।'' পৃ-১০

— একথা শিবের কর্ণগোচর হলে শিব গঙ্গাকে এনে রন্ধন করার কথা স্বীকার করেন। গঙ্গা তখন মর্ত্য পৃথিবীতে শান্তনুর গৃহে বাস করেন। শিব সেখানে গিয়ে গঙ্গাকে নিয়ে আসার জন্য শান্তনুর কাছে আবেদন করেন। শান্তনু শর্তসাপেক্ষ গঙ্গাকে পাঠাতে রাজি হন। শর্তটি হল রাতের মধ্যেই গঙ্গাকে ফেরত পাঠাতে হবে, নইলে শান্তনু গঙ্গাকে গ্রহণ করবেন না।

''তুমার নারী গঙ্গা যদি করএ রন্ধন।
তবেত আমার ঘরে খাত্র দেবগণ।।
মুনি বোলে শুন শিব বলিএ তুমারে।
এক রাত্রের তরে গঙ্গা আমি দিব তোরে।।
রাত্রি মধ্যে গঙ্গা আনিঞা দেহ তুমি।
প্রভাত হইলে গঙ্গা না লইব আমি।।'' পৃ-১০

শিব শান্তনু মুনির শর্তে রাজি হয়ে গঙ্গাকে নিয়ে কৈলাসে আসেন। সেখানে গঙ্গা রন্ধন করেন। তখন পরিকল্পনা মতো নারদের প্ররোচনায় ভোজন সভায় কোন্দল বাধে। এমন সময় সকলের ভোজ শেষ হলে কোন্দল চুড়ান্ত পর্যায়ে চলে যায় এবং রাত্রি প্রভাত হয়। সেই সময় শিব গঙ্গাকে নিয়ে শান্তনু মুনির কাছে এলে পূর্বশর্তসাপেক্ষ মুনি গঙ্গাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে গঙ্গা কাঁদতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাতেও কোনো ফল হয় না। তখন শিব গঙ্গাকে নিয়ে কৈলাসে ফিরে আসেন এবং গঙ্গাকে যথোচিত মর্যাদা দিতে চান এবং এই মর্যাদাস্বরূপ শিব গঙ্গাকে মাথায় বহন করেন।

''কথা শুনি কান্দে গঙ্গা মুনির সাক্ষাতে।
শিব বোলে গঙ্গা তোকে থুব আমি মাথে।।
জটাধারা হঞা গঙ্গা শিবের মাথে রৈল।
গঙ্গাকে লইঞা শিব কৈলাসতে আল্য।।'' পৃ-১১

—এজন্যই শিব গঙ্গাকে মাথায় বহন করেন। এভাবে দেবতা সকলের ভোজন সম্পন্ন হলে শিব নারদকে দিয়ে অধিবাসের সরঞ্জাম পাঠিয়ে দেন, অতঃপর শিব চণ্ডীর বিয়ে হয়। কিন্তু অধিবাসের এই সরঞ্জাম পাঠিয়ে দিয়ে শিব বিপদে পড়েন।

শিবের বিবাহযাত্রা ও বিবাহসভা ঃ

শিব বিবাহ করতে যাবার আগে বরবেশে যেমন নিজে সাজেন তেমনি সঙ্গে সঙ্গীদেরও সাজতে বলেন। হাড় মালা গলায় দিয়ে, জটার মধ্যে সর্প পেঁচিয়ে, জটা মাঝে গঙ্গাকে বসিয়ে, শিঙ্গা হাতে নিয়ে শিব বিবাহযাত্রায় বের হন। অন্যদিকে তার বাহন বৃষকেও সাজাতে বলেন নন্দীকে। এভাবে নিজে বরবেশে সেজে বৃষের পিঠে উঠে সঙ্গে লক্ষ জন ভুত-প্রেত এবং আদি সাজে মুনিগণকে সঙ্গে নিয়ে বাদ্যকারদের নানান বাদ্যে পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। এমনাবস্থায় শিব বিবাহে যাত্রা করেন —

''সাজে শীঘ্র করি আনন্দ কৈলাসপুরি
সাজে শিব বিবাহ করিতে।
শিব বলে নন্দীরে সাজাহ বৃষের তরে
বৃষকে সাজাহ ভালমতে।।
নন্দী শিবের আজ্ঞা পাল্য বৃষের সাজন কৈল
বৃষ দিল শিবের সাক্ষাতে।
শিব সাজে বিবাহতে হাড় মালা গলাতে
সর্প্প য়াছে শিবের জটাতে।।
গঙ্গায়াছে জটা মাঝে নানা মতে শিব সাজে
কুণ্ডল পহ্রিল গলাতে।
শিঙ্গা বেনু হাতে নিল বৃষ পৃষ্ঠে চড়িল
সকলিকে কহিল সাজিতে।।'' পৃ-১৩

এইভাবে শিব বিবাহ করতে শ্বশুরগৃহে পৌঁছান। সেখানে গিয়ে নারদের আজ্ঞামত শিব উলঙ্গ হন। জামাই এর এমন রূপ দেখে মেনকার লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায়। এয়ো রমণীরা শিবের কপালে ফোঁটা দিতে গেলে শিবের জটা থেকে সাপ ছোবল মারে। শিবের এই রূপ দেখে ত্রয়ো রমণীরাও নানান মতামত ব্যক্ত করেন। কেউ বলে শিব 'বাদিয়ার পো' কেউ বলে শিব 'বাদিয়ার বেটা'। শিবের অবস্থা দেখে কোনো রমণী তার পাশে আসেন না, সকলেই দূরে পালায়, এমন ব্যবহার দেখে সকলেই লুটোপুটি খান। হঠাৎ করে শিব শ্বশুরের আগে ডমরু বাজান এবং সেই ডমরুর শব্দে শিবের সঙ্গী সাথী ভুত-প্রেতরা সকলই নাচতে থাকেন। কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধ শিবের দাত খুলে পড়ে। বিবাহসভায় শিবের এই চিত্রই আমরা মাণিকদত্তের কাব্যে দেখতে পাই,

''আইল মেনকা রাণী জাঙাই বরিতে।
জাঙাই নাঙ্গটা দেখি রহে হেট মাথে।।
শিবের কপালে আইহ ফোটা দিতে জায়।
শিবের জটের সর্প্প ছই দিতে চায়।।'' পৃ-১৪

কিংবা,

''শিবকে দেখি নারীগণ দূরতে পলায়।
শাশুড়ের আগে শিব ডমরূ বাজায়।।
বুড়ার বেশ হঞা শিব হাসি হাসি পড়ে।

কথা কহিতে শিবের দন্ত গেলো নড়ে।।'' পৃ-১৪

এই চিত্র কোচবিহার জেলায় প্রচলিত কাত্যায়নি ব্রতকথাতেও লক্ষ্য করা যায়। সেখানেও শিবের এই রূপ দেখে এয়ো নারীদেরকে মন্তব্য করতে শুনি----

'' ও মাইগো চলো দেখি গিয়া
কোন কালে দেকিছেন বরে বাজায় শিঙ্গা
বরও নোমায় টরও নোমায় বাদিয়ারের পো
মাথায় ডাঙ্গর জটা সাপে মারে ছোঁ।''[৫২]

এখানে শিবকে কখনো 'বাদিয়ারের বেটা' কখনো 'বাজিকরের পো' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার মাণিকদত্তের কাব্যেও এই ধরনের চিত্র পাওয়া যায়। সেখানে এয়ো নারীরা মন্তব্য করে বলেছেন---

''একেত নাঙটা শিব মাথে সাপের জটা।
বর নহে এই শিব বাদিয়ারের বেটা।।''[৫২]

এখানেই শেষ নয়, আমরা জানি শিব বাঘছালকে বস্ত্র হিসেবে পরিধান করেন। যা আবার সাপ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। এমনাবস্থায় এয়ো নারীরা শিবকে বরণ করতে এলে সেই সাপ ভয়ে পালিয়ে যায়, ফলে শিব উলঙ্গ হয়ে যায়। এই চিত্রও মাণিকদত্তের কাব্য ও কাত্যায়নি ব্রতে এক। মাণিকদত্তের কাব্যে উল্লেখ রয়েছে---

''নারদ বলে শিব মামা কথা বলি আমি।
শাশুড়ির সাক্ষাতে নাঙ্গট হও তুমি।।'' পৃ-১৪

— এমনতর জামাইকে দেখে মেনকা রাগ সম্বরণ করতে পারেন না। বারবার করে স্বামী হিমালয়কেই এর জন্য দায়ি করেন। মেনকা উভয়কেই ভর্ৎসনা করে বলেন শিবের জাতকুল বলে কিছু নেই, সারাদিন শ্মশানে গাঁজা ভাঙ খেয়ে পড়ে থাকেন। স্বামী হিমালয়ের চোখ থাকলে কন্যার জন্য এমন স্বামী পছন্দ করতে পারতেন না। অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রেই মেনকার রাগ একই রকম। মাণিকদত্ত তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে উল্লেখ করেছেন---

''মেনকা স্বামীকে বলে তোর চক্ষু নাই।
চক্ষু খাএগ বরিয়াছ পাগল জাঙাই।।
লজ্জা নাই করে শিব বমবম্ বোলে।
জাতির ঠিকানা নাই হাড়মালা গলে।।'' পৃ-১৫

এমন জামাইকে কন্যা দান করে একদিকে যেমন মেনকার লজ্জার সীমা নেই, তেমনি অন্যদিকে

নিজের এবং কন্যা ও স্বামীর প্রতিও তিক্ত ভাব চলে আসে। চরম উত্তেজিত হয়ে মেনকা গৌরীকে নিয়ে জলে ঝাপ দিতে চান। অর্থাৎ মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়াও মেনকার কাছে সহজ বলে মনে হয়েছে, তবু শিবকে জামাই হিসেবে মানা কঠিন।

''না দিব গৌরিকে বিভা ঘরতে রাখিব।
ভাল বর পাল্যে গৌরীকে বিভা দিব।'' পৃ-১৫

কিংবা,

''কান্দিয়া মেনকা বলে গৌরি করি কোলে।
গৌরিকে লইয়া আমি ঝাপ দিব জলে।।'' পৃ-১৫

এই একই দৃশ্যের পরিচয় আমরা কাত্যায়নি ব্রতকথাতেও পাই। সেখানে উল্লেখ রয়েছে---

''ও পাগেলা শিব তুই ফিরিয়া যা তোর ঘরে
ও নেংটা শিব তুই ফিরিয়া যা তোর ঘরে
হাতে গলায় বান্ধিয়া গৌরাইক ফেলাইম গঙ্গা জলে
তবুও নাদিম গৌরিক নেংটিয়া শিবের ঘরে।'' [৫৩]

এখানে মায়ের হৃদয়ের করুন আর্তি প্রকাশ পেয়েছে।

হিমালয় শিবের এই বাহ্যিক রূপ দেখে কিন্তু কন্যা দান করেননি। হিমালয় জানেন এই শিব আদি দেবতা। সকল দেবতাই এই শিবকে সমীহ করে চলেন। এমনকি দেবরাজ ইন্দ্র পর্যন্ত এই শিবকে পূজা করেন। হিমালয়ের যুক্তি হল শিব নিজে ভিক্ষা করে খেলেও যে ব্যক্তি এই শিবের পূজা করবেন, শিব বর দিয়ে তাকে রাজায় পরিণত করবেন। দারিদ্র্যকে ধন দিয়ে তার দুঃখ ঘোচানোই শিবের কাজ। এতৎসত্ত্বেও মেনকা শিবকে কন্যা দিতে নারাজ।

শিবের মনোহর বেশ ধারণ ঃ

শিব মেনকার কাছ থেকে নানান নিন্দা ও কটুক্তি সহ্য করতে না পেরে নিজ মূর্তি ধারণ করেন —

''মেনকা কান্দিয়া শিবের নিন্দা করে।
লজ্জা পাএগ শিব ঠাকুর নিজ রূপ ধরে।
রাম ব্রহ্ম মন্ত্র শিব হৃদএ জপিল।
কামিনীমোহণরূপ শিব ঠাকুর হৈল।'' পৃ-১৬

এই চিত্রের সঙ্গে কাত্যায়নি ব্রতের আবারও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। সেখানে উল্লেখ রয়েছে---

‘‘নাগ নুপুরে শিবের কি শোভা হইলো
নাগ নুপুরে চারণ কি শোভা হইলো
....
মহাদেবের চরণ দেখিতে কি শোভা হইলো
রতন মেখলা শিবের কি শোভা হইলো
রতন হার শিবের কি শোভা হইলো
ফণিহার তার উপরে শিবের গলে দিল।’’ [৫৩]

এভাবে শিব যখন নিজরূপ ধারণ করেন তখন তাঁর জটার সাপ টোপরে পরিণত হয়, গলার হাড়মালা কণ্ঠমালায় পরিণত হয়, পরনের ব্যাঘ্র ছাল বস্ত্রে পরিণত হয়। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে বিবাহ সভায় শিব যে লঘু রসিকতা সৃষ্টি করেছিলো মুহূর্তে তা যেন পরিবর্তিত হয়ে গুরুগম্ভীর শিবে পরিণত হয়। শিবের এই গুরুগম্ভীর রূপ দেখে এয়ো রমণীরা খুশি হন, যে মেনকা এতক্ষণ অধোবদন ছিলেন সেই মেনকা মাথা উচু করে দাঁড়ান, আনন্দে আপ্লুত হন। যে মেনকা এতক্ষণ গৌরীকে শিবের সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজি ছিলেন না সেই মেনকা পুনরায় বিবাহের উপকরণ সাজায়। পুরোহিত ব্রাহ্মণকে সামনে রেখে নান্দিমুখ শ্রাদ্ধের মধ্যে দিয়ে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারনের মাধ্যমে হর-গৌরীর বিবাহ সম্পন্ন হয়।

‘‘পিতার কোলে চড়ি দুর্গা শিব স্থানে আল্য।
শিব বেড়ি সপ্তবার প্রদক্ষিণ কৈল।।
আনন্দে শিব দুর্গা বিবাহে বসিল।
শিব দুর্গার গলে রাজা পুষ্পমাল্য দিল।।
শিবের পিতৃগণের নাম জিজ্ঞাসিল।
ব্রহ্মার পানে চাঞা শিব হাসিতে লাগিল।।
উগ্রকণ্ঠ বিষকণ্ঠ নীলকণ্ঠ নামে।
হৃদয়ে ভাবিয়া কথা বুঝ সর্ব্বজনে।।
উচ্চারিঞা নাম গোত্র কন্যা দান কৈল।
দুই দাসী সিংহ বাহন দুর্গাকে দিল।।
বিধিমতে বিভা দিয়া নানা দান দিল।
কন্যা জামাতাকে রাজা বাসরে রাখিল।।
ক্ষীর ভোজন কৈল দুহে বাসর গৃহতে।

শিব দুর্গার বিভা হৈল এই মতে।।'' পৃ-১৬-১৭

এরপর কাহিনী সূত্র ধরে এগিয়ে গেলে আমরা দেখবো যে একদিন গৌরী তথা দুর্গা নিজ গাত্রমল থেকে একটি পুতুল নির্মাণ করেন এবং তাতে জীব দান করেন, তার নাম রাখা হয় গণেশ। দুর্গার গর্ভে শিবের আর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে তার নাম রাখা হয় কার্ত্তিক। এরপর দেবী কর্তৃক ধুব্রলোচন অসুর বধ হয় এবং কালকেতু ফুল্লরা কাহিনী ধনপতি লহনা খুল্লনা কাহিনী আরম্ভ হয়। যে কাহিনীর মধ্য দিয়ে দেবীর পূজা প্রচারই মুখ্য হয়ে ওঠে।

উপরিউক্ত আলোচনার মাধ্যমে আমরা মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে শিব চরিত্রের পরিচয় পাই তা সামান্য হলেও গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই অল্প পরিসরের মধ্য দিয়েই কবি শিবের পৌরাণিক ও লৌকিক রূপের যথাযথ সংমিশ্রণ করেছেন। কাহিনীধারা যত এগিয়েছে আমরা দেখতে পেরেছি শিবের লৌকিকরূপ তত প্রকট হয়ে উঠেছে। লৌকিক শিব আত্মভোলা, ভিখারী, নেশাখোর, শ্মশানে বাসস্থান, হাড়মালা গলে। আর এই বৈশিষ্ট্যগুলি আছে বলেই শিব দেবসমাজে ব্রাত্য, এজন্যই বিবাহের সময় সমস্ত দেবসমাজ তার গৃহে খেতে নারাজ ছিলেন। এসব চিত্র যেন সেই সময়ের সমাজ থেকে উঠে আসা। মাণিকদত্ত যেহেতু গায়েন ছিলেন, পাড়া ঘুরে বেড়াতেন তাই এই চিত্রগুলি তাঁর নজরে আসতো। আর এগুলিকেই কৌশলে তাঁর কাব্য মধ্যে স্থান দেন। আবার আমরা দেখতে পারি নারদের প্রত্যেকটি কথা শিব যেভাবে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন, যার জন্য বিবাহ সভায় শিবের নগ্ন হয়ে যাওয়া এসব লৌকিক চিত্র মাত্রই। মাণিকদত্ত যেসব অঞ্চলে বসবাস করতেন সেখানে শ্রমজীবী মানুষের সংখ্যাই বেশি ছিল । তাই পৌরাণিক কাহিনী তাদের সামনে পরিবেশন করলে তাদের মাথায় প্রবেশ করবে না। এজন্য পুরাণের আঁধারে মাণিকদত্ত এই লৌকিক কাহিনীগুলিকে একাকার করে দেন।

তথ্যসূত্র ঃ

১. রাজসভার কবি ও কাব্য, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪

২. তদেব, পৃ. ২-৩৩.

৩. সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার, ড: শচীন্দ্রনাথ রায়, পৃ. ৫

৪. কোচবিহারের ইতিহাস, খাঁ চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ, হিতেন নাগ সম্পাদিত, পৃ. ৮৩

৫. উত্তরবঙ্গের (কোচবিহার) কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ (১৭ শ শতাব্দীর) কর্তৃক অনুদিত মহাভারতের প্রাচীন পুঁথির প্রামাণ্য সটীক সংস্করণ প্রস্তুতি' শিরোনামে গবেষণা অভিসন্দর্ভ, গবেষক - ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

৬. কবি মনকৰ বিৰচিত মনসা-কাব্য, শশী শর্মা (সমীক্ষক)।

৭. তদেব পৃ. ৫।

৮. মনসা কাব্য, প্রথম খণ্ড, ড.বিৰিঞ্চি কুমার বৰুয়া ও ড. সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা, পৃ. ন-প

৯. কবি মনকৰ বিৰচিত মনসা-কাব্য, শশী শর্মা, (সমীক্ষক), পৃ. ৬-৭।

১০.কবি মনকৰ বিৰচিত মনসা-কাব্য, শশী শর্মা, (সমীক্ষক), পৃ.১৭-১৮ (ভূমিকা অংশ)

১১. সংগ্রহ ঃ সদেষ্ণা বর্মণ (৫২), চকচকা, বাবুরহাট, কোচবিহার, তারিখ- ২০.০৮.২০১৩।

১২. মনসা কাব্য, প্রথম খণ্ড, ড.বিৰিঞ্চি কুমার বৰুয়া ও ড. সত্যেন্দ্র নাথ শর্মা (সম্পাদিত)

১৩. মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নির্বাচিত প্রবন্ধ,ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), পৃ. ৫৬৬।

১৪.পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র, দীপ্তিময় রায়, পৃ. ২,৩,৪

১৫. তদেব, পৃ.৩

১৬. মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ, সম্পাদক- নৃপেন্দ্রনাথ পাল।

১৭. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৯৫-৪৯৬।

১৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৯৯।

১৯.মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ, সম্পাদক - নৃপেন্দ্রনাথ পাল, ভূমিকা অংশ, পৃ-৪৩।

২০. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৪৯৭।

২১. কোচবিহারের কবি দ্বিজ মাধবচন্দ্র বিরচিত 'চণ্ডিকার ব্রতকথা'; সম্পাদনা শ্রীমৃণালকান্তি দাম ও ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল।

২২. তদেব, পৃ-ভূমিকা অংশ।

২৩. তদেব, কাব্যের কবি পরিচিতি অংশ, পৃ. ৭।

২৪. তদেব, কাব্যের কবি পরিচিতি অংশ, পৃ. ৫।

২৫. রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত গোসানীমঙ্গল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পাদিত)।

২৬. তদেব, পৃ. ১১৭।

২৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ-৪৯।

২৮. কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল, ড. আশুতোষ দাস ও সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

২৯. তদেব, পৃ. ভূমিকা অংশ।

৩০.সংগ্রহঃ নৃপেন মোদক (৫৫), গ্রাম ও পোঃ চেপানী, (মোদক পাড়া) আলিপুরদুয়ার ২নং ব্লক, জলপাইগুড়ি।

৩১. প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ-৫৯০, ৫৯১, ৫৯২।

৩২. সংগ্রহঃ মানেকা বর্মণ (৪২), বামনহাট, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ০৭.১২.১২।

৩৩. প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯।

৩৪. বেলারাণী বর্মা (৪৮), ঝুড়িপাড়া, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ০৭.০৩.১৩

৩৫. সংগ্রহঃ শ্যামলী সরকার (৩৯), ভিতর কামতা, গোসানীমারী, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ- ৫.১১.১২।

৩৬. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৪৪।

৩৭. তন্ত্রভূতির মনসাপুরাণ, ড. আশুতোষ দাস সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

৩৮. প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোকসঙ্গীত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ. ১৫৯।

৩৯. তদেব, পৃ. ৩৬২।

৪০. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৪৫।

৪১. তদেব, পৃ. ৩৪৬।

৪২. তদেব, পৃ. ৩৫০।

৪৩. তদেব, পৃ. ৩৪৬।

৪৪. মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪।

৪৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯১।

৪৬. আলোচনার দর্পণে মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, ড. আদিত্য লালা, পৃ. ৩-৪।

৪৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৯১।

৪৮. তদেব, পৃ. ৯২।

৪৯. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৩৮২।

৫০. সংগ্রহ ঃ নান্দরিবর্মন (৬০), পুটিমারী, দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ-০৭.১১.১২।

৫১. তদেব।

৫২. তদেব।

৫৩. সংগ্রহ ঃ অনিতা বর্মণ (৫২),ভেটাগুড়ি (রুইয়ের কুঠি), দিনহাটা, কোচবিহার, তারিখ-১৩.০৮.২০১২।

আদিনা মসজিদ (আদিনাথ শিবমন্দির)

আদিনা মসজিদের দেওয়ালে হিন্দু দেব-দেবী

আদিনা মসজিদের দেওয়ালে হিন্দু দেব-দেবী

আদিনা মসজিদের দেওয়ালে হিন্দু দেব-দেবী

আদিনা মসজিদের দেওয়ালে হিন্দু দেব-দেবী

জল্লেশ, জলপাইগুড়ি

মহাকাল: চেপানি, কামাখ্যাগুড়ি, জলপাইগুড়ি

ষাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার

সিঙ্গিয়া শিবমন্দির, চাঁচল, মালদা

দামেশ্বর শিবমন্দির, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার

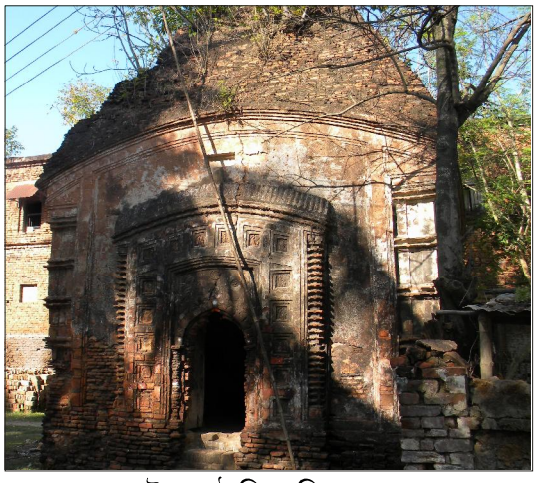

আইহোমঠ শিবমন্দির, মালদা

মোকাতিপুর শিবমন্দির, মালদা

কলিগ্রাম শিবমন্দির, চাঁচল, মালদা

বুড়াশিব, ধোপাপাড়া, মালদা

মখদুমপুর সাহাপাড়া শিবমন্দির, মালদা

হাতিন্দা শিব মন্দির, চাঁচল,মালদা

জহুরাতলা শিব মন্দির, মালদা

কেন্দুপুর শিবমন্দির

সাদুল্লা শিবমন্দির

খুনেশ্বর শিবমন্দির বাঁধ রোড, মালদা

তুফানীপোদ্দার শিবমন্দির, ওল্ড মালদা

কালিতলা শিবমন্দির, মালদা

বাণেশ্বর শিবমন্দির, কোচবিহার

চড়ক পূজার পাট, পয়াস্থি, পারাডুবি, মাথাভাঙ্গা

হাজরা পূজা (চড়ক)

হাজরা পূজা (চড়ক)

চড়কের সঙ্, ঢাংটিংপাট, ধূপগুড়ি

বাণ ফোঁড়ানো ব্যক্তি (চড়কের সময়), ধূপগুড়ি

বুড়া ঠাকুর, শালবাড়ি তুফানগঞ্জ

নিষ্কিন্দামাশান মন্দির, বটতলা, দিনহাটা, কোচবিহার

বুড়াঠাকুর, পেট্টাঝার, পুন্ডিবাড়ি, কোচবিহার

নিষ্কিন্ধা মাশান

ছ্যাংছেংয়া ঠাকুর, পারাডুবি, মাথাভাঙ্গা

মহাকাল, কুমার গ্রাম

উপসংহার

লোকসংস্কৃতি ও লোকসাহিত্যের সম্পদে উত্তরবঙ্গ একটি সমৃদ্ধ অঞ্চল। এখানকার জনসমাজ দীর্ঘদিন ধরে নিজের ঐতিহ্য রক্ষা করে সংহত জীবন যাপন করে এসেছে। দীর্ঘদিনের সংহত সমাজ-জীবনকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এখানকার লোকসাহিত্য। বলা যেতে পারে এই লোকসাহিত্যকে ভিত করেই এখানকার শিষ্ট সাহিত্যের প্রকাশ। যার প্রমাণ এতদঞ্চলের সাহিত্যধারা, যার কথায় কথায় ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গান প্রভৃতি প্রসঙ্গের উল্লেখ। সেই মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তথা জগজ্জীবন ঘোষাল কিংবা তন্ত্রবিভূতি থেকে দেবেশ রায় কিংবা অমিয়ভূষণ মজুমদার তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হিমালয় সংলগ্ন এই ভূ-খণ্ডের বৈচিত্র্যময় প্রকৃতিই বিশেষ করে নদী-অরণ্য-পর্বত প্রভৃতি এখানকার এই লোকসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। তাইতো এখানকার নদীকে কেন্দ্র করে, অরণ্যকে কেন্দ্র করে কিংবা পর্বতকে কেন্দ্র করে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবে এতদঞ্চলের লোকসাহিত্যের রূপ যেমন বিচিত্র তেমনি মননশীল পাঠকের কাছেও তার আবেদন গভীর। যদিও এই ঐতিহ্যময় সংস্কৃতি ভেতরে ভেতরে ফল্গুধারার মতো পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যা সংস্কৃতির যে কোনো একটি দিককে ধরলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে শুধু শিব চরিত্রকে কেন্দ্র করে এই পরিবর্তিত ধারা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই একটি মাত্র দেব চরিত্র উত্তরের মাটিতে কত বিচিত্র হতে পারে তারও চিত্র উঠে এসেছে আলোচ্য গবেষণা অভিসন্দর্ভে।

'উত্তরবঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্যে শিব' শিরোনামে গবেষণা করতে গিয়ে প্রথমেই আমি উত্তরবঙ্গের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিচয় দিয়েছি। কেননা যে ভূমিরূপে, যে ভূ-খণ্ডে দেবাদিদেব এত বিচিত্র হয়ে উঠেছে তার পরিচয় না দিলে ঠিক শিব চরিত্রের বিবর্তিত রূপগুলি বোঝা যাবে না। এই পরিচয় দিতে গিয়ে এতদ ঞ্চলের ভৌগোলিক রূপের কথা যেমন উল্লেখ করেছি, তেমনি নদ-নদী, জনজীবন ও লোকাচারের ধারাও স্পষ্ট করেছি। আসলে এই ক্ষুদ্র-ভূখণ্ডের সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান এতদঞ্চলের সংস্কৃতিকেই বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে। যার একদিকে ভুটান, নেপাল ও অন্যদিকে বাংলাদেশ নামক প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলি অবস্থিত এবং প্রতিবেশি রাজ্য হিসেবে অসম ও বিহার শুধু সংস্কৃতিগত দিক থেকে এতদঞ্চলের বৈচিত্র্যই এনে দেয়নি, বরং সমৃদ্ধ করেছে। আবার এই ভূখণ্ডের সংস্কৃতি গঠনের ক্ষেত্রে নদীগুলির ভূমিকাও কম নয়, কেননা এই অঞ্চলের নদীগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে নানা লোকাচার, লোকবিশ্বাস, লোকায়ত দেবতা প্রভৃতি। প্রসঙ্গক্রমে তোর্ষাপীর কিংবা তিস্তাবুড়ির কথা বলা যায়-- যা এই ভূ-খণ্ডের সাংস্কৃতিক

প্রেক্ষাপট আলোচনার স্বতন্ত্রতার দাবী রাখে। শুধু তাই নয়, এতদঞ্চল অরণ্যে সমৃদ্ধ হওয়ার জন্য তা শুধু এখানকার সংস্কৃতিকে প্রভাবিতই করেনি বরং নিয়ন্ত্রক হিসেবেও কাজ করেছে। উপরন্তু এই বিস্তৃত অরণ্যকে কেন্দ্র করে নানা লোককথা, মিথ, লোকবিশ্বাস, লোকায়ত দেবদেবী, টোটেম, ট্যাবু প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এই সমস্ত লোকউপাদানগুলি কিভাবে উত্তরের সংস্কৃতির সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে তারও বিস্তৃত পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে আলোচ্য গবেষণাপত্রে। উদাহরণ হিসেবে একটি মিথের কথা বলতে হয়। মিথটি হল শিবের স্ত্রী দুর্গা তিনদিনের 'কড়ালে' বছরে একবার বাপের বাড়ি বেড়াতে আসেন। কোচ রমণীর সঙ্গে শিবের যেহেতু সম্পর্ক রয়েছে, তাই দুর্গা এই তিনদিন কৈলাস থেকে কোচবিহারেই আসেন। লক্ষণীয় কৈলাস থেকে কোচবিহারে আসতে গেলে এই পর্বত অরণ্য মধ্য দিয়েই আসতে হবে। এভাবে দেবী এই অঞ্চলে আসেন এবং তিনদিনের কড়ালে তাঁকে আবার স্বামীগৃহে ফিরে যেতে হয়। যাবার সময় দেবীর তত্ত্বাবধায়িকা ওরফে ভাণ্ডানী পথের মধ্যে অসুস্থ হয়ে যান। তখন দেবী শিবের কাছে অনুমতি চান, এবং অনুমতি নিয়ে অরণ্য মধ্যে দেবী ভাণ্ডানীকে সুস্থ করে কৈলাসে ফিরে যান। লক্ষণীয় এই অতিরিক্ত তিনদিন অর্থাৎ বিজয়া দশমী থেকে তিনদিন পর্যন্ত আজও এই অঞ্চলে ভাণ্ডানী দেবীর পূজা হয়। তাই বলা যায় এই ভাণ্ডানী পূজা আলাদা করে উত্তরবঙ্গের বনভূমি অঞ্চলের তথা সমাজ ও সংস্কৃতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। একইভাবে 'মহাকাল' দেবতার কথাও বলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ 'উত্তরবঙ্গের শৈব সংস্কৃতির ঐতিহ্য' নামক অধ্যায়ে আমি শৈব ধারার সূচনাকাল থেকে (হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতা) বর্তমান সময় পর্যন্ত বিবর্তন ধারাটি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এতে হরপ্পা-মহেঞ্জোদড়ো সভ্যতায় যে তিন ধরনের শিবের পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে লিঙ্গ মূর্তিতে শিব, ধ্যানীযোগীর মতো মূর্তিতে শিব এবং তিনমাথাওয়ালা চিত্র সম্বলিত শিব- তা সুস্পষ্টভাবে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। মূলত এখান থেকেই আর্য কিংবা অনার্য শিবের ধারণা এসেছে। এরপর বৈদিক ও পৌরাণিক স্তরে শিবের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বৈদিক যুগে শিব রুদ্রদেবতা নামে পরিচিত ছিল। এই রুদ্র ধ্বংসের দেবতা। এই উগ্র, হিংস্র, ধ্বংসরূপী রুদ্রদেবতা পরবর্তীকালে সমাজ বিবর্তনের ধারায় কল্যাণময় মূর্তি ধারণ করেন। ধ্যানীবুদ্ধের আদলে শান্ত সমাহিত শিবমূর্তিরও কল্পনা করা হয়েছে। তাই চতুর্বেদের মধ্যে একমাত্র যজুর্বেদে 'শিব' শব্দটির পরিচয় পাই। যার মধ্যেই শিবের রুদ্র রূপের পরিবর্তে শান্তরূপের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়। একারণেই শিবকে একদিকে যেমন বলা হয় রুদ্র তেমনি অন্যদিকে বলা হয় যোগীন্দ্র। এধরনের নামকরণ অবশ্য বৈদিক যুগেই সম্ভব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই বৈদিক যুগের শিবের সঙ্গে অনার্য শিবের অনেক মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অনার্য শিবের মতোই এই সময়ের

শিবও ব্যঘ্রচর্ম পরিধান করেন, গলায় সর্পমালা বেষ্টন করে থাকেন এবং যার বাহন বৃষ। তাই শিবের রুদ্র রূপের সঙ্গে অনেকেই অনার্য শিবকে এক বলে মনে করেছেন।

এর পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ পৌরাণিক যুগে আবার শিবের ভিন্ন রূপ নজরে আসে। শৈবপুরাণ মতে শিবকে আদি দেবতা এবং তাকে পরম ব্রহ্ম বলে মনে করা হয়েছে। একারণে তিনি দেবাদিদেব। ১৮ টি মহাপুরাণ ও ১৮ টি উপ-পুরাণ মতে এই তথ্যই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পুরাণে যে বিভিন্ন দেবতার প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়, তা অবশ্য সমসাময়িক সমাজের মানুষের ধর্মীয় বিবর্তনের ইতিহাসকেই মনে করায়। বিভিন্ন পুরাণগুলি বাদ দিয়েও সেই সময়ের বিখ্যাত পতঞ্জলির মহাভাষ্য, মথুরা শিলালেখ, তাম্রমুদ্রা প্রভৃতি উপাদানের মধ্যেও শিব উপাসকদের পরিচয় পাওয়া যায়। যা পৌরাণিক যুগের অর্থাৎ খ্রি. পূর্বাব্দ সময়ের শিবের পরিচয় বহন করে।

আবার প্রাচীন সাহিত্যের স্তর অর্থাৎ প্রাচীন যুগের প্রকীর্ণ কবিতাবলী এবং বিদ্যাপতির শিবগীতিতেও শৈবধারার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সময় রাধা-কৃষ্ণ আলাদা গুরুত্ব পেলেও শিব কিন্তু একেবারেই উপেক্ষিত থাকেন নি। অর্থাৎ এই সময় 'কৃষ্ণ'কে কেন্দ্র করে আলাদা করে যেমন সাহিত্য রচনা হয়েছে (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন), ঠিক তেমনি শিবকে কেন্দ্র করেও আলাদা করে বিদ্যাপতি তার 'শিবগীতি' রচনা করেছেন। এছাড়াও এই সময়ের প্রকীর্ণ কবিতাগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণের লৌকিকরূপের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি শিবের লৌকিকরূপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ করে সদুক্তিকর্ণামৃতে, ভোজদেব রচিত একটি শ্লোকে, গোবর্ধন আচার্যের আর্যাসপ্তশতী প্রভৃতি গ্রন্থে শিবের পাশাখেলা, হর-গৌরীর বিবাহ ও তাদের কোন্দলের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির শিবগীতিকে তো মঙ্গলকাব্যের উত্তরসুরীই বলা যেতে পারে। কেননা মঙ্গলকাব্যের মতো এখানেও বিবাহযাত্রায় শিব ও কৃষি শিবের পরিচয় আছে। অর্থাৎ মধ্যযুগের সাহিত্যে শিব চরিত্র যেভাবে নিজের জায়গা দখল করে নিয়েছে, তার পূর্বাভাস অবশ্যই বিদ্যাপতির শিবগীতি ও প্রাচীনযুগের সাহিত্যগুলি -- একথা বলা যেতে পারে। মধ্যযুগের সাহিত্যে শিবের দুটো অংশ লক্ষ্য করা যায় -- পৌরাণিক শিব ও লোকায়ত শিব। দক্ষযজ্ঞনাশ, সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন পৌরাণিক প্রসঙ্গ অবশ্যই পৌরাণিক শিবের পরিচয় বহন করে। কিন্তু এই পৌরাণিকতার উপর লেখকেরা এমনভাবে লৌকিক স্তরের খোলস পরিয়ে দিয়েছেন, তাতে তাঁর গাম্ভীর্য আলাদা করে কল্পনাই করা যায় না।

এই অধ্যায়ের শেষে উত্তরবঙ্গের লোকায়ত স্তরে শিবের বিবর্তন ধারাটি স্পষ্ট করা হয়েছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গে যে বিভিন্ন জাতি-জনজাতি রয়েছে, তাদের মধ্যে শিব কতনামে পরিচিত তার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন বোডো বা মেচদের কাছে শিব বাথ্রৌব্রাই বা শিব্রাই

নামে পরিচিত, ধীমালদের কাছে দান্তাবেরাং প্রভৃতি নামে পরিচিত। শুধু তাই নয় উত্তরবঙ্গের ছয় জেলায় প্রাচীন শৈবক্ষেত্রগুলির উৎপত্তি ও সেগুলির বিবর্তন ধারা সম্পর্কেও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে, বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার শৈব ক্ষেত্রগুলির উপর ভিত্তি করেই এই বিবর্তন ধারাটি দেখানো হয়েছে।

গবেষণা অভিসন্দর্ভের তৃতীয় অধ্যায় 'উত্তরবঙ্গের লোকদেবতা রূপে শিব' শিরোনামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। এখানে শুরুতেই লোকদেবতা সম্পর্কে সম্মক ধারণা দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে প্রাসঙ্গিকভাবে লোকদেবতা সম্পর্কে কতগুলি বৈশিষ্ট্যের নিরূপণ করা হয়েছে, যে বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গের শিবের লৌকিক রূপকে অন্বেষণ করা হয়েছে এবং এই অন্বেষণে যেসব লোকদেবতার পরিচয় পাওয়া গেছে, তাদের লোকদেবতা রূপে শিব এবং লোকদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত শিব-- এই দুই উপ-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। লোকদেবতারূপে শিব অংশে ডাংধরা, চড়ক, মহাকাল প্রভৃতি এবং লোকদেবতার সঙ্গে সম্পর্কিত শিব অংশে মাশান, ঢাংঢিং প্রভৃতি লোকায়ত দেবতাদের নিয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই লোকায়ত শিবের বিভিন্ন অঙ্গভূষণ অর্থাৎ বাঘছাল, সাপ, ছাই ভস্ম, ললাটে চন্দ্র প্রভৃতি বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এবং এইসব উপাদানের মধ্য থেকে শিবের লৌকিকরূপ অন্বেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের মৌখিক সাহিত্য তথা লোকসাহিত্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। লোকসংস্কৃতির যে বিভিন্ন উপাদানগুলি রয়েছে বিশেষ করে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, মন্ত্র, ব্রতকথা, স্থাননাম প্রভৃতির মধ্যে শিব প্রসঙ্গ উদ্ধার করা হয়েছে। সমগ্র উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত এই উপাদানগুলির মধ্যে শিব প্রসঙ্গ শৈব ধারার বিবর্তনকে ভিন্ন মাত্রা দান করে। সমগ্র ভারতবর্ষে শিব যেমন জনপ্রিয় এবং তাৎপর্যমণ্ডিত, উত্তরবঙ্গও তার থেকে যে পিছিয়ে নেই, এতদঞ্চলের লোকসমাজেও যে শিব বৈচিত্র্যময় এবং তাৎপর্যমণ্ডিত তার পরিচয় এই উপাদানগুলিই বহন করে আসছে। বিশেষ করে মন্ত্রের দোহাই অংশে ব্যবহৃত শিব প্রসঙ্গ এতদঞ্চলের মানুষের মধ্যে শৈবপ্রীতির কথাই মনে করিয়ে দেয়।

এর পরবর্তী অধ্যায়ে উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষিতে রচিত শিষ্টসাহিত্যে (মধ্যযুগ) শৈবধারায় বিভিন্ন স্তর দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এতে শৈবপীঠস্থান কোচবিহারকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একারণে এই অধ্যায়টিকে কোচবিহার রাজসভার সাহিত্যে শিব এবং মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে শিব-- এই দুটি উপ-অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। কোচবিহার রাজসভার সাহিত্য বলতে এখানে মনকর ও দুর্গাবরের মনসা-কাব্য ও বেউলা আখ্যান, মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও

শিবেন্দ্রনারায়ণের 'ভক্তিগীতি-সংগ্রহ', দ্বিজ মাধবচন্দ্রের 'চণ্ডীকার ব্রতকথা' এবং রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর 'গোসানীমঙ্গল' কাব্যকে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের 'ভক্তিগীতি-সংগ্রহ' আসলে কতগুলি শাক্তপদের সমাহার। সেখানে আগমনি, ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদে শিবের দাম্ভিক ও লৌকিকরূপের প্রকাশ ঘটেছে। মা মেনকার কাছে জামাতা হিসেবে শিব মোটেও যে পছন্দের নন -- তা আগমনি পর্যায়ের পদেই স্পষ্ট। আর অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলি যা উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে রচিত সেগুলিকে দ্বিতীয় উপ-অধ্যায়ে আকর গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ করে, মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গ ল এবং তন্ত্রবিভূতির মনসামঙ্গল কাব্য। এই দুই উপ-অধ্যায়ের আকর গ্রন্থগুলি অবলম্বন করে শিব চরিত্র আলোচনা করতে গিয়ে কিছু সাদৃশ্য ও কিছু বৈশাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। সমস্ত মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টিতত্ত্বে, হর-গৌরীর বিবাহ প্রভৃতি প্রসঙ্গ থাকলেও সেখানেও যেন সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। চণ্ডীমঙ্গ ল কাব্যধারার আদি কবি মাণিকদত্ত যেভাবে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন মনসামঙ্গল কাব্যধারায় উল্লিখিত কবিরাও সেভাবেই সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা দিয়েছেন। কিন্তু এখানে মাণিকদত্ত যেভাবে আদ্যার সাতবার জন্ম প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, মনসামঙ্গল কাব্যধারার কবিদের মধ্যে অবশ্য এই চিত্র দেখা যায় না। এছাড়াও মাণিকদত্তের কাব্যে দুর্গা শিবকে বিবাহ করার জন্য যে কঠিন তপস্যায় ব্রতী হন, অন্যত্র তা দেখা যায় না। এখানে দুর্গা নিজেই শিবকে স্বামী হিসেবে পেতে চেয়েছেন, আলোচ্য মনসামঙ্গল কাব্যধারায় ঠিক এর বিপরীত চিত্র নজরে আসে। সেখানে শিবই যেন দুর্গাকে বিবাহ করার জন্য কাতর হয়েছেন। একারণেই তিনি মালঞ্চ নির্মাণ করেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যের কবিরা যেভাবে মালঞ্চ নির্মাণের প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন, মাণিকদত্তের কাব্যে সেভাবে মালঞ্চ প্রসঙ্গ আসে না। এগুলি বাদ দিয়েও মাণিকদত্ত যেভাবে গঙ্গার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা মাণিকদত্তের কাব্যে অত্যন্ত বাধ্য হয়ে শিব গঙ্গাকে বিবাহ করেছেন, কিন্তু মনসামঙ্গল কাব্যের কবিত্রয় ভিন্ন প্রসঙ্গে গঙ্গার কথা উত্থাপন করেছেন, সেখানে গঙ্গা আগে থেকেই শিবের স্ত্রী। আবার মাণিকদত্ত ও মনকর শিবের বিবাহ দিয়েই দেবখণ্ডের সমাপ্ত করেছেন, কিন্তু তন্ত্রবিভূতি ও জগজ্জীবন ঘোষাল আরো কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন। সেখানে নানা লোকাচার, লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ এসেছে, সেখানে শিবের কামোন্মত্ত রূপ প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। এখানে শিব যেন ইন্দ্রিয়প্রবণ এবং ইন্দ্রিয় সচেতন; কিন্তু মাণিকদত্তের কাব্যে শিব উদাসীন, ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। জগজ্জীবন ঘোষাল এবং তন্ত্রবিভূতির কাব্যে শিব ইন্দ্রিয় সচেতন বলেই পদ্মাকে কৈলাশে নিয়ে যেতে চাননি। আবার এঁদের কাব্যের মধ্যেই সমুদ্র মন্থনের প্রসঙ্গ আসে, যার মধ্য দিয়ে শিব নীলকণ্ঠ নাম লাভ করেন।

আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে আমরা শিবের যে পরিচয় পাই তাতে তিনি আদি দেবতা, তবুও কবিরা তাঁকে হতদরিদ্র রূপে অঙ্কন করেছেন। সেখানে দেখি শিব দারিদ্র্যের কারণে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, কোথাও বা চাষ-আবাদ করেছেন। কিন্তু কোনোটাই শেষ পর্যন্ত করে উঠতে পারেননি। এসব চিত্র দেখার পর তাঁকে আর দেবতা বলে মনে হবার কথা নয়, আসলে মধ্যযুগের কবিরা সমাজের ভণ্ডামী, লুণ্ঠন, জমিদারী শোষণ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সরাসরি কিছু বলতে পারতেন না। বিভিন্ন দেবদেবীর রূপকে বসিয়ে কবিরা এসবের প্রতিবাদ করতেন। শিবও যেন এরকমই একজন প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তি যিনি আদিদেব। এছাড়াও আমরা দেখি সেই সময় কুলিন ব্রাহ্মণদের বহুবিবাহের কথা, যা সমাজের বাছবিচারহীন যৌন সঙ্গমের পরিচয়ই বহন করতো। ঠিক এই চিত্র শিবের মধ্যেও দেখানো হয়েছে। কেননা ঘরে স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও শিব কোচনী ও গোয়ালীনি রূপী নারীদের সঙ্গে মিলিত হন। এটি ছাড়াও পদ্মার প্রতি শিবের আকর্ষণ এই প্রসঙ্গকে আরও ভয়ঙ্কর করে তোলে। আসলে পদ্মা শিবের দুহিতা হলেও শিব ভুল করে তার প্রতি আকৃষ্ট হন। এগুলি যেন সেই সমাজের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি। এখানে শিবকে অভিজাত বা সামন্তপ্রভুর প্রতিনিধি হিসাবেও গ্রহণ করা চলে। কেননা মালঞ্চ নির্মাণের পর সেখানে দ্বারী বা প্রহরী নিয়োগ করার ঘটনার মধ্য দিয়ে এই দিকটিই ফুটে ওঠে, এসব চিত্রের মধ্য দিয়ে শিবকে আমরা মর্ত্য পৃথিবীর ধূলি ধূসরিত মানুষ হিসেবেই গ্রহণ করতে পারি।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১. আকর গ্রন্থ ঃ

ক. অসমীয়া আকর গ্রন্থ ঃ

১. বরুয়া, ড. বিরিঞ্চিকুমার সংগ্রাহক ড. সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা (সম্পাদিত) — মনকরী আরু দুর্গাবরী মনসাকাব্য (প্রথম খণ্ড), কাঁলিরাম মেধি, পার্বতী প্রকাশন, গুয়াহাটী -১।

২. শর্মা, শশী (সমীক্ষক) — কবি মনকর বিরচিত মনসা-কাব্য , জার্নাল এম্পরিয়াম, নলবারী, ৭৮১৩৩৫।

খ. বাংলা আকর গ্রন্থ ঃ

১. ওঝা, সুনীলকুমার (সম্পাদিত) — মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৩৮৪।

২. পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পাদিত) — রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী বিরচিত গোসানীমঙ্গল, অণিমা প্রকাশনী, ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-০৯, পরিবর্ধিত ও সংশোধিত সংস্করণ, অগ্রহায়ণ-১৪১৫।

৩. পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পাদক) — মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের ভক্তিগীতি-সংগ্রহ, অণিমা প্রকাশনী, ১৪১, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রকাশকাল- ১৬ ই ভাদ্র, ১৪০৬।

৪. দাম, শ্রীমৃণালকান্তি ও পাল, ড. নৃপেন্দ্রনাথ (সম্পাদনা) — কোচবিহারের কবি দ্বিজ মাধবচন্দ্র বিরচিত চণ্ডিকার ব্রতকথা, কোচবিহার, ১৫ ই আগষ্ট, ১৯৮২।

৫. দাস, ড. আশুতোষ ও ভট্টাচার্য্য, সুরেন্দ্রচন্দ্র (সম্পাদিত) — কবি জগজ্জীবন-বিরচিত মনসামঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৪।

৬. দাস, ড. আশুতোষ — তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশকাল ১৯৮০।

২. সহায়ক গ্রন্থ ঃ

ক. অসমীয়া সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. দলৈ, ড. শ্রীহরিনাথ শর্ম্মা — অসমত শৈব-সাধনা আরু শৈব-সাহিত্য, শান্তিপুর, নলবারী-৭৮১৩৩৫, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩ ইং, ১৯ ডিচেম্বর।

২. দাস, ভারতচন্দ্র — অসমীয়া সাহিত্য বুৰুঞ্জী (মনসা শাখা), নিউ বুক স্টল, গুয়াহাটী-১ (মনসা শাখা), নিউ বুক স্টল, গুয়াহাটী-১।

৩. বরদলৈ, ড. নির্মল প্রভা — শিব, সাহিত্য প্রকাশ, গুয়াহাটী- ৩।

৪. ভকত, ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ — রাজবংশী লোকদেবতা মাশান, CESR, গোলকগঞ্জ, ধুবুরী, অসম, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭।

৪. শাস্ত্রী, বিশ্বনাৰায়ণ ও চলিহা ভৱপ্রসাদ (সম্পাদিত) — সুর্যখড়ি দৈৱজ্ঞৰ ৰাজবংশাৱলী, লয়ার্ছ বুক স্টল, পাণ বাজাৰ, গুৱাহাটি, প্রথম সংস্কৰণ, ২০১২

খ. বাংলা সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. আহমদ, ওয়াকিল — বাংলা লোকসাহিত্য ঃ ধাঁধা, আনন্দধারা, ১১০০, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১০।

২. আহমদ, ওয়াকিল — বাংলা লোকসাহিত্য ঃ মন্ত্র, আনন্দধারা, ঢাকা-১১০০, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০১০।

৩. আহমদ, খাঁ চৌধুরী আমানত-উল্লা — কোচবিহারের ইতিহাস,প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ- ২০০৮।

৪. কর, অরবিন্দ (সম্পাদিত) — জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (প্রথম খণ্ড), কিরাতভূমি, সংস্কৃতি পাড়া, জলপাইগুড়ি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কোলকাতা, বইমেলা ২০০৯।

৫. কর, অরবিন্দ (সম্পাদিত) — জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (দ্বিতীয় খণ্ড), কিরাতভূমি, সংস্কৃতি পাড়া, জলপাইগুড়ি।

৬. কামিল্ল্যা, মিহির চৌধুরী — আঞ্চলিক দেবতা লোকসংস্কৃতি, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়,২০০০।

৭. গঙ্গোপাধ্যায়, ড. শম্ভুনাথ — মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য, পুস্তক বিপণি, কোলকাতা - ৯।

৮. ঘোষ, প্রদ্যোৎ লোকসংস্কৃতি ও গম্ভীরা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, ৬০ জেমস লঙ সরনি, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাশ, নববর্ষ-১৪১০।

৯. ঘোষ, সুধাংশু রঞ্জন শিবপুরাণ, ৬১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা০৯, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৪।

১০. চক্রবর্তী, বরুণকুমার (সম্পাদিত) — প্রবাদ প্রসঙ্গ, অক্ষর প্রকাশনী, ৩২ বিধান রোড, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ২০১২

১১. চৌধুরী, কমল (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ, ডিসেম্বর-২০১১

১২. ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ — বাংলার ব্রত, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, অগ্রহায়ণ ১৪১২।

১৩. তর্করত্ন, পঞ্চানন, (অনুবাদিত) — লিঙ্গপুরাণ,নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯৬।

১৪. তর্করত্ন, পঞ্চানন (সম্পাদিত) — শিবপুরাণ, নবভারত পাবলিশার্স, ১৪১৬।

১৫. দত্ত, ভবতারণ বাংলার ছড়া (সংকলিত ও সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, আগস্ট, ১৯৯৭।

১৬. দাম, ড. বিমলেন্দু (সম্পাদিত) — কোচবিহার রাজসভার কবি পীতম্বর-কৃত ভাগবত দশম স্কন্ধের অনুবাদ, যোগামায়া প্রকাশনি, ৬০ পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা০৯, প্রথম প্রকাশ-বইমেলা ২০১০।

১৭. দাশ, ড. নির্মল — উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ, সাহিত্য বিহার, কলকাতা - ৯ পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০১।

১৮. দাস, বিশ্বনাথ সম্পাদিত — মুন্সী জয়নাথ ঘোষ বিরচিত রাজোপাখ্যান, মালা পাবলিকেশনস্, কলকাতা ১৯৮৫।

১৯. দে, ড. দিলীপ কুমার — কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি, অনিমা প্রকাশনী, ১৪১ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০৭।

২০. পাল, অনিমেশ কান্তি — লোকসংস্কৃতি, উষা পাবলিশিং হাউজ, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯৬।

২১. পাল, ড. ফণী (সম্পাদিত) — আদ্যের গম্ভীরা, হরিদাস পালিত, বলাকা, ৮ সি, ট্যামার লেন, কলকাতা-০৯, সংশোধিত তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৩।

২২. পালিত, হরিদাস আদ্যের গম্ভীরা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৬৮, আগষ্ট-২০১৩।

২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, প্রথম খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

২৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় খণ্ড, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টীট, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ (নতুন সংস্করণ) ২০০৬-২০০৭

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার— বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, প্রথমপর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৬-২০০৭

২৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ড, দ্বিতীয়পর্ব, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টীট, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ মুদ্রণ (নতুন সংস্করণ) ২০০৬-২০০৭

২৭. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ — রাজসভার কবি ও কাব্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮।

২৮. বসাক, ড. শীলা — বাংলার ব্রতপার্বণ, পুস্তক বিপণি, ২৭, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, তৃতীয় মুদ্রণ- সেপ্টেম্বর-২০০৮।

২৯. বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেশ্বর — পশিচমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৬৮, প্রথম প্রকাশ, জুন-২০০১।

৩০. বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ — বাংলার লৌকিক দেবতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, চতুর্থ সংস্করণ-জানুয়ারি-২০০৮।

৩১. বর্মা, সুখবিলাস — ভাওয়াইয়া-চটকা, সোপান, ২০৬ বিধান সরনি, কলকাতা-০৬, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১১।

৩২. বাগ, ড. খোকন কুমার — মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব-কাহিনী ঃ উপেক্ষিতের কথা, সুদর্শন প্রকাশন, বি-৬/১৭৫, কল্যাণী, নদীয়া, প্রকাশকাল, মার্চ ২০১২।

৩৩. ব্যানার্জী, সুরেশ চন্দ্র (সম্পাদিত) — সুদুক্তি কর্ণামৃত, ফার্মা কে, এল, এম, কলকাতা ১২।

৩৪.বসু, শ্রী শঙ্করীপ্রসাদ — মধ্য যুগের কবি ও কাব্য, জেনারেল প্রিন্টার্স য্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রা: লি: ১১৯ লেলিন সরনী, কলকাতা-১৩, সেপ্টেম্বর, ২০১১।

৩৫. বিশ্বাস, রতন (সম্পাদিত) — উত্তরবঙ্গের লোকগান, বইওয়ালা, কলকাতা-৪৮, প্রথম প্রকাশ, ১৯ শে মে, ২০০৪।

৩৬. বর্ম্মণ, শ্রী উপেন্দ্রনাথ — উত্তর-বাংলার সেকাল ও আমার জীবন স্মৃতি, জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯২।

৩৭. বর্ম্মণ, শ্রীউপেন্দ্রনাথ — রাজবংশী ভাষার প্রবাদ-প্রবচন ও হেয়ালী, জলপাইগুড়ি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১০।

৩৮. ভট্টাচার্য, আশুতোষ — বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্টীট, কলকাতা-৭৩, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর-২০০৯

৩৯. ভট্টাচার্য, ড. আশুতোষ — বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর, ১ম খণ্ড, (১ম সংস্করণ,

১৩৭৩), এ, মুখার্জী এন্ড কোম্পানী প্রাঃ লিমিটেড, কলিকাতা-৭৩, পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৯৮৩।

৪০. ভট্টাচার্য, গুরুদাস — বাংলা কাব্যে শিব, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮২।

৪১. ভট্টাচার্য, সুকুমারী — পুরাণ ও অন্যান্য, মিলেমিশে, কলকাতা-৫৪।

৪২. ভট্টাচার্য, ড. হংস নারায়ণ — হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, প্রথম পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-১২, ১৯৭৭।

৪৩. ভট্টাচার্য্য, শ্রী হিমাদ্রীশঙ্কর — কোচবিহারের প্রাচীন প্রথার কিছু জানা ও অজানা কথা, কোচবিহার-৭৩৬১০১, চতুর্থ সংস্করণ ২৫ শে ডিসেম্বর ২০০৫।

৪৪. ভট্টাচার্য্য , হিমাদ্রিশঙ্কর ও ভট্টাচার্য্য ড. সুধীশঙ্কর — কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ১৯৮৩ ।

৪৫. মণ্ডল, মোহনলাল — হাওড়া জেলার লৌকিক দেব-দেবী, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৬৮, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০০১

৪৬. মজুমদার, সুধীর রঞ্জন (সম্পাদিত) — বিদ্যাপতির শিবগীতি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬২।

৪৭. মজুমদার, মানস — লোকঐতিহ্যের দর্পণে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৩।

৪৮. মল্লিক, দীপঙ্কর — লোকসংস্কৃতির আলোকে বাংলা মঙ্গলকাব্য, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, ১ লা বৈশাখ ১৪২০।

৪৯. মিত্র, অশোক (সম্পাদিত) — পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা (প্রথম খণ্ড), দি ম্যানেজার অব পাবলিকেশন সিভিল লাইনস; দিল্লী হইতে ১৯৬১ সালে প্রকাশিত।

৫০. মিত্র, সনৎকুমার — লোকসংস্কৃতি চর্চার মেথডলজি, পুস্তকবিপণী, কল-০৯,

প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ২০০৭।

৫১. মুখোপাধ্যায়, অশোক — সংসদ বানান অভিধান, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-০৯, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০৪।

৫২. মুখোপাধ্যায়, প্রভাত — মনসামঙ্গলের ইতিবৃত্ত, সাহিত্যলোক, ২/৭, বিডনস্ট্রিট, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ মার্চ- ২০০১।

৫৩. মৈনান, কিশোরীমোহন — মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য সংস্কৃত-প্রাকৃত-প্রকীর্ণ- কবিতার অনুসরণ, অসীমা প্রকাশনী,১৯৯৯।

৫৪. লালা, ড. আদিত্যকুমার — আলোচনার দর্পণে মানিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল, কল্যাণী পাবলিকেশন, চাঁচল, মালদা-২৩, প্রথ ম প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০০৯।

৫৫. লালা, ড. আদিত্যকুমার — মনসামঙ্গল কাব্য ঃ জীবন দৃষ্টির বিচিত্র দর্পণে, কল্যাণী পাবলিকেশন, চাঁচল, মালদা -২৩।

৫৬. লাহিড়ী, শিবপ্রসন্ন — যশোর খুলনার ছড়া, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫।

৫৭. রায়, অরুণকুমার — লোকায়ন চর্চার ভূমিকা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৬৮, পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর-২০০৫।

৫৮. রায়, অশোক — বিবর্তনের ধারায় শিব ও শিবলিঙ্গ, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯, প্রথম সংস্করণ, জানুয়ারি-২০০৮।

৫৯. রায়, অশোক — শালগ্রাম শিলার সন্ধানে, আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা-৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ, এপ্রিল - ২০০৬।

৬০. রায়, ড. গিরিজাশংকর — উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৯

৬১. রায়, ড. গিরিজাশংকর — প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ ঃ লোকসাহিত্য, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া ১৩৮৮।

৬২. রায়, দীপ্তিময় — পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র, মণ্ড ল বুক হাউস,

মহাত্মাগান্ধী রোড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৩৯১।

৬৩. রায়, ধনঞ্জয় — লোকসংস্কৃতি ঃ লৌকিক দেবতা উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা, রথতলা, বালুরঘাট, ৭৩৩১০১, প্রথম প্রকাশ, দোল যাত্রা ১৪১১।

৬৪. রায়, নীহাররঞ্জন — বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ ১৪১৪।

৬৫. রায়, ড. বাসুদেব — মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ, পাঠক-বন্ধু লাইব্রেরী, ঢাকা- ১১০০।

৬৬. রায়, ড: শচীন্দ্রনাথ — সাহিত্য সাধনায় রাজন্য শাসিত কোচবিহার, সুপ্রিম পাবলিশার্স, ১০এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, মহালয়া-১৪০৬।

৬৭. রায়, অন্নদাশঙ্কর — ছড়া সমগ্র, চতুর্থ পরিবর্ধিতসংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৩।

৬৮. রায়, স্বপন কুমার — কোচবিহার রাজদরবারের সাহিত্য চর্চা, বুকসওয়ে, ৮৬ এ, কলকাতা-০৭, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১।

৭০. রায়, বুদ্ধদেব — লোক সাঙ্গীতিকী, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, ২৫৭ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিট, কলকাতা-১২, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮।

৭১. রায়, ড. নরেন্দ্রনাথ — উত্তরবঙ্গের লোক দেবদেবী ও লোকাচার, ছায়া পাবলিকেশন, ৬ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, উত্তরবঙ্গ বইমেলা ২০১২।

৭২. রায় বিদ্যানিধি, শ্রী যোগেশচন্দ্র — বেদের দেবতা ও কৃষ্টিকাল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ, চৈত্র ১৩৬১।

৭৩. শর্মা, উমেশ — ইতিহাসের আলোকে বৈকুণ্ঠপুরের পূজা-পার্বণ ও লোকাচারের ধারা, বইওয়ালা, কোলকাতা-৪৮, প্রথম প্রকাশ, মে ২০০৯।

৭৪. সরকার, সুধাংশুকুমার — উত্তরবঙ্গে নমঃশূদ্র সমাজ ও সংস্কৃতি, এন এল

পাবলিশার্স, শিলিগুড়ি, প্রথম প্রকাশ, ১২ জানুয়ারি, ২০১৩।

৭৫. সেনগুপ্ত, পল্লব — লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ। পুস্তক বিপণি, কল-৯, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫।

৭৬. সেনগুপ্ত, পল্লব — পূজা-পার্বণের উৎসকথা, পুস্তক বিপণি, কলকাতা - ৯, প্রথম সংস্করণ, আগস্ট, ১৯৮৪, তৃতীয় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, মে ২০০১।

৭৭. সেনগুপ্তা, জয়া — মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী, ক্যাম্প, ২বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০০১।

৭৮. সোম, সুস্মিতা — মালদহ ইতিহাস কিংবদন্তী, সোপান, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৪।

৭৯. সোম, সুস্মিতা — মালদহ ধর্মীয় ঐতিহ্য ও লোকউৎসব, সোপান, ২০৬ বিধান সরণি, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ- ২০১৩।

৮০. হাটি, চূড়ামণি (সম্পাদনা) — লোকসংস্কৃতির দিগদিগন্ত, গ্রন্থবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম সংস্করণ, ২৬ জানুয়ারি ২০০৯।

গ. ইংরেজী সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১. Agrawala, Vasudeva S. — Siva Mahadeva The great god, Veda Acad emy, Varanasi -5, 1966

২. Sanyal, Charu Chandra — The Rajbansis of North Bengal, The Asiatic Society, 1 Park Street, Kolkata-16, Reprinted in 2002.

৩. Hunter, W.W. — Statistical account of Bengal, vol-10, London - 1876, Reprinted in India -1984

৪. Mazumdar, R.C — THE HISTORY AND CUL

TURE OF THE PEOPLE, Vol-I, e.d, 1996.

৫. Sarkar, Benoy Kumar — The Flok-Element in Hindu Culture, Orien tal Books, Reprint Corporation 54 Rani Jhanshi Road, New Delhi-55, First Indian Edition-1972

৬. Chatterji, Sunity Kumar — Kirat-Jana-Kirti, The Asiatic Society, 1Park Street, Kolkata-16

৭. Risley , H.H. — The Tribes and Castes of Bengal, Voll-II. P.Mukgerjee, 2/1 Dr. Askay Pal Road, Calcutta-34,1st edition,Calcutta-1891, Reprint Calcutta-1998.

৮. Sanyal, Charu Chandra — and others (Editor) Jalpaiguri District Centenary Subeniar, 1869-1968, Published Jalpaiguri, Septem ber-1970.

৩. সহায়ক পত্র-পত্রিকা ঃ

১. আচার্য, নিরুপম (সম্পাদক) — কলাবতী, বইমেলা সংখ্যা, ২০০৯।

২. তরফদার, শ্রী সুজয়কান্তি (সম্পাদিত) — বীক্ষণ পত্রিকা, বইমেলা সংখ্যা, চতুর্থ বর্ষ, ২০০৮, হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

৩. বর্মা, রমণীমোহন (সম্পাদিত) — কালবৈশাখী, বিশেষ সংখ্যা, ৩০শে জুলাই, ২০১০, রাজবংশী লোকভাষা একাডেমী, দিনহাটা, কোচবিহার।

৪. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদিত) — মধুপর্ণী, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা ১৩৯৪, একবিংশ বর্ষ, বালুরঘাট।

৫. ভট্টাচার্য, অজিতেশ — মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, আগষ্ট-১৯৯০, (সম্পাদিত), ত্রয়োবিংশ বর্ষ, বালুরঘাট।

৬. ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পাদিত) — মধুপর্ণী, বিশেষ পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সংখ্যা (উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর যুগ্ম জেলা সংখ্যা) ১৩৯৯, পঞ্চবিংশ

বর্ষ, বালুরঘাট।

৭. মণ্ডল, অজিত (সম্পাদক) — পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা, ৩৪ বর্ষ, সংখ্যা ৪৮, ৪৯,৫০, জুন, ২০০১।

৮. মিত্র, সনৎকুমার (সম্পাদিত) — লোকসংস্কৃতি গবেষণা, বাঙলার শিব ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, ১৯ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, লোকসংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, কোলকাতা-৩৪।

৯. রায়, গৌতম গুহ (সম্পাদক) — দ্যোতনা, বর্ষা-১৪১৮, ৩৩ বর্ষ, ১৯ সংখ্যা, জলপাইগুড়ি।

১০. রায়, নিখিলেশ (সম্পাদিত) — ডেগর ৬, শিবমন্দির, শিলিগুড়ি।

১১. রায়, সুপ্রিয়া (সম্পাদক) — পশ্চিমবঙ্গ, জুলাই, ২০০৬, কোচবিহার জেলা বিশেষ সংখ্যা, ৩৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা, তথ্যসংস্কৃতি বিভাগ।

১২. হোসেন, ড. মোঃ জাহাঙ্গীর — ঐতিহ্য, বাংলাদেশ ফোকলোর গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

৪. গবেষণা অভিসন্দর্ভ ঃ

১. চক্রবর্ত্তী, পূর্ণেন্দু , নারায়ণদেবের মনসামঙ্গল ও সুকনাম্মী (তুলনামূলক পর্যালোচনা) তত্ত্বাবধায়ক - S.S Roy, ১৯৯৫, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

২. পাল, নৃপেন্দ্রনাথ উত্তরবঙ্গের (কোচবিহার) কবি শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ (১৭ শ শতাব্দীর) কর্তৃক অনুদিত মহাভারতের প্রাচীন পুঁথির প্রামাণ্য সটীক সংস্করণ প্রস্তুতি' বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২।

৩. পাল, ফণীগোপাল উত্তরবাংলার লোকসাহিত্য, তত্ত্বাবধায়ক - তরণীকান্ত ভট্টাচার্য ও হরিপদ চক্রবর্তী, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮১।

৪. ব্যানার্জী, রাসবিহারী দক্ষিণ রাঢ় বঙ্গের শৈবাচার ঃ জীবনে ও সাহিত্যে, তত্ত্বাবধায়ক - কল্যাণীশঙ্কর ঘটক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়২০০৮।

নির্ঘন্ট

অ

অথর্ববেদ - ৩১

অর্ধনারীশ্বর - ২৯,৪৩

অনার্যস্তর - ২৬, ৩১২

অন্নদামঙ্গল- ৩৯, ৪০

অনন্তনারায়ণ শিলা - ৪৩

আ

আইহোমঠের শিবমন্দির - ৪৫, ৩০৩

আগমনি - ২১৫, ২১৯, ২২২

আদিনাথ শিবমন্দির - ৪৬, ৪৭, ৩০২

আদ্যের গম্ভীরা - ১৭০

ক

কাজলী কুড়া - ২২৮

কাত্যায়নী ব্রত- ১৪৯, ১৫০, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ২৫৫, ২৯০,

কাতিপূজার ব্রত - ১৪৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ২৪৫, ২৯১

কাঞ্চন নগর - ২৮৪

কান্তেশ্বর - ১০২, ২২৭, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৪

কালিতলা শিবমন্দির - ৪৬, ৩০৫

কুচুনী রূপ - ২৫৯

কুলাঢাকি - ৯

কুলিক পক্ষিনিবাস - ৫

কেন্দুয়ার নালা - ২৮৪

কোচবিহার রাজসভা - ১৮১, ১৮৩, ১৮৪

কোটেশ্বর শিব - ২৩১

কোদালধোওয়া দিঘি - ২২৮

খ

খুনেশ্বর -৪৫, ৩০৫

গ

গছিপুনা -১২, ১৩, ১৪

গছুরপুনা - ৬

গণেশ ও কার্তিকের জন্ম - ২৫৮

গমীরা খেলা - ৮৩, ৮৪, ২৬৮

গম্ভীরাগান - ১৭০, ১৭১, ১৭৪

গড়কাটামাশান - ১০০

গাথাসপ্তসতী - ৩৫,৩৬

গোবরাছাড়া -২২৫

গোরক্ষনাথ - ১৫

গোসানীমঙ্গল - ১০১, ২২৭, ২২৯

গোয়ালিনী কুপ - ২৫৯

গৌড়েশ্বর শিবমন্দির - ৪৭

গৌরীর জীবন দান - ২৬২

ঘ

ঘরে রসুন ঝুলিয়ে রাখা - ১০

চ

চণ্ডীকার ব্রতকথা - ২২৪, ২২৫, ২২৬

চড়ক - ৭৮,৭৯, ৮২,৮৪,৮৩,৩০৬, ৩১১

চর্যাপদ - ৩৪

চামাটাউয়া - ১০৭

চুরাকরণ - ১১

ছ

ছাত্যা ভাত্যা - ২৮৪

ছেলে ভুনানোর ছড়া - ১৬৭

জ

জগজ্জননীরূপ - ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩

জগজ্জীবনঘোষালের মনসামঙ্গল -১৫৮, ২৩৫,৩১২

জটিলেশ্বর শিবমন্দির - ৫০

জলপড়া - ১৪০, ১৪১, ১৪৪

জলকষা - ১৪১, ১৪৪

জলেশ্বর শিবলিঙ্গ - ৪৩

জলুয়া মাশান - ১০৩

জল্পেশ শিবমন্দির - ৪৮, ৪৯, ৫০, ১৯৭, ২৩২, ৩০৩

জয়া-বিজয়া - ২১৭

জহুরুতলা কালিমন্দির - ৪৪

জাগগান - ৯৭

জাগ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ - ৪৩

জুড়াবান্দা ঠাকুর - ৯১, ৯২

জিগা গাছের সঙ্গে সই পাতানো -১০

ড

ডাংধরা - ৬, ৪১, ৭৩, ৭৪, ৭৫,৩১১

ঢ

ঢাংটিং - ৪১, ১০৬, ৩১১

ত

তন্ত্রবিভূতির মনসাপুরাণ - ২৬৬, ৩১২

তিস্তাবুড়ি - ৮, ১৩১, ১৩২

তেরাবেরা - ১১

তেরেয়া মারেয়া - ৬

তোতলা সর্ব্বেশ্বরী - ২৬৬

তোর্ষাপীর - ৭

দ

দান্তাবেরাং - ৪১

দামেশ্বর শিবমন্দির - ৪৪, ৩০৩

দ্বিজমাধবচন্দ্র - ২২৪, ২২৫

দুর্গার জন্ম - ২৮৯

দুর্গা মনসার দ্বন্দ্ব - ২৬০, ২৭১

দুর্গাবর - ১৮৫,১৯৪,

দেল' এর গান - ১২৫, ১২৬, ১২৭

দেবীচৌধুরাণী - ৮৬, ৮৭

দোহাই - ১৩৯, ১৬৯

ধ

ধরম ঠাকুরের গান - ১২৮

ধর্মনিরঞ্জন - ১৩৮

ধর্মঠাকুর - ১৩৮

ধর্মমঙ্গল -৪০
ধানের আগ নেওয়া -১৪
ধুন্দার মেলা - ৩
ন
নটরাজ নৃত্য - ৭০
নয়াকরা - ১৫
নড়বড়িয়া শিবমন্দির - ৫১,৫২
নানা - ১৭১, ১৭৪
নিষ্কিন্দা মাশান - ১০৪, ৩০৭
নীলকণ্ঠ শিব - ২৬৩, ২৭৮
নোহাশূর - ১০৮
প
পতঞ্জলীর মহাভাষ্য - ৩৪
পদ্মার জন্ম খণ্ড - ২০৮, ২৫৮, ২৬৯
প্রকীর্ণ কবিতা - ৩৪
পৃথুরাজা- ৪৯,১৯৭
ফ
ফুলফুল্যা নগর - ২৮২, ২৮৫
ব
বট পাকুড়ের বিবাহ - ১০
বটেশ্বর শিবমন্দির - ৫০
বঙ্গপ্রদেশ - ১
বরদেও - ৪১
বরপাহাড়ী - ৪১
বাজিকরের পো - ২৯৫
বাথীব্রাই - ৪০
বাদিয়ারের বেটা - ২৯৫
বাণেশ্বর - ৪২, ৪৩, ১৭৬, ১৩২
বাঁশ পূজা - ৯২, ৯৩
বাঁশজাগানো - ৯৩
বাঁশের থলা - ৯৮
বুড়াধল্যা - ৯
বুড়াঠাকুর - ১৬, ৪১, ৮৯, ৯০, ৩০৭
বেউলা আখ্যান - ১৮৫, ১৯৪, ১৯৫, ২১০
বোলবাই অংশ - ১৭৪
ভ
ভক্তিগীতি- সংগ্রহ - ২১২, ২১৫, ২১৬, ২১৯
ভক্তের আকুতি - ২২২
ভবানী পাঠক - ৮৫, ৮৬, ৮৭
ভাগিদারা - ১৫৬
ভাণ্ডানী - ৭, ১৮
ভাণ্ডারকুড়া - ১০৭
ভোগা দেওয়া - ১২
ভেরাঘর ছোবা - ১২
ম
মইষঠাকুর - ৪১
মনকর - ১৯৪, ১৮৫, ১৯৫, ১৯৯
মনসাকাব্য - ১৯৪, ১৮৫, ১৯৫, ১৯৮
মনসার বিবাহ - ২৮০
মনোহরদিঘি- ২২৮
মদনকাম - ১২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৯, ১৩৬, ১৩৭,

মদনকাম জাগানো - ৯৩, ৯৪
মহাকাল - ৬,৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৩০৩, ৩০৭
মহারাজা ঠাকুর - ১৫,৮৭, ৮৮, ৮৯
মহেশের পাট - ২৩১
মঙ্গলচণ্ডীগীত - ২২৪
মাগন কিষাণ - ১৪
মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গল-১৫৪, ২৮১, ২৮২, ৩১২
মারাই পূজা - ১৬৩
মারাংবুরু -৪১
মালঞ্চনবন নির্মাণ - ১৯৯, ২০০, ২০১, ২৪৫
মালবিকাগ্নিমিত্রম - ৩৬
মাশান - ৯৯,১০০, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১৪২, ১৭৫, ৩১১
মিতরধরা -১১
মুকুন্দচক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য - ৩৮, ৪০, ১৫০
মুক্তেশ্বর শিব - ৪৩
মোটাজাগ - ৯৬

য

যজুর্বেদ - ৩১
যৌনপূজা - ২৯

র

রাজপাট - ২২৮
রাজবংশী বিয়ের গান - ২৫৩, ২৫৪
রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী - ২২৭
রুদ্রদেবতা - ৩১

ল

লাহাঙ্কারী গান - ১৩৪

শ

শিবের কয়ালি বেশ ধারণ - ২০৩, ২৪৮
শিবখেলার গান - ১২৮, ১২৯
শিববন্দনা - ২২২
শিবের কৈলাস প্রত্যাগমন- ২৬০
শিবের মনোহর বেশ - ২৯৬
শিবগীতি - ৩৬, ৩৭
শিবায়ন -৩৯
শিশুবেদ - ১৬৮
শিশ্নদেব - ৩০
শীতলবীর্য -৭১
শুম্ভ-নিশুম্ভ - ২২৬
শ্রীউতঙ্ক শিব -৪৬
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - ৩৪
শৃঙ্গারশতক -৩৫

ষ

ষাইটোর বিষহরি - ১৪৯, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪
ষাণ্ডেশ্বর শিবমন্দির - ৪৪, ৩০৩

স

সদুক্তিকর্ণামৃত - ৩৫
সন্ন্যাসী - ৪১, ৮৫, ৮৬, ১৬৯
সরুজাগ- ৯৬
সাগরদিঘি - ২২৮
সাদুল্লাপুর শিবমন্দির - ৪৭, ৩০৫
সিদ্ধেশরী শিবমন্দির - ৪৪

সেগুনিয়া ঠাকুর - ১০৬, ১০৭
সুভাষিত রত্নকোষ - ৩৫
সুবচনী - ১৭,১৪৯,১৬১, ১৬২
সৃষ্টি খণ্ড - ১৯৮, ২৩৯, ২৮৬
হ
হর-গৌরীর অধিবাস - ২০৪
হরগৌরীর বিবাহ - ২০৫, ২৯৩
হর-পার্বতীর বিবাহ খণ্ড - ২০০, ২৫২
হরিপুর শিমন্দির - ৪৩, ৪৪
হাজরাপূজা - ৭৯, ৩০৬
হাতিন্দা শিবমন্দির - ৪৮, ৩০৪
হীরারাম তেওয়ারী - ৪৫
হুদুমদ্যাওয়ের পূজা - ৬, ১২